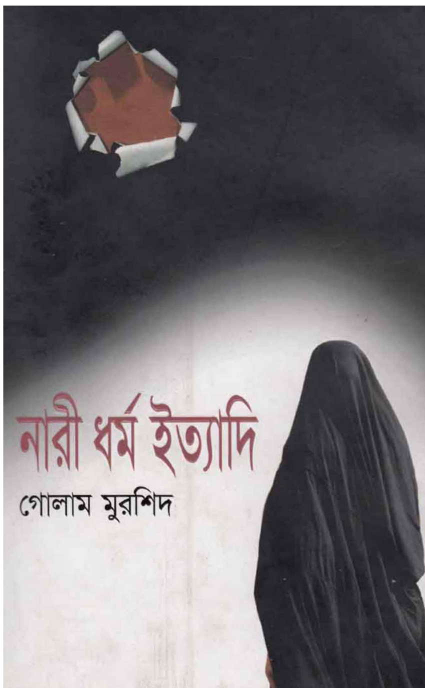

নারী ধর্ম ইত্যাদি
গোলাম মুরশিদ

প্রথম প্রকাশ	একুশের বইমেলা ২০০৭
©	লেখক
প্রচ্ছদ	মাসুম রহমান
প্রকাশক	মাজহারুল ইসলাম অন্যপ্রকাশ ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৬৮১
মুদ্রণ	কালারলাইন প্রিন্টার্স ৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
মূল্য	৩০০টাকা
আমেরিকা পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক	সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
Nari Dharma Etyadi	Ghulam Murshid Published by Mazharul Islam Anyaprokash Cover Design : Masum Rahman Price : Tk. 300.00 only ISBN : 984 868 418 2

ডালিয়া দাশ এবং
আমার তাবৎ নারীদরদী/নারীবাদী এবং
অসাম্প্রদায়িক পাঠকপাঠিকাদের,
যাঁদের দেখিনি, কিন্তু যাঁদের সঙ্গে
একাত্মবোধ করি।

আমার প্রধান কাজ গবেষণা। তারই ফাঁকে ফাঁকে অনেক চিন্তা মনের মধ্যে উঁকি দেয়। কখনো কখনো সে চিন্তা আবার অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু আমি এমন অসামাজিক এবং নিঃসঙ্গ যে, কাউকে আমার চিন্তার শরিক করতে হলে সেটা পত্রিকায় ছাপিয়েই করতে হয়। সম্পাদকরা সেসব আবোল-তাবোল লেখা দয়া করে ছাপালে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো কৌতূহলী পাঠকপাঠিকার প্রতিক্রিয়া জানতে পাই— বিশেষ করে ই-মেইল মারফত। মনে আছে, একবার একটি লেখা প্রকাশিত হয় *প্রথম আলোতে*। আমি জানতামও না, সে লেখাটা সেদিন ছাপা হয়েছে। রোজকার মতো সকাল বেলায় ই-মেইল আছে কিনা দেখতে গিয়ে দেখি ক্যানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম আর নিউজীল্যান্ড থেকে চারজন তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। তারপর কদিন ধরে আরও অনেকগুলো মেইল পাই বাংলাদেশ-সহ নানা দেশ থেকে। এ রকম মতামত জেনে ভালো লাগে। এমন কি, তাঁরা যখন আমার মত সমর্থন করেন না, তখনো ভালো লাগে। কেউ যে দয়া করে আমার লেখা পড়েছেন এবং পড়ে মতামত দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, এটাকে আমি একটা প্রাপ্তি বলে গণ্য করি। এ রকম মেইলের মাধ্যমে গত কয়েক বছরে অনেক নানা বয়সের বন্ধু লাভ করেছি আমি— যদিও তাঁদের দেখিওনি।

আমার সর্বপ্রথম, সর্বোত্তম এবং সর্বশেষ পরিচয়: আমি মানুষ। সে জন্যেই 'মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান'— এ মন্ত্রে আমার বিশ্বাস আত্যন্তিক। লিঙ্গভেদে সেই মানুষকে যখন ছোটো করা হয়, তখন সেটা আমার প্যাশন জাগিয়ে তোলে। ধর্মের বেড়াজালে ফেলে সেই মানুষকে যখন নির্যাতন করা হয়, আমার ভেতরে তখন প্রতিবাদের শিখা জ্বলে। কোনো আদর্শবাদ অথবা ডগমা দিয়ে যখন মনুষ্যত্বকে খাটো করা হয়, তখন সেটা আমার কাছে অসহ্য বোধ হয়। আমার কাছে দেশ, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য— সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানুষ। এর সবকিছুই মানুষের জন্যে।

এ গ্রন্থে সংকলিত লেখাগুলো আমি এক সময়ে লিখিনি, এক পত্রিকার জন্যেও নয়। তা সত্ত্বেও লেখাগুলোর মধ্যে মানবতার ঐ ঐক্যসূত্রটি আছে। যে-দুটি প্রসঙ্গ ঘুরে ঘুরে এসেছে, সে দুটি হলো: নারী আর ধর্ম। এ ছাড়া, সাম্প্রদায়িতা, সাম্রাজ্যবাদ, বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতীয়তা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কথাও বারবার উল্লেখ করেছি। ফলে অনেক জায়গায় পুনরুক্তি দেখা দিয়েছে। এমন কি, ভাষার প্রয়োগেও কোথাও কোথাও মিল রয়েছে। এ জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। তবে আশা করি,

বক্তব্যে কোনো স্ববিরোধিতা দেখা দেয়নি। এই সংকলনে কয়েকটি লঘু রচনাও আছে।

এ লেখাগুলো তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্যে *দৈনিক স্টেটসম্যানের* মানস ঘোষ, *প্রথম আলোর* সাজ্জাদ শরীফ ও জাফর আহমদ, *যুগান্তরের* আবু হাসান শাহরিয়ার, অনু হোসেন ও সোহরাব হাসান আর *অন্যদিনের* সম্পাদক মাজহারুল ইসলামকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। মাজহারুল ইসলামের কাছে আরও কৃতজ্ঞতা এই প্রবন্ধগুলোকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্যে।

গোলাম মুরশিদ
লন্ডন, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

সূচীপত্র

পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

নারী ধর্ম ইত্যাদি

১
দেবতার নারীবন্দনা

ভাবতেই পারতাম না, গরুর চেয়ে উপকারী কোনো জন্তু থাকতে পারে। কিন্তু সেদিন কাক-ডাকা ভোরে এক দিব্যজ্যোতি দেবতা এসে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, "বৎস, গরুর চাইতে উপকারী জন্তু পশুপতি অবশ্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাকে চিনিতে পারিতেছ না ? চক্ষু থাকিতেও তুমি অন্ধ। একবার নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখো। দেখিতে পাইবে, তোমার গৃহেই গরুর চাইতে বহু গুণে উপকারী একটি জন্তু মনুষ্যরূপ ধরিয়া বাস করিতেছে। আমি তোমাদের গৃহলক্ষ্মী— নারীদের কথা বলিতেছি।"

এই দিব্যজ্যোতি দেবতা যে মহাদেব নন, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তবু তাঁকে খুশি করার জন্যে (তেল দিলে কে না খুশি হয়!) আমি বললাম, "দেবাদিদেব! আপনি এ কি বলছেন ? গরু তো পশু নয়— গরু হলেন গোমাতা! না, ভুল বললাম! মাতার মাতা। কারণ মা সন্তানকে দুধ দেন মাত্র কয়েক মাস। অপর পক্ষে, গরু আমাদের দুধ দেয় সারা বছর, সারা জীবন। আর, খাদ্যপ্রাণের কথা বিবেচনা করলে দুধ হচ্ছে সব খাবারের শ্রেষ্ঠ। তদুপরি, এই দুধ দিয়ে দৈ, সন্দেশ, রসগোল্লা-সহ— কতো রকমের অতি সুস্বাদু খাবার তৈরি হয়। আপনি হয়তো চিনলেও চিনতে পারেন, নোবেল প্রাইজ পাওয়া এক বাঙালি কবি কোনো এক দোকানের দৈ খেয়ে এমন মোহিত হয়েছিলেন যে, তাকে পয়োধি বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। প্রভু, আপনি আপনার অভিমত রিভাইজ করুন।"

দেবতা বললেন, "তোমার বক্তব্য একেবারে যুক্তিবর্জিত, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু পূর্ণ মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করো। তাহা হইলে গরুর তুলনায় নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই দর্শন করিতে পারিবে। গরু দুধ দেয় বটে, কিন্তু তাহার শিং আছে। অনেক সময় সে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়া গুঁতাইতে আসে। অনেক সময় দোহন করিবার সময় পা তুলিয়া ঝটকা লাথি মারে। কিন্তু মানুষের অর্থাৎ পুরুষের শত অত্যাচার সহ্য করিয়াও নারী কখনো গুঁতাইতে আসে না। অথবা লাথিও মারে না। প্রয়োজনমতো গুঁতাইলে তোমাদের দেহ ঝাঁঝরা হইয়া যাইতো। লাথি দিলে লাথি খাইতে খাইতে তোমাদের হাড় ভাঙিয়া গুঁড়া হইয়া যাইতো। তুমি চাটুকারিতা করিয়া আমাকে দেবাদিদেব বলিয়াছ বটে, কিন্তু আমি তাঁহার আজ্ঞাবাহী দাস মাত্র। আসল দেবাদিদেব উত্তমরূপে জানিতেন যে, মনুষ্যজাতি অর্থাৎ পুরুষকুল কি অসম্ভব কৃতঘ্ন এবং বদমাশ। নারীরা তাহাদের সমান হইলে অথবা তাহাদের ব্যবহারের উপযুক্ত উত্তর দিলে পুরুষ জাতি পুনঃপুন ভস্ম হইয়া যাইতো। কিন্তু তাহা হইলে মনুষ্য জাতিও বিলুপ্ত হইতো। অতএব তিনি ঠিক করিলেন যে, জানোয়ার-শ্রেষ্ঠ পুরুষদের জন্য ঢোঁড়া সাপের মতো নারী সৃষ্টি করাই নিরাপদ। কারণ এই সাপের বিষ নাই, তাহারা কামড়ায় না, এমন কি ঢুসঢাসও করে না।"

আমার স্বীকার করতেই হলো যে, হ্যাঁ, নারীদের মনের ইচ্ছা যেমনই হোক না কেন (তাঁদের সত্যিকার ইচ্ছার কথা দেবতারও জানা নেই), কিন্তু তাঁরা প্রকাশ্যে গুঁতোয় না অথবা পদাঘাতও করে না। কিন্তু তবু দেবতাকে বললাম, "যে-গরু কেবল দুধ দেয় না, তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়ার জন্যে নিজেদের দেহও দান করে; যে-গরু ফসল জন্মানোর জন্যে চাষবাসে আমাদের অশেষ উপকার করে; যে-গরুর গোবর খেয়ে মানুষের প্রায়শ্চিত্য করতে হয়; যে-গরুর গোবর সার এবং জ্বালানী হিশেবে ব্যবহার করা হয়; যে-গরুর শিং এবং হাড়ও ফেলার বস্তু নয়— আপনি সেই গোমাতাকে তুচ্ছ নারীর সঙ্গে তুলনা করছেন। দয়া করে বেয়াদবি বলে বিবেচনা করবেন না, কিন্তু হে প্রভু, আপনি আর-একবার বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করে দেখুন।"

দেবতা বললেন, "তুমি বেয়াদবেরও অধম। দীর্ঘ জটিল বাক্য দিয়া এবং বাগাড়ম্বর করিয়া আমাকে ঠকাইবার ফন্দি আঁটিতেছ। ভাবিয়াছ পুরাকালের দেবতা আধুনিক লৌকিক ভাষার অর্থ ভালো করিয়া বুঝিতে পারিবেন না। ইহা তোমার ভুল ধারণা। (নোয়াখালির ভাষায়: বুল দারণা।) তুমি কেবল বেয়াদব নও, তুমি একটি গোমূর্খ। পাছে তুমি আমার কথা অনুধাবন করিতে সমর্থ না হও, সেই নিমিত্ত রামমোহন নামে তোমার এক পূর্বপুরুষের বাক্য দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। কোনো গরু তোমাদের দুই-তিন বেলা টক, মিষ্টি, ঝাল, কষায় ইত্যাদি বিচিত্র স্বাদের সুস্বাদু খাদ্য রাঁধিয়া দেয়? তোমার বাড়ি পাহারা দেয়? বরঞ্চ গরুকে পাহারা দিয়া রাখিতে হয়। গরু অতি ভোরবেলা হইতে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত পুরুষকুলের সেবা করে? গরু কি তোমাদের সন্তানাদি লালন-পালন করে? তোমার প্রতিবেশিনীর সঙ্গে যখন ঝগড়া লাগিয়া যায়, তখন কোনো গরু কি কোমরে কাপড় প্যাঁচাইয়া তোমার হইয়া গলা ফাটাইয়া শ্রাবণের ধারার মতো গালি বর্ষণ করে? তুমি, নরাধম এবং চরম নেমকহারাম, সেই কারণে গরুর সহিত নারীর তুলনা করিতেছ। নারী গরুর তুলনায় সহস্র গুণ উপকারী।"

দেবতা যেসব পয়েন্ট উত্থাপন করলেন, তার মধ্যে দু-একটার কথা সত্যি সত্যি আমি আগে থেকে চিন্তা করিনি। সে জন্যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যুক্তি খণ্ডন করার মতো কথা খুঁজে পেলাম না। তা সত্ত্বেও বললাম, "হে তাত! আপনি যা বলছেন, তা হয়তো ঠিকই। কিন্তু নারীর চামড়া কোনো কাজে লাগে, বলুন! অথচ গরুর চামড়া— মহা উপকারী বস্তু।"

দেবতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিলো, তাঁর কণ্ঠ থেকেই সেটা টের পেলাম। কিন্তু পর মুহূর্তেই একটু থেমে দয়াময় এবং ক্ষমাশীল দেবতা তাঁর কণ্ঠ সংযত এবং নিচু করে বললেন,"তুমি একটি বলদ! নয়তো গরুর পক্ষ লইয়া এই সকল কুযুক্তি দিতে না। গরুর চক্ষু দুইটি সুন্দর— এই পর্যন্ত। কিন্তু নারীদের কেবল নয়ন দুটি সুন্দর নয়। এমন মায়া দিয়া তাহাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃজন করা হইয়াছে যে, তাহাদের অতীব মনোহর দেহের দিকে তোমরা বেহায়ার মতো চাহিয়া থাকো। শত

আবরণে নিজেদের দেহ ঢাকিয়াও নারীরা তোমাদের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে নিজেদের বাঁচাইতে পারে না। তোমাদের নির্লজ্জ এবং লালসার দৃষ্টি তাহাদের পুরু বস্ত্র ভেদ করিয়া ধারালো তিরের মতো তাহাদের দেহে বিঁধিতে থাকে। লুকাইয়া লুকাইয়া এবং তির্যক দৃষ্টিতে প্রতিদিন নারীদের না-দেখিলে তোমাদের ভাত হজম হয় না। সেই নারীদের সম্পর্কে তোমাদের এতো অশ্রদ্ধা! বৎস! সত্য করিয়া বলো: কোনো গরুর সহিত শয়ন করিয়াছ? অপর পক্ষে, নারীদের সহিত প্রতিদিন শয়ন করিয়া স্বর্গসুখে উন্মত্ত হইয়া তাহাদের দেহ মন্থন করিয়া স্বার্থপরের মতো নিজেদের যৌনক্ষুধা মিটাইয়া থাকো। তাহাদের ক্ষুধা মিটিল কিনা, তাহার কথা ভাবিয়াও দেখো না। সঙ্গম সারিয়া তোমরা বজ্রনির্ঘোষে নাক ডাকাইতে আরম্ভ করো। আর নারী পরবর্তী ন মাস তোমার সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়া কতো না ক্লেশ স্বীকার করে! তারপরও সেই নারীদের তোমরা গরুর চাইতেও হেয় জ্ঞান করো! তোমরা এতো নিকৃষ্ট জীব!"

শেষের কথাটা দেবতা সঠিক বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হইলো। কিন্তু প্রতিবাদ না-করলে নারীরা পাছে আশকারা পায়, সেই হেতু হাত কচলে এবং যদ্দুর সম্ভব ছদ্মবিনয়ে বিগলিত হয়ে দেবতাকে আবার বললাম, হে দেব! নারীদের আমরা পূজা করিনে বটে, কিন্তু তাই বলে তাদের গরুর চেয়ে কম যত্ন করি, এই অভিযোগ সম্ভবত ন্যায্য নয়। বৈষম্যের একটা সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টার পুনর্বিবেচনা প্রার্থনীয়।

দিব্যজ্যোতি প্রসন্নবদন শান্তকণ্ঠ দেবতা হঠাৎ রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, "তুমি তো বাপু মহা ফাজিল! মুখে মুখে তর্ক করিতেছ? বৈষম্যের সব চাইতে বড়ো দৃষ্টান্ত হইল তোমরা নারীদের নিজেদের মতো মানুষ বলিয়াই গণ্য করো না। তোমরা তাহাদের যতো দূর সম্ভব শোষণ এবং ব্যবহার করো। কিন্তু তাহার পর তাহাদের একটা জন্তুর মতোও খাতির করো না। যেমন, গরুকে যত্নের সঙ্গে ঘাস খাওয়াও। খড়, জাবনা, খৈল এবং ফেন দেও। কিন্তু নারীদের কখনো নিজ হাতে কোনো খাবার পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়াছ? তোমরা নিজেরা গোগ্রাসে উদরপূর্ণ করিয়া শয্যায় আশ্রয় লও, কিন্তু যে-নারী তোমাদের আহার প্রস্তুত করিয়াছে, তাহারা খাইল কিনা অথবা কি খাইল কখনো খবর লইয়াছ? আমার মেজাজ খারাপ করিয়া দিও না, শেষে মুখে অভিশাপ বাক্য আসিয়া পড়িতে পারে। তাহা না-চাহিলে বুদ্ধিমানের মতো মৌন অবলম্বন করো।"

তোশামদ করে বললাম, হে মহাদেব! আমাকে শেষ কথা বলতে দেওয়ার নিবেদন মঞ্জুর করুন। দেবতা ক্ষণিকের জন্য নীরবে থেকে বললেন,"ঝটপট বলিয়া ফেলো!" আমি বললাম, "হে মহাদেব, গরুর এমন কিছু নেই, যা কাজে লাগে না। কিন্তু নারীরা বহু অনর্থের হেতু। বিশেষ করে তাদের নিয়ে পুরুষে পুরুষে প্রায়শ লড়াই লাগে। মুশকিল এই যে পীস কীপিং ফোর্স দিয়ে এ ধরনের লড়াই বন্ধ করা যায় না। শাস্ত্রে আপনারা বলেছেন, নারী নরকের দ্বার। পথে নারী বিবর্জিতা। নারীর কাম পুরুষের অষ্ট গুণ। কতো কি! তা ছাড়া, নারীরা মাঝে মধ্যে মশারির ভেতরে

থেকে বক্তৃতা করে— ইংরেজিতে একে কার্টেন লেকচার বলে। এই বক্তৃতা শাস্ত্র বিষয়ক সেমিনারের চেয়েও বিরক্তিকর। হে দেব, গরুকে নিয়ে এসব ঝামেলা মোটেই সহ্য করতে হয় না। গরুচোর গরুর প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকায় বটে, কিন্তু গরুকে নিয়ে ডুয়েল লড়ার কোনো কাহিনী শোনা যায় না। অতএব গরুকে নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা যায় কিনা, আপনিই ন্যায় বিচার করে রায় দিন!"

দেবতার প্রসন্নবদন আকস্মিকভাবে কুৎসিত আকার ধারণ করলো। বুঝলাম তিনি খুবই চটে গেছেন। তিনি প্রায় ভেঙচি দিয়ে বললেন, "তুমি অতীব বেহায়া। তিল মাত্র চক্ষুলজ্জা নাই। তাই এই রূপ বলিতেছ। নারীদের কী উদ্দেশে আমরা সৃষ্টি করিয়াছিলাম, আর তোমরা কিভাবে তাহাদের ভালোমন্দ উভয় কাজে সারাক্ষণই ব্যবহার করিতেছ! ধিক তোমাদের!"

আমার মুখ দিয়ে অনিচ্ছায় অস্ফুট এবং দুর্বোধ্য একটা শব্দ বেরিয়ে গেলো। দেবতা আরও উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে বললেন, "চুপ রও শয়তান! নারীদের তোমরা চরম অপব্যবহার করিতেছ। তুমি গবেট এবং কুতর্কবাগীশ। তথাপি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি— নারীদের কখনো শ্মশ্রু হইতে দেখিয়াছ ? নিষেধ করিতেছি— মুখ খুলিও না। তাহাদের কদাপি শ্মশ্রু হয় না। তথাপি ক্ষৌরিকর্মের বিজ্ঞাপনেও তাহাদের চিত্রই ব্যবহার করো। কৌটোর দুধ সাধারণত গরুর দুধ। কিন্তু তাহার বিজ্ঞাপনেও তোমরা নারীদের টানাটানি করো। নারী না-হইলে তোমাদের অশন, বসন, শয়ন, স্বপন— কিছুই হয় না। আবোল-তাবোল অর্থহীন কবিতা লিখিতেও নারীকে টানিয়া আনো। কেবল এঁড়ে তর্ক করিবার সময়ে নারীর তুলনায় গরুকে সেরা বলো। তোমরা পুরুষরা মহাভণ্ড এবং জীবজগতের কুলাঙ্গার। মহাদেব অচিরেই নারীদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া নারীবাদী নামক এক দল নারীবেশী পুরুষহন্তা পাঠাইবেন। তাঁহারা তাবৎ নারীবিদ্বেষী পুরুষদের নাশ করিয়া বিশ্বে শান্তি এবং সাম্য ফিরাইয়া আনিবেন। মনে রাখিও, শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর! যদি বিনাশ হইতে বাঁচিবার কিছুমাত্র বাসনা থাকে, তাহা হইলে এই দণ্ডে নাকে খত দিয়া নারীদের নিকট অতীতের সমস্ত অবিচার এবং অত্যাচারের জন্য জোড়হস্ত করিয়া আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আশ্বাস দিয়া বলিতে পারি, সেই নারী-বিপ্লবের পর অনন্ত কাল ধরিয়া বিশ্বে অসীম আনন্দের ধারা বহিতে থাকিবে।"

আমার ঘুম ভেঙে গেলো। স্বপ্ন দেখছিলাম বুঝতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যাক, নারীবাদী বিপ্লবের কাল অত্যাসন্ন নয়! এখনো কিছুকাল আমরা নির্বিবাদে নারীদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে পারবো! দে গরুর গা ধুয়ে!

(*প্রথম আলো*, ডিসেম্বর ২০০৬)

২
কারও পদতলে বেহেস্ত্ নয়

বিশ-একুশ শতকে যোগাযোগ ব্যবস্থার এতো উন্নতি হয়েছে যে, তা কল্পনাও করা যায় না। ফলে পৃথিবীটা সত্যি খুবই ছোটো হয়ে গেছে। একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যও এখন আর আগের মতো অবিকৃত রাখা সম্ভব নয়। তাতে এসে মিশে যায় অন্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। চীনা খাবার সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। হট-ডগ আর হ্যাম্বার্গার এখন ঢাকা-কলকাতার তরুণ-তরুণীরা শখ করে খান। যে-ইংরেজরা পঞ্চাশ বছর আগেও ভাত চিনতেন না, রাইস-কারি না-হলে এখন তাঁদের মুখে রোচে না। কিন্তু সারা বিশ্বের দূরত্ব এতো কমে গেলেও, পৃথিবীর তাবৎ সমাজ অভিন্ন হয়ে যায়নি। সমাজ বরং বহু ভাগে বিভক্ত এখনো। কেবল একটা জায়গায় গোটা বিশ্বের সমাজ এখনো অভিন্ন— সব সমাজ পুরুষশাসিত। পেশী আর আয় করার ক্ষমতা দিয়ে এখনো পুরুষরা মহারাজা নিজের নিজের পরিবারে। এতো বড়ো অন্যায়কে জ্ঞানবিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি সত্ত্বেও গোটা বিশ্ব মেনে নিয়েছে, এমন কি, সব ধর্মগ্রন্থও কমবেশি একে সমর্থন করেছে। সব ধর্মগ্রন্থেই বলা হয়েছে নারীরা পুরুষদের তুলনায় নিকৃষ্ট।

স্বামীর পদতলে নারীর বেহেস্ত— কোনো ধর্মগ্রন্থে এমন কথা লেখা নেই। তা সত্ত্বেও মনু থেকে শুরু করে আধুনিক ধর্মগুরুদের ফতোয়া কাজে লাগিয়ে নারীদের হীনতা এবং অধীনতাকে জোরদার করা হয়েছে। এক শতাব্দী আগে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মতো সমাজ-সংস্কারক তাই লিখেছিলেন যে, ধর্মগ্রন্থের দোহাই দিয়েই মহিলাদের পদতলে রাখতে চেষ্টা করেন পুরুষরা। তিনি আরও লিখেছিলেন যে, ধর্মপ্রবর্তকরা মহিলা হলে ধর্মীয় বিধিবিধান হয়তো অন্যভাবে লেখা হতো। বস্তুত, ধর্মের নামে মহিলাদের শাসন-শোষণ করার অপচেষ্টা আজও অব্যাহত রয়েছে। তাই তসলিমা নাসরিনের মতো এ যুগের সংস্কারকরাও ধর্মের সমালোচনায় সোচ্চার হন।

একটু নজর দিলেই দেখা যায়, আজকের জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগেও পুরুষরা ধর্মগ্রন্থের দোহাইতো দেনই, তা ছাড়া আরও বিচিত্র উপায়ে স্ত্রীদের দাসীর মতো অধীনে রাখতে চেষ্টা করেন। না, ভুল বললাম, চাকরানির যে-সব মৌলিক অধিকার তাঁরা দিতে বাধ্য থাকেন, স্ত্রীকে তারও সবগুলো দেন না। প্রকৃত পক্ষে, যেসব কাজ চাকরানিরও করতে হয় না, স্ত্রীর তাও করতে হয়। স্বামী-স্ত্রীর বৈষম্য এতো বেসুমার এবং পর্বতপ্রমাণ যে, তার গোটা কয়েক মোক্ষম দৃষ্টান্ত দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তবু চেষ্টা করছি। যেমন, ভালো-ভালো রান্নার সিংহভাগ কে খায়? স্বামীরা, না স্ত্রীরা? ঘরের কাজগুলো সবই অথবা বেশির ভাগই কে করে?

পুরুষরা, না মেয়েরা ? অতি-প্রয়োজনীয় জিনিশের বাইরে যেসব ব্যয় করা হয়, সেই শখ পূরণের বেশির ভাগ ব্যয় কে বেশি করে ? পুরুষরা, না নারীরা ? ন মাস ধরে গর্ভ ধারণ করার অসহ্য যন্ত্রণা কে সহ্য করে ? পুরুষরা, না মেয়েরা ? তার পর সেই সন্তান মানুষ করার দায়িত্ব কে বেশি পালন করে ? পুরুষরা, না মেয়েরা ? এই সন্তান উৎপাদন এবং লালন-পালন করার ব্যাপারে বেশির ভাগ পুরুষের ভূমিকা কী ? স্ত্রীকে একবার অথবা কয়েকবার যৌনসঙ্গম করে তার অমূল্য শুক্রাণু দান করা, এই তো! সেই যৌনসঙ্গমের সময়ে স্ত্রী সুখ অথবা চরম সুখ পেলেন কিনা, তারও হদিস নেন না পুরুষপ্রবর। তসলিমা নাসরিন যে লিখেছেন, "প্রতি রাতে আমার বিছানায় এসে শোয় এক নপুংসক পুরুষ। ... আমাকে উত্তপ্ত করে নপুংসক বেঘোরে ঘুমোয়।"—সে কথা খাঁটি, সর্বাংশে।

কিন্তু স্ত্রীকে শোষণ করে যে সুখ নেই, এমন কি উপর্যুপরি রমণ করেও সুখ নেই, এটা পুরুষরা অনেক কাল আগেই টের পেয়েছিলেন। ভাষাহীন বালিশ অথবা বস্তার সঙ্গে আদানপ্রদান হয় ? অশিক্ষিত স্ত্রী কি একজন শিক্ষিত পুরুষের সঙ্গিনী হয়ে উঠতে পারে ? পুত্র জন্ম দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে সত্যিকারের বোঝাপড়ার ভিত্তিতে একটা উপভোগ্য সম্পর্ক তৈরি হতে পারে ? পারে না। ধরা যাক, সমাজে কৃতিত্বযোগ্য কিছু করলে বাড়িতে এসে স্ত্রীকে সেটা খবর হিশেবে জানানো সহজ, কিন্তু তার মর্ম অথবা গুরুত্ব শিক্ষাহীন অথবা বাঁদিমার্কা স্ত্রী অনুভব করতে পারবেন কি ? পারবেন না। তাই উনিশ শতক থেকে গোটা বিশ্বেই শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের মধ্যে এক অপূর্ণতার ভাব দেখা দেয়। সেই অভাববোধ থেকে দেখা দেয় স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন।

লক্ষ্য করবেন, মেয়েদের স্কুলে যারা লেখাপড়া শেখে, তারা স্ত্রী নয়, বালিকা; তা সত্ত্বেও বাংলায় সেই শিক্ষাকে বলে স্ত্রীশিক্ষা। তার কারণ, উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষিত পুরুষরা গোপনে স্ত্রীদেরই প্রথমে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। মেয়েদের শিক্ষার নাম তাই হয়ে যায়, স্ত্রীশিক্ষা। তা ছাড়া, পরে যখন বালিকাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়, তখনও তাকে বলা হয় স্ত্রীশিক্ষা। কারণ, মেয়েদের স্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াই ছিলো তার উদ্দেশ্য। সে যুগে, এমন কি, বিশ শতকের গোড়াতেও, মেয়েদের লিখতে-পড়তে শেখানো হতো, কিছু অঙ্ক করা শেখানো হতো, কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া হতো চিঠি লেখার ওপর। বেচারা বালিকারা না-প্রেম জানতো, না-জানতো প্রেমপত্র লেখার উপযুক্ত ভাষা। তাই সেকালে চিঠি লেখার অনেক বই প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু এ ধরনের শিক্ষার আয়োজন করলেও কর্তারা অথবা সাহেবরা মেয়েদের পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। কোনো কোনো সংস্কারক বরং মেয়েদের গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদির মতো বিষয় না-শেখানোর দাবি করেছেন। তাঁদের মতে, এ সব বিষয় শেখালে নারীদের কোমলতা বিনষ্ট হতে পারে।

বিশেষ করে এ ধারণা তখন জন্ম নেয়নি যে, নারীও মানুষ এবং সব ব্যাপারে তাঁরা পুরুষের সমান। সত্যি বলতে কি, এ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন বঙ্গদেশ কেন, পৃথিবীর অন্য কোনোখানেও বিশ শতকের আগে দেখা দেয়নি। বিশ শতকে এসে তবেই পশ্চিমা জগৎও স্বীকার করলো যে, মেয়েরাও মানুষ এবং তাঁদের শিক্ষা লাভের অধিকার আছে। অবশ্য তখনও পুরুষকুলের বিশ্বাস থাকলো যে, মেয়েদের মেধা পুরুষের তুলনায় নিম্নমানের। লেখাপড়ায় তাঁরা চিরদিন পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে থাকবেন। সুতরাং তাঁরা যখন অফিসে কাজ করতে আরম্ভ করেন, তখন তা হলো কনিষ্ঠ কেরানির। তা ছাড়া, মেয়েদের জন্যে বেতনও নির্ধারিত হলো পুরুষের তুলনায় কম। ১৯৮৬ সালের আগে পর্যন্ত ব্রিটেনেও এ অন্যায় নিয়ম বেআইনী বলে বিবেচিত হয়নি। এমন কি, তখনো এ ধারণা বহুলভাবে প্রচলিত ছিলো যে, ব্যবস্থাপনার কাজে তাঁদের ওপর নির্ভর করা যায় না। এমন কি, শয্যায়ও তাঁরা নিম্নশ্রেণীর। সেখানে তাঁরা তুলনামূলকভাবে অসক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। দাপাদাপি করে সুখ নেবেন পুরুষরা।

তবে নারীদের ইতর শ্রেণীর জীব হিশেবে গণ্য করলেও, এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে নিজেদের সঙ্গী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা পুরুষরাই অনুভব করেছিলেন, এবং নিজেদেরই স্বার্থে। তাই তার জন্যে উদ্যাগও গ্রহণ করেছিলেন তাঁরাই। ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত নারীমুক্তির যেসব ইতিহাস লেখা হয়েছে, সেসব বেশির ভাগই হলো: সেই উদ্যোগের কথা— নারীর অবস্থার উন্নতির জন্যে পুরুষরা কী কী করেছেন, তার ইতিহাস। পরবর্তী পর্যায়ে প্রশ্ন দেখা দিলো: পুরুষদের এই তথাকথিত নারীমুক্তির প্রয়াসে মহিলারা কিভাবে সাড়া দিয়েছেন। তার চেয়েও বড়ো কথা নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্যে মহিলারা নিজেরা কী করেছেন? সে জন্যে মোটামুটি ১৯৮০-এর দশক থেকে নারীমুক্তির ইতিহাসের বিষয়বস্তু পাল্টে গেলো। যেমন, বাঙালি মহিলাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে রামমোহন রায়, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সমাজ-সংস্কারক যে-আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন সে কথা উষা চক্রবর্তী পর্যন্ত অনেকেই লিখেছিলেন। কিন্তু মহিলারা পুরুষদের সেই প্রচেষ্টার প্রতি কেমন সাড়া দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে আমিই প্রথম বই লিখি "রিলাক্টেন্ট ডেবিউটেন্ট" নামে, ১৯৮২ সালে। এ বইয়ের নাম থেকে পুরুষদের প্রয়াসের প্রতি প্রথম দিকের মহিলাদের উৎসাহের অভাবই বোঝা যায়। বই-এর উপশিরোনামে আমি তাই আর-একটু ব্যাখ্যা করে লিখি "রেসপন্স অব বেঙ্গলি উইমিন"। তারপর বাঙালি নারীদের উন্নতির ইতিহাস মেরেডিথ বোর্থউইক, মালবিকা কার্লেকার, মল্লিকা সেনগুপ্ত, সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, চিত্রা দেব ইত্যাদি অনেকেই লিখেছেন। তাঁরাও সবাই পুরুষদের প্রয়াসের বদলে মহিলাদের প্রচেষ্টা এবং প্রতিক্রিয়ার প্রতি বেশি জোর দিয়েছেন।

মেয়েদের মধ্যেও এ সময়ে নারীমুক্তির ধারণা পাল্টে যায়। এক সময়ে মনে করা হতো, মেয়েরা একটু লেখাপড়া শিখলে, বাইরে চলাফেরা করতে পারলে, আধুনিকা ও কেতাদুরস্ত হলে, সন্তান মানুষ করতে পারলে, স্কুলে শিক্ষকতা অথবা অফিসে সেক্রেটারির কাজ পারলে অথবা নার্স হতে পারলে, তার ওপর আবার একটু গান-টান জানলে— ব্যস, তাঁরা হলেন বিদগ্ধ, শিক্ষিত, মুক্ত নারী। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এসে এ ধারণায় ফাটল ধরে। এ সময়ে মেয়েরা উচ্চশিক্ষার দিকে গেলেন। কেবল তাই নয়, তাঁরা ছেলেদের চেয়ে ভালো ফলাফল করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকরি পেলেন। অপর পক্ষে, তাঁদের বড়াই-করা পুরুষ বন্ধুরা থাকলেন পিছিয়ে। অন্যান্য পেশাতেও তেমনি পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করলো।

এখন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেও মহিলারা অনেক পুরুষালি কাজ করছেন। গাড়ি চালান, বিমান চালান, পুলিশে কাজ করেন, এমন কি ফৌজী বাহিনীতে যোগ দেন। জজ, ব্যারিস্টার, ডিসি, সচিবের তো কথাই নেই। দেশের অনেক পার্লামেন্ট সদস্যই মহিলা। এমন কি, বাংলাদেশে পর-পর দু-দুজন মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন। এঁদের "ম্যাডাম, ম্যাডাম" করে পুরুষরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, একজন মহিলাও কর্তৃত্বের পদে বসতে পারেন, এবং বসলে তাঁকে মান্য করতে হয়। সত্যি বলতে কি, রাজনীতির মাধ্যমে মেয়েদের সমান অধিকার যতোটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে হবে। এ কথা পশ্চিমা জগৎ সম্পর্কে যেমন সত্য, তেমনি সত্য ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, এমন কি, পাকিস্তান সম্পর্কেও। খালি মধ্যপ্রাচ্যে এখনো ধর্মের মোটা বোরকা দিয়ে এই অধিকার ঢেকে রাখা হয়েছে।

নারীদের প্রতি পুরুষ সমাজের ধারণা একদিনে বদলে যায়নি। অন্তত দেড় শো বছর লেগেছে তার জন্যে। তার ফলে এখন পুরুষদের সঙ্গে বৈষম্যের আইন এবং রীতি দূর হয়েছে। মোটামুটি সমান অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই স্বীকার করতে হবে, এসবের ফলে পরিবার এবং সমাজে নারীদের প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি পাল্টে গেছে অনেকাংশে। স্বামীদের কাছ থেকে তাঁরা যা আশা করেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা পূরণ হয় না। ফলে কেলেঙ্কারীর ভয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ না-করলেও, পরিবারের ভেতরে আগের তুলনায় মন কষাকষি এবং উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব হলো নারীমুক্তির ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক। বিশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে নারীমুক্তি কেবল নারীদের প্রতি বৈষম্য দূর করার চেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তার ঝোঁকটা পাল্টে গেছে— এখন আর নারীর উন্নতি নয়, যথার্থভাবেই এবং যুক্তিসঙ্গতভাবেই নারীও যে পুরুষদের মতো সমান মানুষ— নারীসমাজ এটার দিকেই নজর দিয়েছেন। যতো দিন নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, ততোদিন পুরুষরা অনুগ্রহ করে যেটুকু দিতেন— এমন কি, শয্যায়ও যতোটুকু দিতেন, সেটাকেই সাধারণ মেয়েরা মেনে এসেছেন স্বাভাবিক বলে, কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার পর তার স্বাদ পেয়ে তাঁদের মনের অবস্থা এবং প্রত্যাশা বদলে গেছে দ্রুত গতিতে।

অধিকার সম্পর্কে অনেক মহিলা সচেতন হয়েছিলেন উনিশ শতক থেকেই। তাঁদের সংখ্যাও বাড়ছিলো। অবশ্য পরিবেশ অনুকূল না-থাকায় লড়াইতে তাঁরা তেমন জুত করতে পারেননি। লেখাপড়া করতে গেলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার দিলো না। (অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ এই অধিকার দেয় ১৯২০ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে।) মেয়েরা সম্পত্তিতে অধিকার চাইলেন, কিন্তু ১৮৮৫ সালের আগে ব্রিটেনে তার কোনো স্বীকৃতিই ছিলো না। তাঁদের সেই অধিকার ধাপে ধাপে স্বীকৃত হয় এক শো বছর ধরে। এখন বিয়ে না-করে আপনি কোনো মেয়ের সঙ্গে ছ মাসের বেশি একত্রে বাস করলে তিনি আপনার সম্পত্তিতে অধিকার দাবি করতে পারেন! মেয়েরা ভোটাধিকার চাইলেন, কিন্তু পঞ্চাশ বছরের চেষ্টাতেও তা পেলেন না। (আর কোনো কোনো আরব দেশ এখনো সে অধিকার দেয় নি!)

মেয়েদের ঠেকিয়ে রাখার নানা উপায় ছিলো। সবচেয়ে বড়ো উপায় ছিলো সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোয়। সেখানে ক্ষমতা কুক্ষিগত ছিলো পুরোপুরি পুরুষদের হাতে। তা ছাড়া, মেয়েদের অত্যাচার বলছিনে, কিন্তু দমিয়ে রাখার আরও উপায় ছিলো। তাঁদের গর্ভবতী করে দিতে পারলে দুতিন বছরের জন্যে বেশ নিশ্চিন্ত থাকা যেতো। গর্ভবতী হওয়াও ছিলো খুব সহজ। জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো উপায় ছিলো না— কনডম ছিলো না, অপারেশান ছিলো না, পিল ছিলো না, গর্ভপাতের ব্যবস্থাও ছিলো অপ্রতুল। সুতরাং তাঁদের ওপর কয়েকবার চেপে বসতে পারলেই গর্ভ হতো। এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের মায়ের চোদ্দোটি সন্তান হয়েছিলো। তা-ও দেবেন্দ্রনাথ বেশির ভাগ সময় কলকাতায় থাকতেন না। এমন চোদ্দো সন্তানের জননীর শ্বাস ফেলার সময় আছে! অথবা স্বাধীনতা কী বস্তু, তা ভাববার!

এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে পরিবারের ভেতরে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করা ছিলো একেবারে অত্যাবশ্যক। এই উন্নতির একটা অংশ ছিলো সন্তানদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। তাই গর্ভ ঠেকিয়ে রাখার উপায় নিয়ে তাঁরা গবেষণা করতে থাকেন। একটা সনাতন উপায় তো ছিলোই! গর্ভপাত ঘটানো। (অবাঞ্ছিত গর্ভ হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ জন্যে মেয়েদের খুনও করা হতো!) কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে কিভাবে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে, নিরাপদে গর্ভপাত করা যায়, তার ব্যবস্থা হতে থাকে। এমন কি, একজন দুঃসাহসী মহিলা লন্ডনে গর্ভপাত করার একটা ক্লিনিকও খুলে বসলেন সমাজের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু সমাজের বিরোধিতার মুখে সেখানে সহজে সাফল্য আসতে পারেনি। ধর্মীয় চাপও কম প্রবল ছিলো না। এখনো ক্যাথলিক দেশ আয়ারল্যান্ডে গর্ভপাত করা নিষিদ্ধ। কয়েক বছর আগে একটি পনেরো বছরের মেয়েকে তার বাবার বন্ধু ধর্ষণ করে গর্ভবতী করেন। তবু সেই মেয়েটিকে গর্ভপাত করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তারপর সে দেশে গর্ভপাত নিয়ে যে-গণভোট হয়, তাতেও গর্ভপাতের অধিকার স্বীকৃত হয়নি। আর, অ্যামেরিকায় আইন থাকলেও সেখানেও একটা বিরাট গোষ্ঠী এর তীব্র বিরোধী। যে-ডাক্তাররা গর্ভপাত করেন, তাঁদের খুন করার ঘটনাও ঘটেছে সেখানে।

তা সত্ত্বেও মহিলারা থেমে থাকলেন না। গর্ভের সঙ্গে যুক্ত অন্য তাবৎ বিষয় নিয়ে তাঁরা গবেষণা করতে থাকলেন। এমন কি, এ ব্যাপারে পুরুষ বিজ্ঞানীরাও এগিয়ে আসেন। মেয়েদের সাধারণত কখন গর্ভ হয়, গর্ভের সঙ্গে হর্মৌনের যোগাযোগ কী, সেই হর্মৌনের নিয়ন্ত্রণ করে কিভাবে গর্ভ ঠেকিয়ে রাখা যায় ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়েই তাঁরা গবেষণা করতে থাকেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধেই তাঁরা সেটা আবিষ্কার করে ফেলেন। এমন কি, সে রকমের গর্ভনিরোধক বড়িও তৈরি করেন তাঁরা। কিন্তু ১৯৬০ সালের আগে সরকারী অনুমোদন মেলেনি সে বড়িকে আইনসঙ্গতভাবে ব্যবহার করার।

সম্প্রতি (২০০৪) ঢাকার *কালি ও কলম* পত্রিকায় এই বড়ি বা পিল সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যমূলক এবং মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন পূরবী বসু। পিল সম্পর্কে যাঁরা আরও জানতে চান, তাঁরা এই প্রবন্ধ পড়ে দেখতে পারেন। এই পিল কি করে আবিষ্কার হলো, কারা তাতে প্রধান ভূমিকা পালন করেন, এই পিলের গুণাগুণ কী ইত্যাদি সব খবরই আছে এই প্রবন্ধে। সেই সঙ্গে এই পিল নারীমুক্তিতে যে-অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে, তারও বিবরণ দিয়েছেন পূরবী বসু। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধের সমালোচনা হয়েছে। এমন কি, আশ্চর্যের বিষয়, মেয়েরাও সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বিশেষ করে জোর দিয়েছেন স্বাস্থ্যের ওপর পিলের কী ধরনের প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে, তার ওপর। যেমন, তাঁরা বলেছেন যে, বহু বছর ব্যবহার করলে পিল থেকে কোনো কোনো রকমের রোগ হওয়া অসম্ভব নয়। সত্যি বলতে কি, কোন ওষুধটা আছে এই পৃথিবীতে, যা বহু বছর ব্যবহার করলে তা থেকে আর-

একটা রোগ দেখা দিতে না-পারে ? সুতরাং পিলের এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা বলে পিলের গুণ এবং তার ভূমিকাকে ছোটো করে দেখা আসলে অযৌক্তিক; এবং তা হলে সেটা হবে একটা মহান ব্যাপারকে ছোটো করে দেখার সামিল। পিল ব্যবহারের ফলে মহিলারা নিজেদের পরিবারের আয়তন নিয়ন্ত্রণের অসামান্য অধিকার পেয়েছেন। এমন কি, অনেক মহিলা গোপনে পিল খেয়ে স্বামীর অত্যাচার থেকে নিজেদের রক্ষা করেছেন। পিল যুগ যুগ জীউ!

জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়া, পিলের সঙ্গে নারীমুক্তির ইতিহাসের আর-একটা যোগাযোগ ঘটলো পিল বাজারে ছাড়া পাওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে। আমার ধারণা, সেই অসাধারণ ঘটনার কথা না-বললে নারীমুক্তির ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক অকথিত থেকে যায়। সন্তানের সংখ্যা সীমিত রাখার সুযোগ পেয়ে যৌনতার একটা ফলাফল থেকে মহিলারা বেঁচে গেলেন। কিন্তু তা দিয়ে তাঁদের সমস্ত অধিকার আদায় হলো না। মহিলারা যৌনতা কতোটা উপভোগ করেন, কতোটা উপভোগ করতে চান, পুরুষ সে প্রত্যাশা কতোটা পূরণ করেন— এসব তখনো অজানা ছিলো। আন্দাজ-অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই নারী এবং পুরুষ গবেষকরা এসব নিয়ে কথা বলতেন। কিন্তু বিবাহিত না হয়েও যে মহিলারা যৌনসুখ প্রত্যাশী হতে পারেন, তা পরিষ্কার হয়ে গেলো কয়েক বছরের মধ্যে। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত "সেক্স এবং দ্য সিঙ্গল গ্যর্ল" নামে একটি বই বিক্রয় তালিকার শীর্ষে চলে গেলো। কয়েক বছরের মধ্যে অবিবাহিত মেয়েদের যৌনতা নিয়ে আরও কয়েকটি বই এবং কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু একেবারে নতুন দিগন্ত খুলে গেলো ১৯৬৬ সালে— মাস্টার্স এবং জনসনের বই প্রকাশিত হওয়ার পরে।

উইলিয়াম মাস্টার্স এবং ভ্যর্জিনিয়া জনসন এগিয়ে এসেছিলেন মধ্যবিত্ত নারীদের যৌনতা সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যে। এঁরা ৬৯৪ জন পুরুষ এবং মহিলার চরম যৌনসুখ সম্পর্কে গবেষণা করেন। এবং সেই গবেষণার ভিত্তিতে ১৯৬৬ সালে তাঁরা "হিউম্যান সেক্সুয়াল রেসপন্স" নামে একটি বই লেখেন। তাতে পুরুষদের যৌনতা সম্পর্কে পিলে চমকে দেওয়ার মতো কোনো তথ্য ছিলো না, কিন্তু ছিলো মেয়েদের যৌনতা সম্পর্কে। বিশেষ করে তাঁদের যৌনজীবনের অপূর্ণতা এবং হতাশা সম্পর্কে। তাতে দেখা যায় যে, মেয়েরা পুরুষদের মতোই যৌন আনন্দ উপভোগ করতে সমর্থ এবং আগ্রহী। তবে পুরুষরা স্বার্থপরতার কারণে তাঁদের স্ত্রী অথবা মেয়েবন্ধুর যৌনজীবনের পরিপূর্ণতার খবর রাখেন না। অথবা তাঁদের হতাশা থাকলে তা দূর করার কোনো সক্রিয় প্রযত্ন করেন না। এই জন্যে এই গবেষকরা উপদেশ দেন যে, তাঁদের নারীসঙ্গিনীর যৌনতৃপ্তি দিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ কমানোর জন্যে পুরুষদের আরও বেশি যত্নশীল হতে হবে। এই গ্রন্থ যে মহিলাদের যৌনতা সম্পর্কে বহু নিষিদ্ধ ধারণাকে বরবাদ করেছিলো, এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই। এবং অনেকটা এর ফল হিশেবে মহিলারা বিবাহ সম্পর্কের মধ্যে থেকেও নানা উপায়ে অথবা বিবাহ বহির্ভূত

নানা সম্পর্কের মাধ্যমে যৌনসুখ পাওয়ার ব্যাপারে আগের তুলনায় বেশি আগ্রহী এবং উৎসাহী হন। লেজবিয়ান সম্পর্কও এ সময়ে জোরদার হতে থাকে।

একবার মাস্টার্স এবং জনসনের বই প্রকাশিত হওয়ার পর এ ব্যাপারে বই লেখার অথবা যৌনসুখ বাড়ানোর উপায় নিয়ে বই লেখার আরও কোনো বাধা থাকলো না। ১৯৭১ সালে ডেইভিড রুবেন লেখেন "অ্যানি উম্যান ক্যান" এবং তার চেয়েও মূল্যবান এবং সচিত্র বই অ্যালেক্স কমফর্টের "দ্য জয় অব সেক্স" (১৯৭২) এবং "মোর জয় অব সেক্স" (১৯৭৪)। সত্যি বলতে কি, মার্স্টার্স অ্যান্ড জনসনের-এর গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর আরও বহু গবেষণা হয়েছে এবং তার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে দেখা যায় যে, প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ মহিলা কোনো সময়ই চরম সুখ পান না। চরম সুখ পাওয়ার জন্যে যে-শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা দরকার, তাঁদের তা নেই। ব্যাপারটা কি, তা-ই তাঁরা জানেন না। অপর পক্ষে, যাঁরা চরম সুখ পেতে শারীরিকভাবে সক্ষম, তেমন মেয়েরাও বেশির ভাগই সময়ই পুরুষ-শরিকের নিষ্ক্রিয়তার ফলে চরম সুখ লাভ করেন না। তাঁরা যে চরম সুখের খোঁজে বিবাহ-বহির্ভূত নানা রকম সম্পর্ক গড়ে তুললেন, তাকে অনেক পুরুষ, এমন কি, অনেক সনাতনপন্থী মহিলাও এক কথাতেই অ-সতীত্ব বলে মার্কা মেরে দিলেন। অর্থাৎ বহু শতাব্দীর বঞ্চনা এবং প্রবঞ্চনাকে এতো দিন সতীত্বের নামে গৌরবারোপিত করে ঢেকে রাখা হয়েছিলো, কিন্তু পিল এসে সতীত্বের সেই কিংবদন্তীকে ভেঙে দিলো।

অথচ তত্ত্বত এটা স্বীকার করে নিতেই হবে যে, অন্য পাঁচজন মানুষের অর্থাৎ পুরুষ মানুষের মতো মেয়েদেরও যৌনজীবনের পরিপূর্ণতা লাভের সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এবং সে অধিকার পূরণ না-হলে মানুষ হিশেবে সে নারীর জীবনে পূর্ণতা আসতে পারে না, স্বাধীনতা লাভ দূরে থাক। মহিলাদের মুক্তির এই দিকটা উন্মুক্ত করে দিয়েছে পিল। পূরবী বসু পিলের অন্য দিকটা নিয়ে বললেও নারীমুক্তির একটা বড়ো দিকে তার ভূমিকা কী, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলেননি।

প্রসঙ্গত নারীমুক্তির আরও কয়েকটি দিক সম্পর্কে বলা দরকার। কারণ এ সম্পর্কে আমাদের দেশের সর্বশক্তিমান পুরুষদের ধারণা তো ভ্রান্ত বটেই, এমন কি, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মহিলাদের ধারণাও ভ্রান্ত। বেশির ভাগ লোকই মনে করেন যে, নারী স্বাধীনতার মানে হলো নারীদের শিক্ষা, চার দেওয়ালের বাইরে যাওয়ার অধিকার, এবং পরিবারের মধ্যে খানিকটা অধিকার লাভ, বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে অধিকার। কিন্তু এইটুকু নিয়েই কি একজন নারী তাঁর জীবনের পরিপূর্ণতা অনুভব করতে পারেন?

সমস্যাটা মেয়েদের নিজেদের লেখা থেকে আমি বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। প্রথমে পড়ি চীনা মহিলাদের লেখা একটি বই। এতে তাঁরা লিখেছিলেন যে, গৃহবধূ হিশেবে বেঁচে থাকার ব্যাপারেই তাঁরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। বিরক্তি ধরে

গিয়েছিলো তাঁদের জীবনেই। তাঁরা তাই মনে করলেন, তাঁরা এমন একটা কিছু করবেন যা থেকে সন্তোষ এবং পরিপূর্ণতার স্বাদ পেতে পারবেন। এ জন্যে তাঁরা দশ পনেরোজন মিলে একটি ছোটো কারখানা করলেন। সেখানে ছোটো ছোটো খেলনা তৈরি করতে আরম্ভ করেন তাঁরা। তাঁদের এই প্রয়াস দু'দিক থেকে সফল হয়— একদিকে, এ থেকে তাঁরা টাকাপয়সা উপার্জন করার সুযোগ পান, কিন্তু তাঁর চেয়েও বড়ো একটা আনন্দ পান এই ভেবে যে, বাড়ির চার দেয়ালের বাইরে তাঁরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। অর্থাৎ তাঁদের সংজ্ঞা অনুযায়ী নারীর জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের জন্যে তাঁদের রীতিমতো সমাজ এবং অর্থনীতিতে একটা অর্থবহ ভূমিকা রাখতে হবে। নারী-জীবনের সাফল্যের অন্যান্য দিকের মধ্যে আছে পুরুষদের সমান অধিকার লাভ, ব্যবস্থাপনার কাজে অধিকার, নেতৃত্ব দানের অধিকার। এবং তাঁরা যে যে-কোনো পুরুষের সমান মেধার অধিকারী এবং যে-কোনো কাজ করার মতো ক্ষমতার অধিকারী— এই ধারণাও তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে চান।

বাঙালি অথবা পশ্চিমা মহিলাদের সঙ্গেও আলাপ করে বোঝার চেষ্টা করেছি, কী তাঁদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ— অর্থাৎ পারিবারিক জীবনের বাইরে। তাতে আমার মনে হয়েছে, পরিবারে স্বামী, সন্তান এবং স্বামীর ও নিজের তরফের আত্মীয়দের নিয়ে যে-পরিধি রচিত হয়, তার মধ্যে থেকেই তাঁরা ঠিক সুখী হন না। বরং তার বাইরে চাকরি সূত্রে তাঁদের যে একটা পরিচিতি এবং বন্ধুত্বের মহল তৈরি হয়, সেখানে তাঁরা জীবনের সফলতা খোঁজেন। সেখানে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু করতে পারলে তৃপ্তি পান। অপর পক্ষে, সেখানে ব্যর্থ হলে বিষাদ নেমে আসে।

সামাজিক পরিবর্তনের ফলে মহিলাদের ভাবমূর্তিরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে প্রকাশ্য সমাজে মহিলা বলতে বোঝাতো গুরুগম্ভীর, বোবার মতো একজন মানুষ; কিন্তু নারীমুক্তির ধারণা এসে তাঁদের কথা বলার, তর্ক করার এবং বক্তব্য রাখার অধিকার দিলো। তাঁরা আর চুপ করে থাকলেন না। তাঁরা রসিকতা করতে আরম্ভ করলেন। এমন কি, এ রকমের রসিকতা, যা আগে পুরুষের একচেটিয়া ছিলো। তাঁরা প্রকাশ্যে খিলখিল করে হাসতে শুরু করলেন, যেটাকে আগে মেয়েদের জন্যে অভব্যতা বা অশিষ্ট বলে মনে করা হতো। এখনো এ ধারণা যে একেবারে চলে গেছে, তা নয়। কদিন আগেও রিপা নামে আমার এক পাঠিকা আমাকে লিখেছেন যে, তিনি জোরে হাসায় তাঁর বড়োকর্তা— ব্যাংকের ম্যানেজার— এসে তাঁকে শাসন করেন।

সমাজে যখন নারীদের জায়গাটা প্রশস্ত হলো, তখন পোশাকের দিকেও তাঁরা নজর দিলেন। এমন কি, নিজের শরীরে যেসব সৌন্দর্যের বস্তু আছে, তাও অল্পবিস্তর প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। কারণ, তা দিয়ে তাঁরা সমাজের আর-পাঁচজন মানুষ— নারী ও পুরুষ— উভয়কেই মুগ্ধ করতে চেষ্টা করেন। কোনো একটা পোশাক পরে অফিসে অথবা পার্টিতে গেলে যদি স্মার্ট লাগে, সুন্দর লাগে, তা হলে সে পোশাক

তাঁরা কেন পরবেন না ? কেন তা দিয়ে অন্যের চোখে নিজের একটি প্রভাব বিস্তার করার মতো ভাবমূর্তি গড়ে তুলবেন না ?

পশ্চিমা দেশগুলোতে এখন নারীর সমান অধিকার কমবেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাঁরা নারীদের নির্যাতিত একটি শ্রেণী হিশেবে দেখতেন এবং সেই শ্রেণীর সদস্য হিশেবে নিজেদের শনাক্ত করতেন, অর্থাৎ নিজেদের নারীবাদী হিশেবে চিহ্নিত করতেন, তাঁরা যে তাই বলে সুখী হয়েছেন, তা মনে করার অবশ্য কারণ নেই। কারণ, বৈষম্য দূর হলে অথবা সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেই সুখ আসে না। সুখ একটা মানসিক অবস্থা। সে জন্যে নারীবাদীরা এখন অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, অতঃপর কী? অধিকার, প্রতিষ্ঠা, জীবনের সাফল্য, পুরুষের সমান হওয়ার বাসনা— সবই দরকার; কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থাকে: জীবনে সুখী হচ্ছি তো ? অনেক লড়াইয়ের পর পোস্ট-ফেমিনিস্টরা এখন কী পাইনি তার হিশাব মিলাতে ব্যস্ত। কিন্তু, তওবা, অন্তত ফের তাঁরা পুরুষের পদতলে বেহেস্ত্ খুঁজবেন না!

(*যুগান্তর*, জানুয়ারি ২০০৫)

৩

রোকেয়া : অবদান ও সীমানা

ঠাকুর পরিবারের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী, পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী অথবা দৌহিত্রী সরলা দেবী কী করে শিক্ষিত এবং আধুনিক হলেন, তা খানিকটা আঁচ করা যায়। কিন্তু লেখাপড়ায় পিছিয়ে-থাকা একটি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের কন্যা রোকেয়া* কী করে শিক্ষিত এবং, তার চেয়েও বড়ো কথা, নারীবাদী হলেন, তার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। বরং অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব মনে হয় একে। তিনি এমন এক পরিবারে জন্মেছিলেন, যেখানে কেবল পুরুষদের সামনে নয়, পাঁচ বছর বয়স থেকে তাঁকে অপরিচিত মহিলাদের সামনেও পর্দা পালন করতে হতো। সে পরিবারে মেয়েদের শিক্ষা নেওয়া, বিশেষ করে বাংলা অথবা ইংরেজি— তা-ও নিষিদ্ধ ছিলো। স্কুলে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আর, মুসলমান মেয়েদের পড়ার কোনো স্কুলও ছিলো না তখন। এই পরিবেশে বড়ো বোন করিমুন্নেসার কাছ থেকে রোকেয়া খানিকটা বাংলা শিখেছিলেন এবং বড়ো ভাই ইবরাহিম সাবের তাঁকে লেখাপড়া করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। বোধ হয় ইংরেজরি অআকখও শিখিয়েছিলেন। কিন্তু এ রকম শিক্ষা এবং উৎসাহ উনিশ শতকে অনেকেই পেয়েছিলেন। তাঁরা কেউ রোকেয়া হননি।

রোকেয়া লিখতে আরম্ভ করেন বিশ শতকের একেবারে শুরুতে— ১৯০৩ সাল থেকে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *মতিচূর*। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩১১ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৪ সালে। এই বইয়ের একাধিক প্রবন্ধে তিনি নারীমুক্তি এবং নারীদের সামাজিক উন্নতির কথা বলেন। নিজের জীবনে তিনি পর্দার নিপীড়ন এবং নারীদের নির্যাতন লক্ষ্য করেছিলেন। বহুবিবাহের কুপ্রথা দেখার জন্যে তাঁকে আদৌ দূরে দৃষ্টি দিতে হয়নি। তাঁর পিতা সম্ভবত চারবার বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন এক আইরিশ নারী। সিপাহী বিপ্লবের সময়ে আশ্রয় দিয়ে এঁকে অস্থায়ী স্ত্রী করে নিয়েছিলেন। অস্থায়ী বলছি এ জন্যে যে, এ বিয়ে বেশি দিন টেকেনি। সমাজের দিকে তাকিয়েও রোকেয়া সেখানে দেখেছিলেন অবরোধের নিপীড়ন এবং অশিক্ষার অন্ধকার। এসব তাঁকে নারীমুক্তি সম্পর্কে সচেতন করে থাকবে। কিন্তু সেকালের অভিজাত পরিবারের অন্য নারীরাও কমবেশি একই পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন। তাঁরা রোকেয়ার মতো সচেতন অথবা সোচ্চার হননি। আমার ধারণা, তাঁর ভেতরেই ছিলো প্রতিভার দীপ্তি। প্রতিবাদের শিখা। স্বামীর সান্নিধ্যে সেই প্রতিভা ফুটে উঠেছিলো। সেই শিখা আগুনের মতো জ্বলে উঠেছিলো। কিন্তু তাঁর বিয়েটাকে কেউই আপাতদৃষ্টিতে ঠিক আদর্শ বলে মনে করবেন না— একালে তো নয়ই, এমন কি, সেকালেও করার কথা নয়।

তাঁকে বিয়ে করতে হয়েছিলো দোজবর— সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনকে। রোকেয়ার যদি ষোলো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে থাকে, তা হলে তখন তাঁর স্বামীর বয়স ছিলো চল্লিশ অথবা একচল্লিশ বছর। এই স্বামীর আগের পক্ষের এক প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ছিলো। সে সন্তান পরে বিমাতাকে যথেষ্ট জ্বালিয়েছিলেন। তা ছাড়া, স্বামীর ছিলো বহুমূত্র রোগ। স্বামী মারাও যান চাকরিজীবন শেষ করার আগেই। এই স্বামীর সঙ্গে মহা আনন্দে রোকেয়ার বিবাহিত জীবন শুরু হয়েছিলো বলে মনে হয় না। কিন্তু, আমার ধারণা, এই স্বামীই রোকেয়ার চিন্তাধারাকে পাল্টে দিয়েছিলেন এবং তাঁর সুপ্ত প্রতিভাকে উস্কে দিয়েছিলেন।

মৌখিক ছাড়া সাখাওয়াত বাংলা ভাষা ভালো জানতেন না। তাই রোকেয়াকে বাংলা শিখতে তিনি সাহায্য করতে পারেননি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর কাছ থেকেই রোকেয়া লেখাপড়া শেখার উৎসাহ পেয়েছিলেন। আর ইংরেজি যে তিনি তাঁরই যত্নে শিখেছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর চিঠিপত্র থেকে দেখা যায় যে, ইংরেজি তিনি ভালোই শিখেছিলেন। ইংরেজি ভাষা ছাড়া, ফেমিনিজমের কথাও তিনি যদি বিলেত-ফেরত স্বামীর কাছ থেকে শুনে থাকেন, তা হলে অবাক হবো না। শুনে থাকা কেন, আমার বিশ্বাস, এ সম্পর্কে রোকেয়া তাঁর কাছ থেকে রীতিমতো সবক নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০-র দশকের গোড়ার দিকে কৃষি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্যে বিলেত যান। সম্ভবত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন যান, সেই সময়েই গিয়েছিলেন। বিলেতে তখন অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নারীকর্মীরা রীতিমতো টগবগ করছিলেন। সাখাওয়াত সেই আন্দোলন কেবল প্রত্যক্ষ করেননি। ধারণা করি, নীতিগতভাবে তাকে স্বাগতও জানিয়েছিলেন।

ইংলণ্ডে *বঙ্গমহিলা* (১৮৮৫) গ্রন্থের লেখিকা কৃষ্ণভাবিনী দাসও তখন লন্ডনে ছিলেন। তিনিও সেই আন্দোলন কাছ থেকে লক্ষ্য করেছিলেন এবং দেশে ফিরে এসে সে সম্পর্কে লিখেছিলেন। রোকেয়ার পক্ষে, তাঁর সেই লেখা পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তার চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো: রোকেয়াকে ইংরেজি শিখিয়ে এবং ইংরেজি পড়তে উৎসাহ দিয়ে সাখাওয়াত জ্ঞানের সদর দরজাটা খুলে দিয়েছিলেন। নারীবাদী লেখিকা মেরী করেলির রচনা থেকে আরম্ভ করে ইংরেজি অনেক রচনাই রোকেয়াকে অনুপ্রাণিত করেছিলো। ইংরেজির মাধ্যমেই তিনি *সুলতানার স্বপ্নের* ধারণা লাভ করেছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাঁর চিন্তাধারাই ছিলো মৌলিক, যুক্তিবাদী এবং আধুনিক। প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধকে তিনি চোখ বুঁজে স্বীকার করে নিতে পারেননি।

তাঁর চিন্তাধারা আধুনিক— এ কথা বললে আসলে যথেষ্ট বলা হয় না। তার কারণ তিনি যেসব কথা লিখেছেন, তা লিখেছিলেন ফেমিনিজমের একেবারে আদি যুগে। তখনও পাশ্চাত্যেই ফেমিনিজম কী— সেই ধারণা যথেষ্ট পরিষ্কার হয়নি। তাই

রোকেয়ার অবদানকে যতোটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে, তাঁর অবদান তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখা দরকার, ফেমিনিজম শব্দটা প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত হয় ১৮৩৭ সালে। আর, কয়েকজন মার্কিন মহিলা একত্রিত হয়ে প্রথমবারের মতো নারীবাদী দাবি উত্থাপন করেন ১৮৪৮ সালে, নিউ ইয়র্ক শহরে। ইংল্যান্ডে এ নিয়ে আন্দোলন শুরু হয় আরও পরে— ১৮৬০-এর দশক থেকে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১৮৭০-এর দশকে বছর তিনেক ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে ছিলেন। *বামাবোধিনী* পত্রিকায় তিনি একাধিক রচনা প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু তিনি নারীবাদী আন্দোলনের কথা লেখেননি। ভারতবর্ষে এ সম্পর্কে কৃষ্ণভাবিনীই প্রথম উল্লেখ করেন। অবশ্য এখানে বলা দরকার যে, নারীরা বন্দী— এই কথা বলে কৃষ্ণভাবিনী দুঃখ করলেও, নারীদের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির কথা তিনি বলেননি। অর্থাৎ নারীদের অবস্থা উন্নতির কথা বললেও, নারীবাদী অধিকারের কথা তাঁর রচনায় নেই। স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি যে-ধরনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তার মধ্য দিয়েও তাঁর নারীবাদী মনোভাব প্রকাশ পায় না। অপর পক্ষে, নারী আন্দোনের সেই প্রত্যূষেই রোকেয়া দ্ব্যর্থহীনভাবে কেবল নারীদের উন্নতির কথা বলেননি, বরং নারীবাদের কথা উচ্চারণ করেছিলেন। বস্তুত, কৃষ্ণভাবিনীর তুলনায় তিনি ছিলেন অনেক অগ্রসর এবং বলা যেতে পারে যে, বাঙালি নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম সত্যিকারের নারীবাদী।

এখানে নারীবাদের একটা ছোট্টো সংজ্ঞা দিয়ে নিই, যাতে ভুল বোঝাবুঝি না-হয়। নারীদের উন্নতির কথা বললেই নারীবাদ বোঝায় না। নারীবাদ একটা মতবাদ। নারীরা পুরুষদের হাতে নির্যাতিত একটি শ্রেণী— এই মতবাদকে এক কথায় বলা যায় নারীবাদ। যাঁরা নারীবাদী তাঁরা নিজেরা সেই নির্যাতিত শ্রেণীর সদস্য বলে নিজেদের শনাক্ত করেন।

নারীবাদীরা কেবল নারীদের অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি চান না। তাঁরা মনে করেন নারী আর পুরুষ একেবারে সমান। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা সমান অধিকার পেতে পারেন— শিক্ষায়, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে, ঘরের কাজে, সন্তান লালনে, সামাজিক মর্যাদায়, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে, চাকরির ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে। কিন্তু কেবল ভারতবর্ষে নয়, তখনকার ইংল্যান্ডেও এই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বড়ো দুটো দৃষ্টান্ত দিয়ে এটা বোঝানো যায়। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাহিত্য-সঙ্গীতে ইংল্যান্ড উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিলো। কিন্তু দৃষ্টিকটুভাবে এ উন্নতি সীমাবদ্ধ ছিলো পুরুষদের মধ্যে। ১৯২০-এর দশকের আগে পর্যন্ত অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার সাধারণ অধিকার পর্যন্ত দেয়নি। অপর পক্ষে, ১৮৭৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আংশিকভাবে সে অধিকার দিয়েছিলো, যদিও বাস্তবে তা সীমাবদ্ধ ছিলো গুটি কতক ব্রাহ্ম এবং খৃস্টানের মধ্যে। মুসলমান নারীদের পড়ার অধিকার পর্যন্ত ছিলো না সরকারী বিদ্যালয়—

বেথুন স্কুল অথবা বেথুন কলেজে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশব সেনের মতো সমাজসংস্কারকও মেয়েদের নিতান্ত সাধারণ শিক্ষা দানের পক্ষপাতী ছিলেন; উচ্চশিক্ষার নন। তাঁরা মনে করতেন, পুরুষালি শিক্ষা, যেমন, গণিত এবং বিজ্ঞান, মেয়েদের কমনীয়তা নষ্ট করবে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত চাকরির। সেকালের ইংল্যান্ডে চাকরির ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্যে বৈষম্য বেশি ছিলো বললে, কিছুই বলা হয় না। বলা উচিত, তাঁদের চাকরি করার অধিকার সামান্যই ছিলো। তাঁদের জন্যে বরাদ্দ ছিলো কতোগুলো বিশেষ ধরনের চাকরি। যেমন, শিক্ষকতা, নার্সিং, চিকিৎসা, সেলাইয়ের কাজ ইত্যাদি। সব চাকরির জন্যে তাঁদের যোগ্য বলে গণ্য করা হতো না। আর, ভারতবর্ষে মেয়েদের চাকরি করার ধারণা ছিলো রীতিমতো সমাজকে অগ্রাহ্য করার মতো। এমন কি, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ও যামিনী সেনের মতো যাঁরা ডাক্তার হয়েছিলেন, অথবা কামিনী সেন ও চন্দ্রমুখী বসুর মতো যাঁরা শিক্ষকতায় এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা সমাজে নিন্দিত হয়েছিলেন। তাঁদের সহজে বিয়ে হয়নি। চাকরি-করা মেয়েদের কারো কারো আবার আদৌ বিয়েই হয়নি— যেমন, রাধারানী লাহিড়ী এবং যামিনী সেনের। রাধারানী ছিলেন শিক্ষক, আর যামিনী ছিলেন ডাক্তার।

এই পরিবেশে রোকেয়া লিখেছিলেন, এমন কোনো কাজ নেই, যা মেয়েদের করা উচিত না। কেরানি থেকে ভাইসরয় পর্যন্ত সব কাজই তাঁরা করতে পারেন যোগ্যতা থাকলে। এমন কি, তাঁরা ব্যবসা করতে পারেন, অথবা পারেন মাঠে গিয়ে কৃষিকাজ করতে। তিনি আরও লিখেছেন, মেয়েরা অর্থনৈতিক কাজ করে যতোই স্বাবলম্বী হবেন, পুরুষদের আধিপত্য থেকে ততোই রক্ষা পাবেন। পুরুষরা নারীদের শোষণ এবং নির্যাতন করার সুযোগ পান বেঁচে থাকার জন্যে নারীদের যেহেতু তাঁদের ওপরই নির্ভর করতে হয়।

কেবল চাকরি নয়, রোকেয়া সব ব্যাপারেই পুরুষদের সমকক্ষতা দাবি করেছেন। তিনি লিখেছেন, "... আমরা যে গোলামের জাতি নই, এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব।" অন্যত্র বলেছেন, নারীও মানুষ। "বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই; বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে! জড়াউ অলঙ্কার রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ।" তিনি আরও লিখেছেন যে, নারী এবং পুরুষ দুজন সমান না-হলে সমাজ এবং সংসারের যথার্থ উন্নতি হতে পারে না। চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, গাড়ির দু চাকা সমান না-হলে সে সামনে যেতে পারে না। শিক্ষার অভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে পরিপূর্ণতা লাভ করে না— সে কথাও তিনি লিখেছেন। "স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন।" এটা সুখী অথবা আদর্শ দাম্পত্যের দৃষ্টান্ত নয়।

আধুনিক নারীবাদীরা আর-একটা বিষয়ে সচেতন হয়েছেন— সে হলো: নারীদের বন্দিত্বে ধর্মের ভূমিকা। কিন্তু ১৯০৪ সালে এ কথা বাঙালি কেন, কোনো বিদেশীও লেখেননি। তা সত্ত্বেও, পর্দানশিন রোকেয়া সেই সময়ে লিখেছিলেন:

> ... কোনো ভগ্নী মস্তক উত্তোলন করিয়াছেন, অমনি ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। ... আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ এই ধর্মগ্রন্থগুলি ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ... এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী-মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন।

অন্যত্র লিখেছেন: "যেখানে ধর্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন। ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন।" এই উক্তির সত্যতা সে যুগে তো দূরের কথা, এ যুগেও বুঝতে পারেন, এমন নারীপুরুষের সংখ্যা বেশি নেই। এ উক্তি সম্পর্কে আরও একটা কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে বলা উচিত: রোকেয়া এ কথা লিখে যে-সৎ সাহসের পরিচয় দেন, তা তুলনাহীন। সম্ভবত এ যুগের মৌলবাদী পরিবেশে এ কথা লিখতে তিনি সাহস পেতেন না।

সুলতানার স্বপ্ন নিতান্তই কল্পনা। এতে তিনি লিখেছিলেন এক কল্পিত নারীস্থানের কথা— যে-দেশে নারী ও পুরুষের ভূমিকা উল্টে দেওয়া হয়েছে। দেশ শাসন থেকে শুরু করে বাইরের কাজগুলো করেন নারীরা। আর পুরুষরা করেন ঘরের কাজ। এই গল্পে রান্নাবান্না থেকে আরম্ভ করে যুদ্ধ করার কাজেও সৌরশক্তি ব্যবহারের কথা লিখেছেন তিনি। উভয় চিন্তাতেই তাঁর দূরদৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। সত্যিই, এখন তো নারীরা যুদ্ধ করা থেকে আরম্ভ করে সবই করছেন। পুরুষরা ঘরের কাজে অংশ নিতে শুরু করেছেন। এবং সৌরশক্তির অসাধারণ সম্ভাবনার কথাও শোনা যাচ্ছে। কোনো পুরুষ তো সেকালে এ ধরনের কথা লেখেননি!

এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে তাঁকে সত্যি সত্যি সময়ের তুলনায় অনেক অগ্রসর মনে হয়। মনে হয়, তিনি জন্মেছিলেন সময়ের তুলনায় অনেক আগে। সে জন্যেই একদিকে তিনি যেমন তাঁর নিজের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেননি; অন্য দিকে আবার তাঁর বক্তব্য দিয়ে সমাজের পক্ষে যতোটা প্রভাবিত হওয়ার কথা ছিলো, তাও হয়নি। আরও আশ্চর্য লাগে যে, তিনি যেসব বৈপ্লবিক কথাবার্তা লিখেছিলেন, তা যেন কারও চোখেই পড়েনি। ভাগ্য এবং সময় তাঁর বিরুদ্ধে কাজ করেছিলো। একে তিনি নারী, তার ওপর তিনি মুসলমান। তখনকার ভাবুক এবং সাহিত্যিকদের তাই তাঁর লেখা চোখে পড়েনি। শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ জানা-অজানা

অনেকের লেখাই পড়তেন এবং নিজের থেকেই তাঁদের উৎসাহ দিতেন। কিন্তু রোকেয়া নামটি তাঁরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। অথবা করলেও, তিনি তাঁর মতামত হয়তো সমর্থন করতেন না। রোকেয়া যখন তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করেন, মোটামুটি সে সময়েই পীরালি পাত্র পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সাড়ে দশ বছরের কন্যাকে তাঁর ইচ্ছা যাচাই না-করেই বিয়ে দিয়েছিলেন। সে যুগে বড়ো কোনো মুসলমান সাহিত্যিক ছিলেন না। কিন্তু যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কেউ রোকেয়ার লেখা পড়ে কোনো অনুকূল-প্রতিকূল মন্তব্য করেননি। প্রভাবিত হওয়া তো দূরের কথা! এমন কি, নজরুল ইসলামও "নারী"র মতো একটি বিখ্যাত কবিতা লিখলেও রোকেয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লিখেছেন বলে শুনিনি।

রোকেয়ার আর-একটি আশ্চর্য গুণ তাঁর অসাম্প্রায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি যখন লিখেছেন, তখন ভারতবর্ষের তাবৎ নারীদের সম্পর্কেই লিখেছেন। কৃষ্ণভাবিনীর সঙ্গে এখানে তাঁর একটা পার্থক্য লক্ষ্য করি। কৃষ্ণভাবিনী বেশ কয়েক বছর ইংল্যান্ডে থেকেও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকরণ করতে পারেননি। রোকেয়া মুসলিম সমাজের অন্তঃপুরে থেকেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার করতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধের কোথাও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ছাপ লক্ষ্য করি না। আর, *পদ্মরাগ* উপন্যাসে তিনি হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টানের মিলিত যে-সংসারের চিত্র এঁকেছেন, তা তাঁর ঔদার্যেরই স্পষ্ট প্রকাশ। এমন কি, যে-যুগে মুসলমান সাহিত্যিকরা আরব-ইরানের খোয়াব দেখতেন, সেই কালে রোকেয়া লিখেছিলেন, "আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী— তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু।"

রোকেয়ার পর শত শত নারী তাঁদের উন্নতির কথা লিখেছেন। এ যুগে তসলিমা নাসরিনের মতো অত্যাধুনিক নারীবাদীও আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাঁরা কট্টরপন্থী, যাঁরা কেবল নারীদের মুক্তি চান না, বরং অংশত পুরুষ-বিদ্বেষী। কিন্তু বাঙালি কোনো নারীবাদী এখনো পর্যন্ত রোকেয়ার মৌলিক চিন্তাকে ছাড়িয়ে গেছেন বলে মনে হয় না। কোনো কোনো বিষয়ে রোকেয়ার ওপর সময়ের ছাপ দেখতে পাই। যেমন, তিনি যে-যুগে লিখেছিলেন, তখন যৌনমুক্তির কথা তাঁর পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিলো না। সন্তান গ্রহণে নারীদের সিদ্ধান্তই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত— এ কথাও তিনি লেখেননি। এমন কি, নারীবাদের একেবারে গোড়ার প্রশ্ন— দেহ এবং অবরোধমুক্তির কথাও তিনি পুরোপুরি সমর্থন করতে পারেননি। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, বোরকার পক্ষে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু নারী চার দেয়াল এবং বোরকার আড়াল থেকে বেরিয়ে না-এলে কখনোই পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারেন না— এ তিনি জানলেও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারেননি। কারণ, বোরকা না-পরলে তাঁর বিদ্যালয়ে তিনি হয়তো ছাত্রী পেতেন না। নয়তো যিনি ধর্ম মানুষের তৈরি বলে এক সময়ে দাবি করেছেন, তিনি বোরকার সমর্থন করতে পারেন না। আমার

ধারণা, স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি ধর্মের দিকে খানিকটা ঝুঁকেছিলেন। তাঁর নারীবাদী লেখার সংখ্যা তখন খুব কমে এসেছিলো। এ রকমের ছোটোখাটো বিষয়ে তাঁর সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করি ঠিকই, কিন্তু বাংলায় নারীবাদী চিন্তায় তাঁর অবদান আজও অন্যদের চেয়ে বেশি।

* প্রসঙ্গত বলা দরকার, রোকেয়া কখনোই নিজের নাম বেগম রোকেয়া লেখেননি। আমাদেরও লেখা উচিত নয়। আর, তাঁর মৃত্যু তারিখ আমাদের জানা আছে। কিন্তু জন্মতারিখ কোথাও লেখা নেই। এমন কি, তাঁর জন্ম যে ১৮৮০ সালেই হয়েছিলো, তারও কোনো প্রমাণ নেই।

(*প্রথম আলো*, ডিসেম্বর ২০০৬)

৪

তসলিমার ভালোমন্দ

শুরুতেই সালাম সংগ্রামী তসলিমাকে— যে-তসলিমা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও বারবার নিজের বক্তব্য চীৎকার করে প্রকাশ করেন; সমাজ, সংসার, ধর্ম এবং প্রচলিত মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করে নিজের পথে চলেন।

এমন কালাপাহাড় বলেই তাঁর নাম সবার মনেই এক রাশ আবেগ সৃষ্টি করে। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হলো: পুরুষতান্ত্রিক সমাজ আর ধর্ম। তবে পুরুষই প্রধান লক্ষ্য তাঁর। পুরুষরা যেহেতু ধর্মের দোহাই দিয়ে এবং নরকের ভয় দেখিয়ে নিজেদের সুবিধেটা বহাল রাখে, সে কারণে ধর্মও। পুরুষদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন বলেই তাঁর নাম শুনলেই পুরুষরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। এমন কি যে-পুরুষরা আপাতদৃষ্টিতে উদারপন্থী, তাঁরাও। আর ধর্মব্যবসায়ীদের তো কথাই নেই। বস্তুত, তসলিমার ধর্মবিরোধী কথাবার্তা শুনে তাঁরা রীতিমতো জঙ্গী হয়ে ওঠেন। আইনের অপেক্ষা রাখেন না তাঁরা। নিজেরাই বিচারক সেজে তাঁরা তাঁর গলা কাটার ফতোয়া দেন। তাঁর পক্ষে যাঁরা, তাঁদের সংখ্যাও কম নয়, তাঁরাও আবেগে আত্মহারা হন কখনো কখনো, যুক্তিজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু তাঁরা এতোটা যুদ্ধংদেহি নন। এই যা! পার্থক্যটা মাত্রার, প্রকৃতির নয়।

আর-কিছু লেখার আগে নিজের পরিচয় দিয়ে নিই। আমি নারীবিদ্বেষী নই। বরং মেয়েরা যে মানুষ এবং পুরুষের চেয়ে কোনোক্রমে ছোটো নন, তত্ত্বত কেন, মনেপ্রাণে এটা আমি বিশ্বাস করি। সেই নির্যাতিত মহিলাদের অধিকারের কথা অমন তলোয়ার হাতে যিনি লিখেছেন, তাঁকে তাই সালাম না-জানিয়ে পারিনে। তা ছাড়া, আমি ধর্মনিরপেক্ষতার কট্টর সমর্থক হিশেবেও তসলিমার ভক্ত। হাজার মাইলের দূরের মন্দির ভাঙার জন্যে যখন ভোলার নিরপরাধ হিন্দুদের বাড়িতে আগুন লাগানো হচ্ছিলো, ধর্ষণ করা হচ্ছিলো হিন্দু নারীদের, তখন বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাঁর প্রতিবাদ করেছিলেন তসলিমা। হোক না অতি তুচ্ছ একটি উপন্যাস লিখে! সাহিত্য হিশেবে সেই উপন্যাস উপন্যাস হয়েছিলো কিনা, সেটা অপ্রাসঙ্গিক। অন্য কেউ তো সেই বলাৎকারের প্রতিবাদ করেননি! তাই তসলিমার অকুণ্ঠ প্রশংসা না-করে পারিনে।

এখানে শেষ করতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু তসলিমার প্রতি আমার এই শ্রদ্ধা সম্প্রতি অবিচল রাখা একটু কঠিন হয়ে পড়ছে। সে কি আমারই ভুলে, নাকি তাঁর সাম্প্রতিক লেখা বুঝতে পারছিনে বলে, ঠিক জানিনে।

কলম হাতে নিয়ে প্রথমেই তসলিমা লিখেছিলেন কবিতা আর কলাম। প্রথম দিকে দুটোরই লক্ষ্য ছিলো পুরুষশাসিত সমাজে মহিলারা কতোভাবে অত্যাচারিত হন, চোখে আঙুল দিয়ে সেটা দেখানো। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, একই কথা

বারবার লিখছেন কেন ? ওতে পুনরাবৃত্তির দোষ হয় না ? তিনি বলেছিলেন, 'নারীর প্রতি অত্যাচার তো কমেনি। যতোদিন এ অত্যাচার চলতে থাকবে, ততোদিন লিখতে থাকবো।' যতোদিন তিনি দেশে ছিলেন, তাঁর লেখা থেকে তাই মনে হতো। তিনি নারীনির্যাতনের কথাই লিখেছেন ততোদিন। তাঁর কলামে সেসব কথা তিনি লিখেছেন ফেনিয়ে ফেনিয়ে। কিন্তু কবিতায় সেই একই কথা লিখেছেন, ছন্দের বন্ধনে, খানিকটা সংযমের শাসনে। কলামগুলোর চেয়ে তাঁর এই কবিতা সে জন্যে আমার অনেক ভালো লাগে।

এক-একটা কবিতায় নারীদের এক-একটা বেদনা, এক-একটা ক্ষোভের কথা বলেছেন তসলিমা। অসহ্য বেদনার কথা— পুরুষের প্রবঞ্চনা, সীমাহীন শোষণ, বমি-উদ্রেককারী ভণ্ডামি, নিরঙ্কুশ স্বার্থপরতা, নির্লজ্জ বৈষম্য, নিষ্করুণ হৃদয়হীনতা, নারীকে ভোগ্যবস্তু হিশেবে ব্যবহার করে ছিবড়ের মতো ফেলে দেওয়া ইত্যাদি। আমি আমার দুর্বল (এবং জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে পুরুষালি) ভাষা দিয়ে তাঁর অভিযোগের তীব্রতা ঠিক বোঝাতে পারবো না, তাই তাঁর ভাষাতেই বলি:

১. আমার শরীর চেয়েছে সে নিজের অধীন। / ইচ্ছে করলেই যেন মুখে থুতু, গালে চড়, নিতম্বে চিমটি দিতে পারে।

২. প্রতি রাতে আমার বিছানায় এসে শোয় এক নপুংসক পুরুষ। ... আমাকে উত্তপ্ত করে নপুংসক বেঘোরে ঘুমোয়।

৩. আপাতমস্তক তুমি এক ভণ্ড, প্রতারক / তোমার লাম্পট্য সব জানি

৪. কিছুটা কায়দা করে রমণীকে ভোগ না হলে / সে ভোগে তৃপ্তি নেই, তৃপ্তির সুগন্ধী ঢেকুর নেই।

৫. পুরুষেরা ভদ্রলোক, / পুরুষের জন্যে সতীত্বের সনদ লাগে না।

৬. একশ' একর জমি নিজস্ব রেখে / এক কাঠা খোঁজ বর্গার তাড়নায় / বর্গার চাষ পৃথক স্বাদের কিনা!

৭. বেহেস্তের লোভে নারীরা চেটে খাবে / স্বামীর ধুলো কাদা / নিয়ম নীতি সব তৈরি করেছিল / পুরুষ নামজাদা। (এখানটায় ছন্দপতন হলো— পুরুষ তিন মাত্রা, তারপর নামজাদা চার মাত্রা। যদি লিখতেন, পুরুষ হারামজাদা, তা হলে মনের কথা বলা হতো কিনা জানিনে, ছন্দ রক্ষা পেতো।)

৮. ছুঁয়েছে সে সব, কেবল দেখেনি ছুঁয়ে / ... যে হৃদয় সেধেছিলাম।

৯. যে কারণে নারী বেশ্যা হয়, যে সংসর্গে, ... একই সংসর্গে পুরুষ পুরুষই থাকে।

১০. ভালোবাসা ছাড়া কোনো মাংসের শরীর ছুঁতে / পারঙ্গম জন্তু ও পুরুষ / নারী নয়।

পুরুষের এসব এবং অন্য আরও নানা ধরনের অত্যাচারের মর্মান্তিক সত্য কথা তুলে ধরেছেন তসলিমা। সেই সঙ্গে তুলে ধরেছেন নারীদের নীরবে-নিভৃতে-কাঁদা বঞ্চনার কথা। তাঁর বিরুদ্ধে পুরুষ সমাজে হৈচৈ হবে না কেন! হওয়াওই তো স্বাভাবিক।

তবে স্বীকার করতে হবে, পুরুষরা তাঁর ওপরই প্রথম অত্যাচার করেনি, সনাতন কাল থেকে তাবৎ নারীর ওপরই অত্যাচার করেছে। তা হলে, তিনি কলমের বল্লম তুলে নিলেন কেন? আমি অনেক বছর আগে একবার বিবিসির হয়ে তাঁকে এ কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। নানাভাবে প্রশ্ন করেও উত্তরটা তখন ঠিক পাইনি। তবে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি সেইদিন হবেন ক্ষান্ত, যবে পুরুষের লাথিচড় গৃহরণভূমে রণিবে না। তিনি মহিলাদের সচেতনতা জাগাবেনই জাগাবেন। সচেতন করে তুলবেন পুরুষেরও— তাঁদের আচরণ সম্পর্কে। এবং আমার সত্যি বিশ্বাস, তাঁর সৎ সাহস এবং সংগ্রামী স্পিরিট দেখে ৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে বহু বঙ্গনারী উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, সাহস পেয়েছিলেন। নীরবতা ভেঙে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। এটা কম অর্জন নয়। এ জন্যে তাঁর কাছে, আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অন্তত, আমি কৃতজ্ঞ।

কিন্তু তারপর কী হলো?

বলতে গেলে অনেক বলতে হবে। তার চেয়ে এখনটায় দশ-বারো বছরের ইতিহাস পাখির চক্ষু দিয়ে দেখছি।

তসলিমা সংস্কারকের ভূমিকা নিয়ে খুশি থাকতে পারলেন না। রাতারাতি বিপ্লব চাইলেন তিনি। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র, দলবল না-জুটিয়ে বিপ্লব করা তো সম্ভব নয়। করলে সেটা ক্ষুদিরাম কি বাঘা যতীনের মতো আত্মহত্যার সামিল হয়। এমন কি, বিপ্লবের কারণটাও পিছিয়ে যায়। কারণ, গৃহস্থ হুঁশিয়ার হয়ে যায়। পটভূমি তৈরি হবার আগেই অকাল বিপ্লবের ঘোষণা দিয়ে তসলিমা নিজে ডুবলেন, নারীদেরও বোধ হয় পিছিয়ে দিলেন। তাঁর কট্টরপন্থী মনোভাব এবং ধর্মের ওপর প্রচণ্ড আঘাত ঐতিহ্যিক সমাজ নিতে পারলো না।

দেশের আইনের প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফতোয়া দিলেও ফতোয়াবাজরা তাঁকে মারতে পারলেন না। কিন্তু তাঁকে বিচলিত করলেন তাঁর আসল পথ থেকে। কখন যে তিনি তাঁর পথ এবং লক্ষ্য থেকে সরে গেলেন, বোধহয় তিনি নিজেও তা টের পেলেন না। ধর্মীয় রাজনীতির শিকার হয়ে তসলিমা দেশ ছাড়লেন। যাঁদের জন্যে কাজ করতে শুরু করেছিলেন, তাঁদের থেকে দূরে ছিটকে পড়লেন। যাঁদের জন্যে লিখছিলেন, সেই লেখা নিষিদ্ধ হয়ে তাঁদের কাছে আর পৌঁছলো না। এমন কি, তাঁর হঠকারিতায় বাংলাদেশের সাধারণ নারীদের উন্নতির মন্থর গতিও বোধ হয় আরও মন্থর হয়ে গেলো। আর, বনবাসে গিয়ে তিনি স্বয়ং তাঁর লক্ষ্য হারিয়ে

ফেললেন। তিনি নারীদের সবার কথা না-লিখে, নিজের কথা লিখতে শুরু করলেন। ধর্মনিরপেক্ষতার জেহাদ বন্ধ করে, বরং এমন সব কথা বলতে আরম্ভ করলেন ধর্ম এবং নৈতিকতা থেকে যা অনেক দূরের।

তিনি যেসব কথা বললে শুরু করলেন, তার উৎস ছিলো আপাতদৃষ্টিতে তাঁর নিজেরই পরিবারে। '৯৩ সালে অতোভাবে প্রশ্ন করেও যেসব কথা তাঁর কাছ থেকে বের করতে পারিনি, সেই কথা তসলিমা নিজেই অকাতরে বলতে শুরু করলেন মহাকাব্যের মতো সর্গে সর্গে। আত্মজৈবনিক উপন্যাস লিখলেন তিনি। কিন্তু তার থেকেও সিয়েরিয়াস— প্রচণ্ড চিৎকার করে একেবারে নিজের জীবনের কথা লিখলেন। তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাসগুলো উপন্যাস হিশেবে যেমনই হোক, অন্তত তার মধ্যে এক ধরনের শিল্প সৃষ্টি করার প্রয়াস ছিলো। ইংরেজিতে যাকে বলে কজ, তেমন একটা কজ্‌ও ছিলো। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ছিলো, নিপীড়িত মানবতার কথা ছিলো। নারীদের ওপর অত্যাচারের কথাতো ছিলোই। কিন্তু নির্বাসনে গিয়ে তিনি যা লিখলেন, তার মধ্যে এসব তেমন দেখা যায় না। যে-তসলিমা নিজেকে বলেন, ফেমিনিস্ট্‌, অর্থাৎ নারীবাদী, সেই তসলিমা নারীদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা দূরে থাক, নারীদের জন্যে লিখলেনও না। বরং আত্মরতিতে তলিয়ে যাবার উপক্রম হলেন। তাঁর আত্মজীবনীগুলো দেশ অথবা দশের জন্যে নয়। তাঁর আত্মজীবনী সংকীর্ণ স্বার্থপরতারই স্বাক্ষর।

বাংলা ভাষায় প্রথম আত্মজীবনী ছাপিয়েছিলেন একজন ভদ্রমহিলা— রাসসুন্দরী দেবী (১৮৬৯)। তারপর থেকে শত শত আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে। *জীবনস্মৃতি* এবং *ছেলেবেলার* মতো আত্মজীবনী সবাই লিখবে— এটা প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু আত্মজীবনী কি কেবল সমাজ এবং সংসারের অত্যাচার, কেবল যৌনকর্ম, কেবল কুৎসার কেচ্ছা?

তসলিমা একালের একজন বিখ্যাত বাঙালি। যদি পরিচিতির পরিধি বিবেচনা করি, তা হলে দেশে-বিদেশে তাঁর চেয়ে বিখ্যাত বাঙালি গত পঁচিশ বছরে অন্য কাউকে দেখতে পাইনে। তাঁর পরিচিতি এবং বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি দেখে গর্বিত হই। কিন্তু তাঁকে যখন নিচে নামতে দেখি, তখন অবিমিশ্রভাবে দুঃখ অনুভব করি। কয়েক মাস আগে তাঁর আত্মজীবনীর তৃতীয় সর্গ প্রকাশিত হওয়ার পর বিবিসি থেকে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, চরিত্র হনন করে তিনি অন্যদের ছোটো করলেন কেন? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি যদি কাউকে ছোটো করে থাকেন, তা হলে নিজেকেই ছোটো করেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেছিলেন কিনা, জানিনে। কিন্তু এ কথাটা যে ষোলো আনা সত্যি, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। আমি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি, যে-তসলিমা অমন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্যের আসরে নেমেছিলেন, শুরুতেই অমন শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকে

আত্মজীবনী অবশ্যই চাই, কিন্তু তার মধ্যে তিনি যেসব ময়লা মিশিয়ে দিচ্ছেন, সেসব নয়। কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বলতে হবে, তা না হলে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

মেয়েবেলা নামটাই চকিতে তসলিমার নারীবাদী মনোভাবকে মনে করিয়ে দেয়। আমাদের ভাষা যে সেক্‌সিস্ট, সেটাকে তিনি সুন্দরভাবে শুধরে দিয়েছেন। তাঁকে সাধুবাদ জানাই। এ বইতে তিনি তাঁর ওপর নিকট-আত্মীয়দের যেসব অত্যাচার এবং বৈষম্যের কথা লিখেছেন, তাতে তাঁর অকপট ভাষণ এবং সৎ সাহসেরও তারিফ না-করে পারিনে। তসলিমা ডাক্তার। তিনি জানেন, অনেক ওষুধই আসলে বিষাক্ত। সেসব ওষুধ ঠিক মাত্রায় খাওয়ালে রোগী সেরে ওঠে, কিন্তু মাত্রা বেশি হলে রোগী মরেও যায়। মাত্রা ঠিক রাখা যে-কোনো বড়ো লেখকের কাজ। কে কতো বড়ো, তার একটা পরিমাপও। বালিকা তসলিমাকে ধর্ষণ করতে চান তাঁর দুই নিকটাত্মীয়। এমন ঘটনা কি বাঙালি সমাজে এই প্রথম ঘটলো? মোটেই না। কিন্তু তসলিমা এই প্রথম লিখলেন। তাঁর অসাধারণ সাহস এবং স্পষ্টভাষণের প্রশংসা না-করে পারছিনে। কিন্তু ধর্ষণ করতে চেষ্টা করার সময় তাঁরা কাপড় খুলেছিলেন কিনা, কতোটা খুলেছিলেন, অথবা আর কি কি করেছিলেন, তা বলার কি দরকার আছে? তার থেকেও বড়ো কথা, সে কথা বলে কি লাভ হচ্ছে— নিজের বা পাঠকের?

ওপর রুদ্র এবং তসলিমা উভয়ই কবি। সুতরাং তসলিমা সে মিলনের দীর্ঘ এবং উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিতেই পারেন। কিন্তু তিনি যে-বর্ণনা দেন, তা কবির নয়।

> রুদ্র আমাকে চুমু খায়। ঠোঁটে গাঢ় করে চুমু খায়। ... শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে ফেলে। ব্লাউজের বোতাম খুলে মুখ ডুবিয়ে দেয়। স্তনবৃন্ত কেবল ভিজিয়ে দেয় না, দাঁতে কাটে। দু হাতে মুঠো করে ধরে স্তন, মুঠোর ভেতর এমন জোরে চাপে, যেন গলিয়ে একে জল বানাবে ... রুদ্র আমার শাড়ি ওঠাতে থাকে ওপরের দিকে ... আমার শরীরের ওপর নিজের শরীর তুলে দেয় রুদ্র। ... এর পর সেই একই পদ্ধতি, দু পায়ে বিযুক্ত করতে থাকে আমার দু পা। ... এর পর আচমকা একটি আঘাতে আমি চিৎকার করে উঠি। ... রুদ্র ক্রমাগত আঘাত করেও নড়াতে পারে না কোনও পাথর। শরীর থেকে নেমে এসে রুদ্র তার আঙুল ব্যবহার করে অদৃশ্য পাথর সরাতে। ... যে করেই হোক পথ প্রশস্ত করে তার এগোতে হবে, ...

এ বর্ণনা ধর্ষণের মামলায় পুলিশ অথবা কোর্টের সামনে বাধ্য হয়ে দিতে হতে পারে। কিন্তু কেউ আত্মজীবনীতে লিখতে পারেন— এটা বিশ্বাস করা শক্ত। অভিনব অবশ্যই। এমন কি, তিনি যদি এর মাধ্যমে রুদ্র অথবা পুরুষের ধৈর্য এবং বিবেচনার অভাব বোঝাতে চেয়ে থাকেন, তা হলেও।

রুদ্রকে ভালোবাসার সাধ মেটেনি তসলিমার। বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন রুদ্রই। অন্য মেয়ের [অথবা বেশ্যার] সংসর্গ করেছেন রুদ্র। তারই ফল সিফিলিস উপহার দিয়েছেন তসলিমাকে। কিন্তু এতো সব সত্ত্বেও ভালোবাসার সাধ মেটেনি বলেই রুদ্রকে আঘাত করলেও, বারবার তাঁর জন্যে তসলিমা এক ধরনের দুর্বলতা অনুভব করেছেন। একটা ঘটনার কথা বলি। রুদ্রের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে গেছে। অন্যের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। সে বিয়েও ভেঙে গেছে। তারপর একদিন রুদ্রের সঙ্গে দেখা। মলিন মুখ, অসুস্থ দেহ। তসলিমা তাঁকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলেন। যত্নআত্মি করলেন। রাতের বেলায় শুতে দিলেন নিজের কাছেই। বাকিটা আমরা আহাম্মুক হলেও মোটামুটি অনুমান করে নিতে পারি। আত্মজীবনী কেন, উপন্যাসের জন্যেও এটাই যথেষ্ট। এ দিয়ে তিনি কিছু মাত্র অর্জন করতে পারেন না। পারেননি। কিন্তু তসলিমা সেখানে থামেননি তা সত্ত্বেও। এবং সে কারণেই এটা পর্নোগ্রাফির চেয়েও বেশি পর্নোগ্র্যাফিক। কারণ, এটা উপন্যাস নয়, আত্মজীবনী। সে কারণেই তাঁর পুরুষ-ঘৃণা সত্ত্বেও তাঁর এসব লেখার বেশির ভাগ পাঠক পুরুষ।

সত্যি বলতে কি, তাঁর ইদানীংকার লেখাগুলো পাঠকদের যৌন-অনুভূতিকেও সুড়সুড়ি দিতে পারে। যে-পুরুষের মুখে তসলিমা আগুন দিয়েছেন, সেই পুরুষরাই এই রচনা গোগ্রাসে গিলবেন। আমি বুঝতে ব্যর্থ হই, তসলিমা এসব লিখছেন কেন? তা

হলে বই বেশি বিক্রি হোক, তাঁর লেখা (যে উপায়েই হোক না কেন) বেশি প্রচারিত হোক, এটাই কি তাঁর উদ্দেশ্য ?

খিদের পরেই যৌনতা আমাদের একেবারে জীবনের সবচেয়ে বড়ো অনুভূতি। কাজেই যৌনতার কথাও না-হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এমন সব অপ্রয়োজনীয় স্থূল বিষয় নিয়ে এসেছেন তসলিমা তাঁর আত্মজীবনীতে, যা আমাদের বিস্মিত না-করে পারে না। তাঁর দুই বড়ো ভাই কে কতো জোরে দুর্গন্ধওয়ালা বায়ু ছাড়তে পারেন, তার প্রতিযোগিতা করেন। এই তুচ্ছ ঘটনা কি লেখার মতো একটা বিষয় ? কিন্তু এখানেই শেষ নয়, এর থেকেও তুচ্ছ এবং বমি-উদ্রেককারী ঘটনার কথাও তিনি লেখেন তাঁদের সম্পর্কে। নিজেই স্বীকার করেন, তা দেখলে পেটে যা কিছু আছে, তা বেরিয়ে আসে:

> লুঙ্গি পরেই তিনি যখন চুলকোনো শুরু করেন পা ফাঁক করে দু ঊরুর মধ্যিখানে, তখন দেখে মনে হয় না দাদা আদৌ কোনও সুর্দশন পুরুষ। এর পরও যে-কাণ্ড করেন, সেটি দেখলে কেবল বমির উদ্রেক নয়, রীতিমতো পেটে যা কিছু আছে সত্যিকার বেরিয়ে আসে। গায়ের ময়লা [অর্থাৎ দুই ঊরুর মাঝখানের] হাতে ডলে তুলে কালো গুলি বানিয়ে ফেলে দেওয়ার আগে তিনি শুঁকে দেখেন। দাঁতের ফাঁকে বাঁধা মাংস এনেও গুলি বানিয়ে শোঁকেন।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে: তাঁর নিজেরই যদি মনে হয় যে, এটা বমি উদ্রেককারী, তা হলে সেটা আর পাঠকদের উপহার দেন কেন ? কার লাভ তাতে ? পাঠকের ? তাঁর ?

তসলিমা কেবল নারীবাদী নন, তিনি সম্ভবত নারীশ্রেষ্ঠতাবাদী এবং নরবিদ্বেষী। পুরুষদের তিনি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করেন। নিজের পরিবারের পুরুষ-সহ পর-পুরুষেরা তাঁর ওপর এতো ধরনের অত্যাচার করেছেন যে, তাঁদের ঘৃণা করলে তাঁকে আমি দায়ী করতে পারিনে। তিনি যখন ডাক্তারি করছেন, সেই সময়ে তাঁর পিতা যেভাবে তাঁকে মারধর করেন, তাঁকে বাড়িতে তালা দিয়ে বন্দী করে রাখেন, ঘরের মধ্যে একটা বালতি দেন পায়খানা-প্রস্রাব করার জন্যে, তা আইয়ামে জাহেলিয়াতকে হারিয়ে দিতে পারে। তাঁর এক স্বামী তাঁকে যেভাবে বেল্ট দিয়ে পিটিয়ে পুরুষত্ব দেখান, তাতে সে রকম পুরুষদের ঝাঁটা মারলে তসলিমাকে দোষ দেওয়া যায় না। বারবার যেভাবে পুরুষরা তাঁকে প্রতাড়না করেন, তাতে পুরুষবিদ্বেষী হতেই পারেন তিনি।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্বীকার করবো, তসলিমার চরিত্র বোঝার ক্ষ্যামতা আমার নেই। সেই বেল্টওয়ালা স্বামীর ভয়ে পাশের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন তসলিমা। বিয়ে ভেঙে যায়। তারপর সেই পুরুষ যখন আবার তাঁর দেহ চান, তসলিমা তাতে তক্ষুণি রাজি হন। এ কি একজন আপোশহীন সংগ্রামী নারীবাদীর চরিত্র ? অথচ তিনি মোল্লাদের বিরুদ্ধে যে-অবস্থান নিয়েছিলেন, তাতে তাঁকে দুর্বল চরিত্রের মানুষ বলবো কিভাবে ?

পুরুষরা নারীদের এক্সপ্লয়েট করেছে যুগে যুগে। তার জন্যে আজ কি মেয়েরা এক্সপ্লয়েট করবে পুরুষদের ? সব পক্ষের এক্সপ্লয়টেশান বন্ধ করাই তো একজন মানবতাবাদীর কর্তব্য, তাই না ? কিন্তু তসলিমা তাঁর কবিতার অনবদ্য ভাষায় লেখেন:

আমার খুব ছেলে কিনতে ইচ্ছে হয়
ডাঁশা ডাঁশা ছেলে, বুকে ঘন লোম—
ছেলে কিনে ছেলেকে আমূল তছনছ করে
কুঞ্চিত অণ্ডকোষে জোর লাথি কষে বলে উঠব— যাশ্ শালা।

এতো পুরুষের উল্টো পিঠ! পুরুষের সঙ্গে এখানে তাঁর চরিত্রের কোনো ফারাক নেই। আমি তা হলে তাঁকে আদর্শবাদী বলবো কেন? মহৎ বলবো কেন ? নারীবাদ কি মানবতার চেয়েও বড়ো ?

দ্বিখণ্ডিত ওরফে *ক* পড়ে আরও একটা ব্যাপারে খটকা লাগলো। তসলিমার অনেক পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। হতেই পারে। পারস্পরিক সম্মতিতে প্রাপ্তবয়স্ক লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক কী হবে— সেটা তাঁরাই বিবেচনা করবেন। কিন্তু সেই সম্পর্ক অতীত হলে, সে সম্পর্কে লেখা সঙ্গত কিনা এবং লিখলে, সেটাকে কেউ এক্সপ্লয়টেশান বলতে পারেন কিনা। একজনকে ব্যবহার করে অথবা একজনের কাছে ব্যবহৃত হয়ে, তারপর সেই অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী বর্ণনা করে বই লিখে পরিচিতি অর্জন করা, টাকা উপার্জন করা— এটাকে কি ফেয়ার প্লে বলা যায় ?

তা সত্ত্বেও স্বীকার করবো, প্রথমে ব্যবহার করে তারপর প্রতাড়না করে থাকলে, আক্রোশের আগুনে জ্বলে তাঁর বিরুদ্ধে মন্তব্য করা অসম্ভব নয়। মানুষ তো! কিন্তু কারো সম্পর্কে কেবল শুনে তাঁর চরিত্র হননের অধিকার আমাদের আছে কি ? প্রসঙ্গত আমার মনে হয়, আমাদের সমাজে আদর্শ খুব কম। আদর্শ চরিত্র, রোল-মডেল, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বও কম। যে-স্বল্পসংখ্যক চরিত্র আছেন, সমাজ যাঁদের কথা শোনে, যাঁরা আমাদের বিবেকের কথা বলেন সংকটকালে, সেই মুষ্টিমেয় চরিত্রগুলো ধ্বসিয়ে দিয়ে লাভ কি? বিশেষ করে শোনা-কথার ওপর নির্ভর করে ?

ব্যক্তিগত জীবনে তসলিমা মৃদুভাষী, অত্যন্ত বিনয়ী। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। কিন্তু বল্লমের মতো কলম হাতে যে-তসলিমাকে দেখি, তিনি খুব বিনয়ী নন। তাঁর ভাষা, তাঁর বর্ণনা কখনো কখনো শোভন সীমানা ছাড়িয়ে যায়। আমরা যখন একজন মাননীয় ব্যক্তি সম্পর্কে বলি, বয়স্ক লোক সম্পর্কে বলি, এমন কি, গল্পের শ্রদ্ধাভাজন কোনো চরিত্র সম্পর্কে বলি, তখন সাধারণত আমরা ক্রিয়াপদের শেষে "ন" লাগিয়ে সম্মান দেখাই। রামায়ণের রামচন্দ্র রক্তমাংসের মানুষ সম্ভবত নন। খুব সম্ভব কল্পিত চরিত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে যখন লিখি, তখন মনে হয়, তাঁকে সম্মান দেখানোই সাধারণ সৌজন্য। না-দেখালে, নিজেকেই ছোটো করা হয় আসলে। রক্তমাংসের চরিত্র, ঐতিহাসিক চরিত্র— বিশ্বের একটা বড়ো ধর্মের প্রবর্তক সম্পর্কে লিখতে গিয়েও তসলিমা তাঁর প্রতি সম্মান দেখাননি। আমি কি বলতে পারি,

"ব্যাটা" ধর্মপ্রবর্তক ? আমার মনে হয়, তাঁকে মানি অথবা না-ই মানি, এটা লেখা শোভন নয়। এমন কি, এটা লিখে আমি এমন বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারি, যা থেকে আমার অমঙ্গল হতে পারে, একটা জনগোষ্ঠীর মধ্যে হানাহানি হতে পারে।

তসলিমা অবশ্যই বলতে পারেন যে, তাঁর বাকস্বাধীনতা আছে। তিনি যা খুশি লিখতে পারেন, এবং অন্যরা যা খুশি লিখে তাঁর উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু সত্যি কি তাই ? বাক প্রকাশের স্বাধীনতা কি অফুরন্ত, সীমাহীন ? আমি রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে যা খুশি তাই বলতে পারি ? বাক প্রকাশের সঙ্গে কি ঔচিত্যবোধ এবং মানবকল্যাণের ধারণার কোনো যোগাযোগ নেই ? বছর পনেরো আগে, সালমন রুশদী তাঁর *শয়তানের পদাবলী* লিখেছিলেন। তার মধ্যে সরাসরি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের চরিত্র নিয়ে অশ্লীল কোনো কথা ছিলো না। তা ছাড়া, তিনি লিখেওছিলেন, সাহিত্যের উচ্চাঙ্গ রীতিতে, রেখে-ঢেকে। কিন্তু তাই নিয়ে দাঙা বাঁধলো দেশে দেশে। নিরপরাধ কতোগুলো মানুষের জীবন গেলো। এই উগ্রবাদী দাঙার নিন্দা আমরা অবশ্যই করতেই পারি। আবার এ দাঙার ব্যাপারে সালমান রুশদীর দায়িত্বও ভুলে যেতে পারিনে।

বাক প্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই আছে। সভ্যতার, মানবতার এটা একটা আবশ্যিক শর্ত। কিন্তু বাক প্রকাশের স্বাধীনতা কি অ্যাব্‌সোলূট ? চরম ? অন্য কোনো বিবেচনা যার কাছে ঠাঁই পাবে না ? তা হলে যে-বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেন, তাঁদের কেন নিন্দা করবো ? পর্নোগ্রাফি তৈরি করে যাঁরা অনেকের অনুভূতিকে উস্কে দেন, তাঁদের কেন নিন্দা করবো ? আমার মনে হয়, বাক স্বাধীনতার সঙ্গে মানবকল্যাণের ধারণাটাও জড়িয়ে আছে অঙ্গাঙ্গিভাবে। অধিকারের সঙ্গে দায়িত্বের যোগাযোগও অস্বীকার করা যায় না।

সব শেষে একটা কথা মনে হচ্ছে। তসলিমা কলম হাতেই আমাদের সামনে হাজির হয়েছিলেন। এবং রাতারাতি লাভ করেছিলেন অসামান্য খ্যাতি। তাঁর কবিতা এবং ধারালো গদ্যই নয়, তাঁর খ্যাতির একটা প্রধান কারণ নারীমুক্তির সংগ্রামে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা। সেই ভূমিকায় তাঁকে অটল থাকতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। তিনি নারীমুক্তির পথ থেকে সরে গিয়ে অবশ্যই লেখিকার ভূমিকা নিতে পারেন। অথবা সেটাকেই বড়ো করে তুলতে পারেন। প্রশ্ন হচ্ছে: তাঁর সত্যিকার শক্তি কোথায় ? আমার মনে হয়, সীমাহীন সাহসে আর আত্যন্তিক আন্তরিকতায়। অনেক কাল আগে রবীন্দ্রনাথ একটি তরুণের মধ্যে একই ধরনের অসামান্য শক্তি লক্ষ্য করে তাঁকে বলেছিলেন, তুমি তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচছো। আশা করি, প্রতিভাবান এবং প্রতিশ্রুতিশীল তসলিমা তাঁর শক্তির অপচয় করবেন না।

(*প্রথম আলো*, মার্চ ২০০৫)

৫

সুকুমারী থেকে সুচিত্রা

১৮১৯ সালে রামমোহন লিখেছিলেন যে, মহিলাদের মেধা বা বুদ্ধি আছে, পুরুষরা তার কোনো পরীক্ষা নেননি। তা সত্ত্বেও তাঁদের তাঁরা নির্বোধ বলে সাব্যস্ত করেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখার এই প্রবণতা অবাঞ্ছিত হলেও অপ্রত্যাশিত ছিলো না— বিশেষ করে যে-সমাজে নিন্দার্থে "স্ত্রীবুদ্ধি" বলে একটা কথা চালু ছিলো। সে জন্যে মেয়েরা অভিনয় করতে পারেন, এ ধারণাই কারো মাথায় আসেনি। চৈতন্যদেব মেয়েদের কিছু অধিকার এবং সম্মান দিয়েছিলেন। তাঁর অনেক মহিলা শিষ্যও ছিলেন। কিন্তু তবু 'নাটক' অভিনয়ের সময়ে তিনি নিজে স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, মেয়েদের অভিনয় করতে ডাকেননি। তার প্রায় তিন শতাব্দী পরে গেরেশিম লেবেদেফ যখন ১৭৯৫ সালে বাংলায় 'কাল্পনিক সংবদল' নামে একটি নাটক লিখে তার অভিনয় করানোর উদ্যোগ নেন, তখন তাঁর বাংলার শিক্ষক গোলোকনাথ দাস এই অভিনয়ের জন্যে তাঁকে কেবল অভিনেতা নয়, একাধিক অভিনেত্রীও জোগাড় করে দিয়েছিলেন। এই নাটক প্রথম বার অভিনীত হয় ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে আর দ্বিতীয় বার পরের বছর ২১শে মার্চ তারিখে। দুবারই তাঁর থিয়েটার দর্শকে ভরে গিয়েছিলো। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই নাটকের অভিনয় বেশ সফল হয়েছিলো। মহিলারাও হয়তো ভালো অভিনয় করেছিলেন। এতে যে-মহিলারা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন বাইজি অথবা ঐ শ্রেণীর মহিলা। তথাকথিত ভদ্রমহিলা নন।

আঠারো শতকের শেষ দিকে কলকাতায় থিয়েটার অপরিচিত ছিলো না, কারণ ততোদিনে সেখানে একাধিক ইংরেজি থিয়েটার চালু হয়েছিলো। সেই পরিবেশে লেবেদেফ যে-উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা ছিলো ভোর রাতে যে-পাখি ডাকে, তার মতো। তারপর বহু বছর কোনো স্বদেশী অথবা বিদেশী বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয় করানোর কোনো উদ্যোগ না-নিলেও বাঙালি সমাজ চিরকাল ঘুমিয়ে থাকতে পারেনি। প্রসন্নকুমার ঠাকুর অভিনয় করানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু তখন নারীচরিত্রে কোনো মহিলা অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায় না। অপর পক্ষে, ১৮৩৫ সালের অক্টোবর মাসে নবীনচন্দ্র বসু নামে একজন ধনীর উদ্যোগে শ্যামবাজারে বিদ্যাসুন্দরের যে-অভিনয় হয়েছিলো, তাতে একাধিক মহিলা অভিনয় করেছিলেন। এঁদের মধ্যে দুজনের নামও জানা গেছে— রাধামণি আর জয়দুর্গা। রাধামণি অভিনয় করেছিলেন বিদ্যার ভূমিকায়। ষোলো-সতেরো বছর বয়সী এই মেয়েটি অভিনয় এবং গানে এতো পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন যে, সমসাময়িক পত্রিকায় তাঁর খুব প্রশংসা করা হয়েছিলো। তাঁর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে

একটি পত্রিকায় এও লেখা হয়েছিলো যে, তাঁর অভিনয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিলারা যথেষ্ট মেধার অধিকারী।

১৮২০ এবং ৩০-এর দশক পর্যন্ত যৌনকর্মীদের প্রতি সমাজের মনোভাব আদৌ কঠোর হয়নি। কিন্তু ১৮৫০-এর দশক নাগাদ তা কঠোর হতে আরম্ভ করেছিলো। সে জন্যেই রাধামণির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও ১৮৫০-এর দশক থেকে যেসব অভিনয় হতে আরম্ভ করে, তাতে নারীদের ডাক পড়েনি। তখন *কুলীনকুলসর্বস্ব*, *বিধবাবিবাহ*, *শকুন্তলা*, *বিক্রমোর্বশী* ইত্যাদি নাটকের নারীচরিত্রে অভিনয় করেছেন পুরুষরা। এমন কি, সাহেব মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন ১৮৫৮ সালে নাটক লিখতে শুরু করলেন, তখনো তিনি নারীদের নিয়ে আসতে পারলেন না। আশ্চর্য নয়, বাংলা নাটককে তিনি অলীক কুনাট্য বলে নিন্দা করেছিলেন।

নারীচরিত্রে অভিনয়ের জন্যে মহিলাদের তো পাওয়া যেতোই না, এমন কি এসব চরিত্র অভিনয় করার উপযোগী পুরুষ পাওয়াও সহজ ব্যাপার ছিলো না। সে জন্যে নাট্যকারদের এমনভাবে নাটক লিখতে হতো, যাতে নারীচরিত্র কম থাকে। *কৃষ্ণকুমারী* লেখার সময়ে মাইকেল নানা রকম যোগবিয়োগ করে শেষ পর্যন্ত চারটি নারীচরিত্র রেখেছিলেন। কারণ তিনি চারজন অভিনেতাকে চিনতেন, যাঁরা এই চরিত্রে অভিনয় করতে পারবেন বলে তিনি মনে করেছিলেন। কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি অভিনেত্রী জোগাড় করতে সক্ষম হননি, অথবা বাংলা রঙ্গমঞ্চে নারীচরিত্রে মহিলাদের অভিনয় করতেও দেখেননি। তা সত্ত্বেও মৃত্যুর ঠিক আগে সামান্য টাকার জন্যে তিনি যখন বেঙ্গল থিয়েটারের ফরমায়শে *মায়াকানন* নাটকের ডিকটেশান দেন, তখনো শরৎচন্দ্র ঘোষকে বলেছিলেন যে, অভিনেত্রী ছাড়া নাটকের সফল অভিনয় হতে পারে না, অথবা অভিনয়ের উন্নতিও নয়। অনেকটা তাঁর উৎসাহে শরৎচন্দ্র অভিনেত্রী নিয়ে এসেছিলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চে। কিন্তু তার মাস দেড়েক আগেই— ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন— মাইকেল শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

আসলে, বাঙালি সমাজে নারীদের প্রতি একটি দ্বৈত মনোভাব আগাগোড়াই লক্ষ্য করা যায়। নারীদের দু ভাগে ভাগ করে দেখেছে এ সমাজ। ঘরের নারী আর বাইরের নারী। পুরুষরা আশা করতেন ঘরের নারীরা হবেন পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীর মতো। সতী-সাধ্বী হবেন। বন্দী থাকবেন অন্তঃপুরে। সন্তান জন্ম দেবেন, তাদের লালনপালন করবেন। ঘরের কাজ করবেন। আর, রাতের বেলা স্বামী বাড়িতে থাকলে মুখ বুজে তাঁকে শারীরিক সুখ দেবেন। শীৎকার কথাটা প্রযোজ্য ছিলো বেশ্যাদের জন্যে, ভদ্রমহিলাদের জন্যে নয়। তাঁরা লাজনম্র হবেন। যৌনসুখও নীরবে উপভোগ করবেন। তাঁরা প্রিয়া নন, তাঁরা সন্তানের জননী।

ফুর্তি করার জন্যে পুরুষরা যেতেন বাইরের নারীদের কাছে। তাঁরা আশা করতেন এই নারীরা হবেন নাচ-গান জানা, খানিকটা লেখাপড়া জানা, চালাক-চতুর, বেশভূষায় স্মার্ট, যৌনকর্মে নানা কৌশলের অধিকারী। সবচেয়ে বড়ো কথা, এঁরা

হবেন অসতী। এই নারীদের মধ্যে অনেকেই প্রচিলত অর্থে যৌনকর্মী ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন রক্ষিতা। বাবুরা রক্ষিতা রাখতেন। রক্ষিতা রেখে গর্ব করতেন। প্রেম-ভালোবাসাও করতেন এই রক্ষিতাদের সঙ্গে। রামমোহন রায়ের জীবদ্দশায় সবচেয়ে নাম-করা বাইজী ছিলেন নিকি। সাহেব-মেম সাহেবরাও তাঁর সৌন্দর্য এবং গুণের প্রশংসা করেছেন। এক লাখ টাকা দিয়ে এক বাবু তাঁকে রক্ষিতা রেখেছিলেন। ভার্যার সঙ্গে প্রেম হতো না, ভার্যা ছিলেন কেবল পুত্র জন্ম দেওয়ার জন্যে। যৌনতার ব্যাপারে এক আশ্চর্য রকমের দ্বৈতমান এবং ভণ্ডামি ছিলো পুরুষ সমাজের। তাঁরা স্ত্রী ছাড়া অন্য মেয়েদের উপভোগ করলে, অসৎ বলে তাঁদের অখ্যাতি হতো না, কিন্তু মেয়েরা অন্যের ছায়া মাড়ালেও অসতী বলে কুখ্যাত হতেন। অভিনয়ের জন্যে যখন নারীদের প্রয়োজন হলো তখন তাই ঘরের মেয়েরা নন, বাইরের মেয়েদের, "খারাপ মেয়েমানুষ"দের ডাক পড়লো।

বেঙ্গল থিয়েটার মহিলাদের মঞ্চে নিয়ে এসে বাংলা নাটক বিকাশ লাভের পথ প্রশস্ত করেছিলো। কিন্তু তখন মহিলাদের অভিনয়ে মস্ত দুটি বাধা ছিলো। একদিকে, অভিনয় করতে জানতেন, এমন মহিলা ছিলেন না— তাঁরা তো সাত জন্মে অভিনয় করেননি! অন্য দিকে, দর্শকরা মঞ্চে মহিলাদের দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না। অনেকে দেখতে চাইতেনও না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং শিবনাথ শাস্ত্রী কেবল সমাজসংস্কারক ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন নারীদরদী এবং মহিলাদের উন্নতি চাইতেন আন্তরিকভাবে। দুজনই অভিনয় দেখতেও ভালোবাসতেন। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটার অভিনেত্রীদের নিয়ে আসার পর এঁরা আর কোনোদিন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে যাননি। সে যুগের বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা কেশব সেনও ছিলেন এঁদের মতো। তিনিও মহিলাদের উন্নতি চাইতেন। মেয়েদের ব্যাপারে বেশ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিলো তাঁর। এমন কি, নিজে নাটকের অভিনয়ও করেছেন। কিন্তু ১৮৭৯ সালে তিনি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মহিলাদের নিয়ে অভিনয় করার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছিলেন তাঁর *সুলভ সমাচার* পত্রিকায়। এঁদের মতো অন্য অনেক দর্শকেরও মহিলাদের অভিনয়ের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব ছিলো।

নারীদের দিয়ে স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করানোর উদ্যোগ নিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার রীতিমতো অভিনয়ের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলো। গোড়াতে যে-চারজন অভিনেত্রী এসেছিলেন, তাঁরা ছিলেন জগত্তারিণী, গোলাপসুন্দরী, এলোকেশী এবং শ্যামা। এঁদের অভিনয়ের কোনোই অভিজ্ঞতা ছিলো না। সবাই লেখাপড়াও জানতেন না। কিন্তু সবাই কমবেশি নাচ-গান জানতেন। জীবিকার প্রয়োজনেই এঁরা ছেলেবেলা (অথবা মেয়েবেলা) থেকে নাচ-গান শিখতেন, কারণ এঁরা ছিলেন রূপজীবিনী। একে মহিলাদের মঞ্চে নিয়ে আসা, তদুপরি সেই মহিলারা আবার রূপজীবিনী— এই দুই কারণে পুরুষ-পরিচালিত অনেক পত্রপত্রিকাই বেঙ্গল থিয়েটারের তীব্র সমালোচনা করেছিলো। কিন্তু সমালোচনা সত্ত্বেও বেঙ্গল থিয়েটার যে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিলো তার অন্যতম কারণ হয়তো অভিনেত্রীদের নিয়োগ।

একটি পত্রিকা বেঙ্গল থিয়েটারের সমালোচনা করে বলেছিলো যে, এঁরা "বেশ্যা"দের মঞ্চে এনে নাটককে যাত্রার স্তরে নামিয়েছেন। তার মানে তখন নাটক এবং যাত্রারও বড়ো রকমের পার্থক্য ছিলো। নাটক ছিলো শিক্ষিত ভদ্রলোকদের, ধনী বাবুদের। আর, যাত্রা ছিলো সাধারণ মানুষদের। আশা করা হতো পাশ্চাত্য প্রভাবিত নাটকের রুচি হবে যাত্রার চেয়ে উন্নত মানের। ভদ্রলোকদের মঞ্চে তাই অভিনেত্রীদের ডাক পড়েনি। কিন্তু যাত্রায় তাঁরা অংশ নিতেন। সমাজের এই মূল্যবোধকে প্রশ্ন করে অভিনেত্রীদের নিয়ে এসে শরৎচন্দ্র ঘোষ যে-ভূমিকা পালন করেছিলেন তা কতো গুরুত্বপূর্ণ এবং যে-সৎসাহস দেখিয়েছিলেন, তা কতো অসাধারণ, তা বোঝা যায় আরও ৪০ বছর পরের একটি ঘটনা থেকে। ১৯১৩ সালে যখন দাদাসাহবে ফালকে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তখনো নায়িকার ভূমিকায় তাঁকে নিতে হয়েছিলো রেস্টুরেন্টের এক পুরুষ রাঁধুনিকে। আর, ঢাকায় পূর্ববঙ্গ সরকার ১৯৫৮ সালেও 'বেদের মেয়ে' নাটক করার অনুমতি দিয়েছিলো এই শর্তে যে, তাতে কোনো মহিলা অভিনয় করতে পারবেন না। এ দিক দিয়ে বিচার করলে শরৎচন্দ্র ঘোষ রীতিমতো ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

তবে স্বীকার না-করে উপায় নেই যে, ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হওয়ার পর নারীচরিত্রে মহিলাদের অভিনয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিলো। আগে হোক পরে হোক, মহিলারা আসতেনই! তাই একবার সমাজের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে শরৎচন্দ্র মহিলাদের মঞ্চে নিয়ে আসার পর অন্য সব থিয়েটারই তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলো। এমন কি, ১৮৮০-এর দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের উদ্যোগে তাঁদের বাড়ির নিজস্ব মঞ্চে যেসব অভিনয় হয়, তাতেও পরিবারের মহিলারা অংশ গ্রহণ করেন, যদিও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে "ভদ্রমহিলাদের" অভিনয় পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যেও হয়নি।

মহিলারা অভিনয় করার শিক্ষা সেকালে পাননি, কিন্তু তাঁদের অনেকের যে অভিনয় করার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিলো, তা অচিরেই প্রমাণিত হয়। বেঙ্গলের দ্বিতীয় অভিনয়ে— ২৩শে অগস্ট ১৮৭৩ তারিখে— যোগ দিয়েছিলেন গোলাপসুন্দরী। তিনি ভালো গান জানতেন, বিশেষ করে কীর্তন গান। তা ছাড়া, অল্পকালের মধ্যেই অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। নানা ধরনের ভূমিকায় খ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তিনি। বেঙ্গল থিয়েটারে তখন কাজ করতেন সেকালের বিখ্যাত অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। তিনি গোলাপসুন্দরীকে অভিনয় শিখিয়ে ভালো অভিনেত্রীতে পরিণত করেন।

গোলাপ যেসব নাটকে অংশ নেন, তার মধ্যে একটি ছিলো গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে উপেন্দ্রনাথ দাসের *শরৎ-সরোজিনী*। ১৮৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে অভিনীত এই নাটকে তিনি সুকুমারী নামে একটি চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয় এতো সুন্দর হয়েছিলো যে, দর্শকরা তাঁর নামই দেন সুকুমারী। অতঃপর এই

নামেই তিনি বেশি পরিচিত হয়েছিলেন। উপেন্দ্রনাথ দাস তখন এই থিয়েটারের পরিচালক ছিলেন। তখন সেখানে গোষ্ঠবিহারী দত্ত নামে এক তরুণ অভিনেতা ছিলেন । গোলাপসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয় এবং উপেন্দ্রনাথের উদ্যোগে তিনি তাঁকে বিয়ে করেন। তারপর থেকে গোলাপসুন্দরীর নাম হয় সুকুমারী দত্ত। ভদ্রলোকের ছেলে বিয়ে করেছেন এক প্রাক্তন রূপজীবিনীকে— এই ঘটনাকে ঘিরে সমাজে গোষ্ঠবিহারীর এতো সমালোচনা হয়েছিলো যে, তিনি সুকুমারীকে ফেলে রেখে কেবল কলকাতা থেকে নয়, দেশ থেকেই পালিয়ে যান। জাহাজের খালাশি হয়ে তিনি চলে যান বিলেতে। ওদিকে, সুকুমারী কেবল এই থিয়েটারে থেকে যাননি, অভিনয়ও চালিয়ে যান তিনি। বস্তুত, আর্থিক কারণেই দীর্ঘদিন অভিনয় চালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

স্বামী পালিয়ে যাওয়ার অল্পদিনের মধ্যে (অগস্ট ১৮৭৫) তাঁর নামে 'অপূর্ব সতী' নামে একটি নাটক প্রকাশিত হয় এবং তার পর-পরই তা সফলভাবে অভিনীত হয়। দর্শকরা প্রচুর প্রশংসাও করেছিলেন এ নাটকের। কিন্তু সুকুমার সেনের মতে, এ নাটক সুকুমারীর রচনা নয়। এ বই-এর নামপত্রে রচয়িতা হিশেবে নাম আছে দুটি— আশুতোষ দাস এবং সুকুমারী দত্ত। সুকুমার সেনের মতে, আশুতোষ দাস নামটিও ছদ্মনাম, এর আসল লেখক উপেন্দ্রনাথ দাস। এ নাটকের ভাষা এতো আড়ষ্ট এবং সংস্কৃতপ্রভাবিত যে, এটি অশিক্ষিতা অথবা সামান্য শিক্ষিতা সুকুমারীর পক্ষে লেখা সম্ভব ছিলো বলে মনে হয় না। তবে এর কাহিনীর সঙ্গে সুকুমারীর নিজের প্রথম জীবনের অনেকটাই মিল ছিলো। সুকুমারীর মতোই এর নায়িকা নলিনী সামান্য লেখাপড়া জানে, তার মা বারবণিতা। সেও সুকুমারীর মতো প্রেমে পড়ে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু বাধার মুখোমুখী হয়। নায়িকা নলিনী আত্মহত্যা করে প্রাণ জুড়ায়, অপর পক্ষে, সুকুমারী স্বামীপরিত্যাক্ত হয়ে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকেন। অভিনয় করতে করতে ১৮৮৩ সালে সুকুমারী শুধুমাত্র মেয়েদের নিয়ে *হিন্দু ফিমেল থিয়েটার* নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন এবং সেখানে 'শুম্ভ সংহার' নামে একটি নাটক অভিনয় করান। ১৮৯৮ সালেও তিনি বেঙ্গল এবং মিনার্ভা থিয়েটারে একাধিক নাটকে অভিনয় করেছিলেন। *দুর্গেশনন্দিনী*তে বিমলা, *পুরুবিক্রমে* রাণী ঐলবালা, *সরোজিনী*তে সরোজিনী, *সুরেন্দ্র-বিনোদিনী*তে বিরাজমোহিনী, *মৃণালিনী*তে গিরিজায়া, *অশ্রুমতী*তে মলিনা, *বিষবৃক্ষে* সূর্যমুখী ইত্যাদি চরিত্রে তাঁর অভিনয় সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করেছিলো।

গোলাপসুন্দরী বেশ খ্যাতি লাভ করলেও বাংলা রঙ্গমঞ্চের আদিপর্বের সবচেয়ে বিখ্যাত অভিনেত্রী ছিলেন বিনোদিনী। সুকুমারীর সঙ্গে একত্রে তিনি কিছুকাল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে কাজ করেছেন। দিদি ডাকতেন তাঁকে। অভিনয় ছাড়া তিনি খুব ভালো গান জানতেন। তদুপরি, তাঁর যথেষ্ট সাহিত্যিক গুণও ছিলো। বাঙালি মহিলারা যেসব আত্মজীবনী লিখেছিলেন, তাদের মধ্যে বিনোদিনীর 'আমার কথা'

সত্যকথন এবং ভাষার সরলতার জন্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য পুরুষ চরিত্র বিশ্লেষণেও। আত্মজীবনী ছাড়া তিনি কিছু কবিতাও প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে দ্রৌপদীর সখীর ভূমিকায় প্রথমবারের মতো মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো-চোদ্দো বছর। বেতন ঠিক হয় দশ টাকা। তাঁর বংশ পরিচয় সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে তিনি সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের সন্তান ছিলেন বলে মনে করার কারণ নেই। তাঁদের বাড়ির খোলাঘরে যেসব ভাড়াটে ছিলেন, তাঁরা স্বামীস্ত্রীর মতো থাকলেও বিবাহিত ছিলেন না— বিনোদিনী নিজেই আত্মজীবনীতে এ কথা লিখেছেন। তা ছাড়া, নিজেকে তিনি সবিনয়ে অনেকবারই বারনারী ও বারাঙ্গনা বলেছেন।

অল্পকালের মধ্যে এই থিয়েটারের সঙ্গে তিনি উত্তর ভারতের বহু জায়গায় ভ্রমণ করেন। দু বছর পরে তিনি ন মাসের জন্যে বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু গিরিশ ঘোষের কথায় তিনি ১৮৭৭ সালে সেপ্টেম্বরে বেঙ্গল ছেড়ে ন্যাশনাল থিয়েটারে ফিরে আসেন। গিরিশ ঘোষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তাঁর নিজের জন্যে খুবই কাজে লেগেছিলো, কারণ গিরিশই তাঁকে উন্নত মানের অভিনয় শিক্ষা দিয়েছিলেন। গিরিশকে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে গুরু এবং দেবতা বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই দেবতা যে কতোটা স্বার্থপর ছিলেন এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বিনোদিনীকে কতোটা ব্যবহার করেছিলেন, পরের ঘটনাবলী থেকে সেটা গোপন থাকে না।

১৮৮৩ সালের গোড়ার দিকে বিনোদিনীকে নিয়ে গিরিশ ঘোষ স্টার থিয়েটার গড়ে তুলেছিলেন। এই থিয়েটার করার ব্যাপারে তাঁদের আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী— গুরমুখরায়। আসলে থিয়েটার নয়, এই ভদ্রলোকের লক্ষ্য ছিলো বিনোদিনীকে পাওয়া। বারবণিতা ছিলেন বটে, তবু বিনোদিনীর পক্ষে গুরমুখরায়ের কাছে নিজেকে তুলে দেওয়া সহজ ছিলো না। কারণ তার আগে থেকেই তিনি একজন ধনী জমিদারের রক্ষিতা ছিলেন। তাঁকে আন্তরিকভাবে ভালোওবাসতেন তিনি। আর এই জমিদারও তাঁকে নিজের প্রেমিকা বলে গণ্য করতেন। বিনোদিনী অভিনয় করবেন— এতে তাঁর আপত্তি ছিলো না। বাধা দেখা দেয় অন্য দিক থেকে। গিরিশ ঘোষ এবং বিনোদিনী যে-ন্যাশনাল থিয়েটারে কাজ করতেন, তাঁর মালিক ছিলেন প্রতাপচাঁদ জহুরী নামে এক অবাঙালি ব্যবসায়ী। শখ হিশেবে নয়, থিয়েটারকে তিনি ব্যবসা হিশেবেই দেখতেন। তাঁর অধীনে স্বাধীনভাবে কাজ করা গিরিশ ঘোষ এবং তাঁর সহযোগী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন গিরিশ ঘোষ একটি নতুন থিয়েটার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

থিয়েটার গড়ে তোলার জন্যে যে-টাকাপয়সার দরকার ছিলো, তা গিরিশ জোগাড় করতে পারেননি। সেই পরিস্থিতিতে বিশ-একুশ বছরের যুবক গুরমুখরায় থিয়েটার গঠনে সাহায্য দিতে এগিয়ে আসেন। আগেই বলেছি, থিয়েটারের চেয়ে

বিনোদিনীর দিকেই ছিলো তাঁর বেশি আকর্ষণ। তিনি তাই বিনোদিনীকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে তাঁকে থিয়েটার গঠনের উদ্যোগ ছেড়ে দেওয়ার জন্যেও অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু থিয়েটার ছিলো বিনোদিনীর প্রাণ। একমাত্র থিয়েটার গঠনের শর্তেই তিনি নিজের প্রেমিককে ত্যাগ করে গুরমুখরায়কে গ্রহণ করতে রাজি হন। ওদিকে, তাঁর প্রেমিক-জমিদার এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হন। লাঠিয়াল নিয়ে এসে নতুন থিয়েটার ভেঙে ফেলতেও চেষ্টা করেন তিনি। সাময়িকভাবে আত্মগোপন করেও বিনোদিনী তাঁর হাত থেকে রক্ষা পাননি। একদিন তলোয়ার হাতে জমিদার ঢুকে পড়েন বিনোদিনীর শোবার ঘরে। খুন করার জন্যে চেষ্টাও করেন। কিন্তু ভাগ্য এবং উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বিনোদিনী তলোয়ারের কোপ থেকে রক্ষা পান। বস্তুত, তিনি থিয়েটার গড়ে তোলার জন্যে যে-আত্মত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তা অতি অসাধারণ। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, এই বিরাট আত্মত্যাগ সত্ত্বেও কারো কারো বিরোধিতার কারণে স্টারে তিনি সাড়ে তিন বছরও কাজ করতে পারেননি। গুরমুখরায়ও তাঁকে সমর্থন দিতে পারেননি। কারণ থিয়েটার শুরু করার পর তিনি বেঁচেছিলেন মাত্র বছরখানেক। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার তাঁকে যাঁরা সরিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে গিরিশ ঘোষও ছিলেন।

স্টার থিয়েটারে অভিনয়ের সময়েই তিনি খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছিলেন। একশো বছর পরেও তাঁর নাম টিকে আছে, যদিও মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে তিনি অবসর নিতে বাধ্য হন। সন্দেহ হয়, তিনি যখন অবসর নেন, তখনো তাঁর প্রতিভার চরম বিকাশ হয়েছিলো কিনা।

স্টারের আমলে গিরিশ ঘোষ পুরোদমে নাটক লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি পৌরাণিক এবং ধর্মীয় নাটকসহ বিভিন্ন ধরনের নাটকই লিখেছিলেন। এমন কি, শেক্সপীয়রের অনুবাদও শুরু করেছিলেন। এই থিয়েটার স্থাপিত হওয়ার পর বছর দুই পরে তাঁর লেখা *চৈতন্যলীলা* নাটকে চৈতন্যের ভূমিকায় নেমেছিলেন বিনোদিনী। ১৮৮৫ সালের ৭ই অক্টোবর সেই নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস। তিনি তাঁর ভাববিহ্বল অসাধারণ অভিনয় দেখে এতো মুগ্ধ হন যে, অভিনয় শেষ হবার পর তাঁকে আশীর্বাদ করে যান। যে-কালে বিদ্যাসাগর মঞ্চে নারীদের আগমনে অভিনয় দেখাই বন্ধ করেছিলেন, সেই সময়ে রামকৃষ্ণের মতো একজন ধর্মগুরু তাঁর অভিনয় দেখায় এবং তাঁকে আশীর্বাদ করায় মঞ্চে মেয়েদের অভিনয় হিন্দু সমাজের এক ধরনের স্বীকৃতি লাভ করেছিলো। এর পরেও রামকৃষ্ণ দুবার স্টারে অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত তখনো স্বামী বিবেকানন্দ হননি। কিন্তু তিনিও একাধিকবার স্টারে অভিনয় দেখতে আসেন। আর আসেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নিজের লেখা মৃণালিনীর অভিনয় তিনি দেখেছিলেন ১৮৮৫ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে। সেই নাটকের মনোরমার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিনোদিনী। এই অভিনয় দেখে বঙ্কিমচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি

বলেছিলেন যে, তিনি মনোরমার চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন কাগজে-কলমে। কিন্তু সেই মনোরমাকে তিনি যে নিজের চোখের সামনে দেখতে পাবেন এটা আশা করেননি। বিনোদিনী আসলে মনোরমাকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন।

৫০টিরও বেশি নাটকে প্রায় ৯০টি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিনোদিনী। তার মধ্যে পৌরাণিক এবং ধর্মীয় নাটকে তাঁর অভিনয় ছিলো বিশেষ করে স্মরণীয়। এসব অভিনয় কেবল রক্ষণশীল হিন্দুরা দেখেননি, বরং তাঁরা উপভোগও করেছিলেন। এভাবে বিনোদিনী মহিলাদের অভিনয়কে বাঙালি দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। অভিনয় ছাড়া গানেও তাঁর অবদান কম নয়। বিশ শতকের গোড়ায় যখন বঙ্গদেশে গ্রামোফোন চালু হয়, তখন তিনি এগিয়ে আসেন গান গাইবার জন্যে। তাঁর রেকর্ড করা অনেকগুলোর গানের মধ্যে কয়েকটি রক্ষা পেয়েছে। এ গান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি কতো উঁচুমানের গায়িকা ছিলেন।

ব্যক্তি বিনোদিনীর নামে-মাত্র বিয়ে হয়েছিলো তাঁর বয়স যখন বছর পাঁচেক। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সে স্বামীর সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিলো না। পরে তিনি একে-একে তিনজন ধনীর রক্ষিতা হন। এর মধ্যে শেষজনের সঙ্গে তাঁর কেটেছে একত্রিশ বছর। তিনি বিনোদিনীর জন্যে বাড়িসহ কিছু সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। সেই দিয়েই জীবনের শেষ ২৯ বছর বেঁচে ছিলেন। নয়তো তাঁর অবস্থা হতো পারতো সুকুমারীর মতো নিঃস্ব, রিক্ত। শেষ জীবনে সুকুমারী কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলেন, কেউ তার খোঁজ রাখে না। কিন্তু বিনোদিনী শেষ পর্যন্ত সচ্ছল অবস্থায় থেকে বিদায় নিতে পেরেছিলেন ১৯৪১ সালে।

বিনোদিনীর বছর পাঁচেকের ছোটো ছিলেন কিরণবালা। তিনিও জন্মেছিলেন কলকাতায় নিষিদ্ধ পাড়ায় এক বারবণিতার ঘরে। তাঁর পিতৃপরিচয় জানা যায় না। কখন থেকে তিনি অভিনয় শুরু করেন তাও নয়। তবে বিনোদিনীর সঙ্গে স্টার থিয়েটারে অভিনয় করার সময় থেকে তিনি পরিচিতি লাভ করতে থাকেন। গিরিশ ঘোষই তাঁকে অভিনয় করতে শিখিয়েছিলেন। যতোদিন বিনোদিনী স্টারে ছিলেন, ততোদিন নিজের যোগ্যতার কারণেই তিনি সব সময়ে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। কিন্তু ১৮৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে বিনোদিনী যখন মঞ্চ ছেড়ে স্থায়ীভাবে রক্ষিতার ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হন, তখন যেসব ভূমিকায় তিনি অভিনয় করতেন, সেসব ভূমিকায় নামেন কিরণবালা। এসব চরিত্রে অভিনয়ে বিনোদিনী যে-আদর্শ রেখে গিয়েছিলেন, কিরণবালা তা যোগ্যতার সঙ্গে বজায় রাখতে পেরেছিলেন। এ দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, অত্যন্ত উঁচুদরের অভিনয় ক্ষমতা ছিলো তাঁর। তবে তা সত্ত্বেও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তিনি যে খুব বড়ো নায়িকা হিশেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করতে পারেননি, তার কারণ তাঁর অকাল মৃত্যু। মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি বসন্ত রোগে মারা যান।

বিনোদিনীর পরে সে যুগের সবচেয়ে নাম-করা অভিনেত্রী ছিলেন তিনকড়ি দাসী। তাঁরও মা ছিলেন বারবণিতা। তিনিও অভিনয়ের দিকে এসেছিলেন টাকার অভাবে। পরবর্তী কালে যিনি এতো বড়ো অভিনেত্রী হয়েছিলেন, ১৮৮৬ সালের জুন মাসে তিনি যখন গিরিশ ঘোষের *বিল্বমঙ্গল* নাটকে অভিনয় আরম্ভ করেন, তখন সে ভূমিকা ছিলো নির্বাক সখীর। সত্যিকারভাবে তিনি প্রথম অভিনয় করেন *মীরাবাঈ* নাটকে, মীরার ভূমিকায়। বিনোদিনীর মতো তিনিও ভালো অভিনয় শিখেছিলেন গিরিশ ঘোষের কাছে। ১৮৯৩ সালে তাঁরই নাটক *ম্যাকবেথে* লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনকড়ি সমালোচকদের প্রশংসা কুড়ান। গিরিশ ঘোষের আরও কয়েকটি নাটকে তিনি প্রধান ভূমিকায় নেমেছিলেন। তাঁর অভিনয় পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে গিরিশ ঘোষ বলেছিলেন যে, বাংলার রঙ্গমঞ্চে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। আসলে অভিনয়ে তাঁর আকর্ষণ এতো আন্তরিক ছিলো যে, তিনি এর জন্যে অন্য লোভ ত্যাগ করেছিলেন। যেমন, প্রথম দিকে তাঁকে মাসে দু শো টাকা দিয়ে একজন ধনী রক্ষিতা রাখতে চাইলেও তিনি চল্লিশ টাকা বেতনের অভিনেত্রীর কাজ ছাড়তে রাজি হননি। দু শো টাকা তখন অনেক টাকা। স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করায় তাঁর মা তাঁকে প্রহার করেছিলেন। টাকার প্রতি তাঁর মমতা বস্তুত কমই ছিলো। তাই ১৯১৭ সালে মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর দুটি বাড়ি হাসপাতালের জন্যে দান করে গিয়েছিলেন।

থিয়েটারে কাজ শুরু করার পর একাধিক পুরুষের সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের সম্পর্ক হয়েছিলো। এমন কি, স্বয়ং গিরিশ ঘোষের সঙ্গেও তাঁর প্রণয় ছিলো বলে লোকজন বলতো। তবে জীবনের শেষ দিকের বছর বিশেক তিনি এক বাবুর রক্ষিতা ছিলেন। নিজের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই বাবু তাঁকে যত্নের সঙ্গেই রেখেছিলেন বলে মনে হয়। তিনকড়ি তাঁর তৃতীয় বাড়িটি দান করে গিয়েছিলেন এই বাবুর পুত্রকে।

তিনকড়ির কয়েক বছরের ছোটো ছিলেন কুসুমকুমারী (১৮৭৬?-১৯৪৮)। নাচের পথ ধরে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। তারপর গ্র্যান্ড, ক্লাসিক, কোহিনুর, স্টার ইত্যাদি অনেক থিয়েটারেই যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। *আলিবাবা* নাটকে মর্জিনার ভূমিকায় তাঁর অভিনয় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো। তিনিই প্রথম অভিনেত্রী যিনি অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের নাচ শেখাতেন। ভালো গানও জানতেন তিনি।

কুসুমকুমারীর মোটামুটি একই বয়সী ছিলেন নরীসুন্দরী। তিনিও তাঁর আগেকার অভিনেত্রীদের মতো বারবণিতার সন্তান ছিলেন। সঙ্গীতশিল্পী হিশেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। অন্যদের তুলনায় একটু বেশি বয়সে— প্রায় ষোলো-সতেরো বছর বয়সে— ১৮৯২ সালে তিনি স্টার থিয়েটারের মঞ্চে উঠেছিলেন— *ঋষ্যশৃঙ্গ* নাটকের প্রধান চরিত্রে। বছর দুয়েক পরে *চন্দ্রশেখর* নাটকে তিনি দলনীর ভূমিকায় সত্যিকার খ্যাতি লাভ করেন। তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি নানা চরিত্রে দক্ষতার

সঙ্গে অভিনয় করে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্থায়ী নাম রেখে গেছেন। ১৯১১ সাল পর্যন্ত তিনি একটানা স্টারের অভিনেত্রী ছিলেন। তারপর কখনো মির্নাভা, কখনো স্টার, কখনো অন্য কোনো থিয়েটারে কাজ করে শেষ পর্যন্ত ১৯২৬ সালে মঞ্চ থেকে সরে যান। তিনি মারা যান ১৯৩৯ সালে।

নরীসুন্দরীর সমবয়সী ছিলেন তারাসুন্দরী। তিনিও বারবণিতার সন্তান। ১৮৮৪ সালে বছর সাতেক বয়সে তিনি বিনোদিনীর সাহায্যে স্টার থিয়েটারের মঞ্চে প্রবেশ করেন। গিরিশ ঘোষের *চৈতন্যলীলা* নাটেকে বিনোদিনী নিমাই-এর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তারাসুন্দরী সেই নাটকেই একটি ছেলের ভূমিকায় নামেন। তিনি গিরিশ ঘোষের আরও কয়েকটি নাটকে অংশ নিয়েছিলেন। প্রথম বালিকা চরিত্রে অভিনয় করেন *হারানিধি* নাটকে। ১৮৯১ থেকে তিনি অভিনয় করতেন নায়িকার ভূমিকায়। তবে তাঁর খ্যাতি আসে ১৮৯৪ সালে *চন্দ্রশেখর* নাটকে শৈবলিনীর ভূমিকায় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। অভিনয়ে তিনি এতো পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন যে, এক সময়ে সবাই তাঁকে বলতেন নাট্যসম্রাজ্ঞী।

স্টারের পর ১৮৯৭ সাল থেকে তারাসুন্দরী ক্লাসিক থিয়েটারে প্রধান অভিনেত্রীতে পরিণত হন। প্রথমে অমৃতলাল মিত্রের কাছে অভিনয় শিখলেও, ক্লাসিকে এসে তিনি অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সাহচর্যে অভিনয়ে রীতিমতো পরিণতি লাভ করেন। এখানে তিনি অনেকগুলো নাটকের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং তাঁর খ্যাতি দীর্ঘস্থায়ী হয়। ১৯২২ সাল পর্যন্ত তিনি থিয়েটারের জগতে নিয়মিত কাজ করেছেন। কিন্তু একবার অভিনয় ছেড়ে দেওয়ার পরও শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে অভিনয় করেছেন জনা এবং রিজিয়ার ভূমিকায়। তাঁর সে অভিনয় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়। অভিনয় ছাড়া তারাসুন্দরী গল্প-কবিতাও লিখতেন বিনোদিনীর মতো।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনিও তাঁর পূর্ববর্তী অভিনেত্রীদের মতো একাধিক 'বাবু'র রক্ষিতা ছিলেন। যিনি নাটকের জগতে ছিলেন অমন সম্মানের পাত্রী, ব্যক্তিগত জীবনে তিনিই সম্মান, সম্ভ্রম অথবা স্বীকৃতি পাননি, অথবা বলা যেতে পারে, সামান্যই পেয়েছিলেন। যে-পুরুষসমাজ ভেঙে পড়তো তাঁর অভিনয় দেখতে, সেই পুরুষসমাজই ব্যক্তি তারাসুন্দরীকে শ্রদ্ধা দূরে থাক, সাধারণ স্বীকৃতি দিতেও তৈরি ছিলো না।

তিনকড়ি, নরীসুন্দরী, তারাসুন্দরীদের যুগের আরও একজন সুপরিচিত অভিনেত্রী ছিলেন নীরদাসুন্দরী। তাঁর জন্ম বস্তিতে, মা কাজ করতেন ঝিয়ের। নীহারবালা, প্রভা দেবী, রমা বসু ইত্যাদি সবারই পরিচয় ছিলো কমবেশি একই রকমের।

মোট কথা, বাংলা থিয়েটারের আদি যুগের নাম-করা অভিনেত্রীরা সবাই এসেছিলেন বারবণিতাদের ঘর থেকে, অথবা সমাজের একেবারে নিচের তলা থেকে। কেউ কেউ অভিনেত্রী হয়ে নিজেরা বারনারী হয়েছিলেন। এঁরা সবাই কমবেশি গান জানতেন। নাচও জানতেন বেশির ভাগই। এমন কি, অল্পবিস্তর লেখাপড়াও তাঁরা

শিখেছিলেন। প্রধানত দারিদ্র্যের কারণে তাঁরা অভিনয়ে এসেছিলেন। কেউ কেউ এসেছিলেন পতিতাবৃত্তি থেকে রক্ষা পেতে, অথবা আর-একটু সম্মানজনক কাজের জন্যে। সুকুমারী, বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী প্রমুখ অভিনেত্রী তা পেয়েওছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, একবার রূপজীবিনীর ভূমিকা ত্যাগ করার পর তাঁরা বৃহত্তর সমাজে গৃহীত হয়েছিলেন অথবা বিয়ে-থা করে সংসার করেছিলেন। বরং দেখতে পাই, তাঁরা অভিনয় থেকে অর্থকড়ি উপার্জন করলেও সমাজে টিকে থাকার জন্যেই কারো না কারো রক্ষিতায় পরিণত হয়েছিলেন। নিজেরা গ্লানির মধ্যে থেকেও অন্যদের আনন্দ দিয়েছেন। দেহ এবং রূপ দিয়ে উপার্জন করার পাপবোধ থেকে শেষ বয়সে এই 'খারাপ মেয়েমানুষরা' ধর্মের দিকেও একটু বেশি করেই ঝুঁকে পড়তেন। কেউ কেউ দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে ভিক্ষা করেও জীবনের শেষ বছরগুলো কাটিয়েছেন।

আমরা পরের আলোচনা থেকে দেখবো বাংলা রঙ্গমঞ্চের আদি পর্ব শেষ হবার অনেক কাল পরেও অভিনেত্রীরা আসতেন সমাজের নিচের তলা থেকে। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ— যাঁরা অভিনয় করতেন সমাজ তাঁদের গণ্য করতো দেহজীবী বলে। তাঁদের অভিনয় এবং রূপের প্রশংসা হলো পত্রপত্রিকায় এবং বাড়িতে বাড়িতে, কিন্তু ব্যক্তি হিশেবে তাঁরা বিবেচিত হতেন কুলটা নারী বলে। এই অভিনেত্রীদের সমাজের অভিজাতরা কতোটা ঘৃণা করতেন, তা বোঝা যায় হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের একটি গল্প থেকে। তাঁকে নাকি এক পথচারী থিয়েটারের পথ জিজ্ঞেস করেছিলেন। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি সে পথ চেনেন না। কিন্তু একটু পরে তাঁর যখন মনে হলো যে, পথ চিনেও চেনেন না বলায় সেটা মিথ্যে বলা হলো, তখন তিনি ফিরে গিয়ে সেই পথচারীকে বললেন যে, তিনি পথ চেনেন, কিন্তু বলবেন না। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন এবং তাঁর রুচিও ছিলো ষোলো আনা ব্রাহ্ম অথবা পিউরিটান-রুচি। এতোটা না-হলেও বিশ শতকে এসেও অনেকে তাঁরই মতো থিয়েটারকে অপবিত্র জায়গা বলে বিবেচনা করতেন, অভিনেত্রীদের কারণে।

বাইরের নারীদের নিয়ে ফুর্তি করলেও ঘরের নারীদের সে যুগের পুরুষরা মঞ্চে নিয়ে আসা দূরে থাক, মঞ্চে আনার কথা ভাবেনওনি। সমাজকে চটিয়ে দিয়ে এ রকম পদক্ষেপ নেওয়ার সাহসই কারো ছিলো না। বস্তুত, আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, অভিনেত্রীদের রক্ষিতা রাখলে সমাজ তা মেনে নিতো; কিন্তু অভিনেত্রীদের বিয়ে করলে সমাজ-সংসার তা স্বীকার করে নিতো না। সমাজের এই তীব্র নিষেধ অমান্য করে বাড়ির বউ অথবা কন্যাদের অভিনয়ে আসার জন্যে উৎসাহ দিয়েছিলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। ১৮৮১ সালে এই পরিবার এ রকমের দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিতে পেরেছিলো প্রধানত একাধিক কারণে। সমাজে এ পরিবারের যে-স্থান ছিলো, তাতে তাঁরা সমাজের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন। ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকেও এঁরা ছিলেন মূলধারা হিন্দুদের থেকে খানিকটা আলাদা এবং অনেকটাই

প্রগতিশীল। সর্বোপরি, যে-মঞ্চে এই মহিলারা অভিনয় করেছিলেন, তা ছিলো তাঁদের বাড়ির মঞ্চ। সে মঞ্চ সাধারণ মানুষের জন্যে খোলা ছিলো না।

জনসাধারণের প্রবেশাধিকার না-থাকলেও, ঠাকুর পরিবার নিজেদের বাড়ির মহিলাদের মঞ্চে উঠিয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। প্রথমত, এটা পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে দৃষ্টান্ত হিশেবে কাজ করেছিলো। এই দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে সিকি শতাব্দী পরে ভদ্রলোক পরিবারের মহিলারা মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, অবতীর্ণ হবার সাহস পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, ঠাকুরবাড়ির মহিলারা যাত্রার মতো অতিনাটকীয় এবং অস্বাভাবিক অভিনয়ের বদলে স্বাভাবিক অভিনয় করেছিলেন। তাও পরবর্তীদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছিলো। থিয়েটারের অভিনেতারা (হয়তো অভিনেত্রীরাও) গোপনে ঠাকুরবাড়ির অভিনয় দেখে গিয়ে সে রকম অভিনয় করেছিলেন বলে সমসাময়িক লেখা থেকে জানা যায়। এমন কি, তাঁরা নাকি ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের মতো অঙ্গভঙ্গিও শিখেছিলেন।

নাটকের ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ির আগ্রহের একটি কারণ ছিলো এই যে, সে বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ— দুজনই অনেকগুলো নাটক লিখেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একাধিক নাটক ১৮৭০-এর দশকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিলো। এ রকমের একটি অভিনয় দেখার জন্যে মহিলাদের নিয়ে ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা বেঙ্গল থিয়েটারে গিয়েছিলেন। সেখানে বাইরের দর্শকদের সেদিন আসতে দেওয়া হয়নি। আর, রবীন্দ্রনাথ প্রথমে গীতিনাট্য দিয়ে শুরু করলেও ১৮৮০-এর দশক থেকে আরম্ভ করে পরে অনেকগুলো উৎকৃষ্ট নাটক লিখেছিলেন।

ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব মঞ্চে প্রথম অভিনয় শুরু হয় *বাল্মীকিপ্রতিভা* দিয়ে, ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তাতে রবীন্দ্রনাথ নিজে সেজেছিলেন বাল্মীকি, আর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সেজেছিলেন সরস্বতী। লক্ষ্মী সেজেছিলেন শরৎকুমারী দেবীর কন্যা সুশীলা। তারপর গোটা ১৮৮০-এর দশক ধরে আরও কয়েকবার এই গীতিনাট্যের অভিনয় হয়েছিলো। প্রতিবারেই তাতে ঠাকুর পরিবারের অথবা তাঁদের আত্মীয় পরিবারের মেয়েরা অংশ নিয়েছিলেন। ১৮৮২ সালে কালমৃগয়ার অভিনয়ে ইন্দিরা দেবীসহ আরও কয়েকটি মেয়ে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৮৮ সালে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের উদ্যোগে বেথুন কলেজে মায়ার খেলা অভিনীত হয়। এতে অংশ নিয়েছিলেন শুধু মেয়েরাই। তাঁদের মধ্যে ঠাকুর বাড়ির বাইরেরও দু-একজন ছিলেন। ১৮৯০ সালের অক্টোবরে *রাজা ও রানী*র যে-অভিনয় হয়, তাতে কেবল কমবয়সী মেয়েরা নন, জ্ঞানদা দেবী এবং মৃণালিনী দেবীও অংশ নিয়েছিলেন। মোট কথা, অন্য বহু ব্যাপারের মতো ভদ্রঘরের মেয়েদের অভিনয়ে যোগ দেওয়ার ব্যাপারেও ঠাকুরবাড়ি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলো। তখনোই ভদ্রঘরের মেয়েরা নাটক করতে এগিয়ে না-এলেও, ঠাকুরবাড়ির দৃষ্টান্ত সিকি-শতাব্দীর মধ্যে অন্য ভদ্রমহিলাদের অভিনয় করার প্রেরণা জুগিয়েছিলো।

ভদ্রঘরের মেয়েদের অভিনয়ে আনার ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ির পরে যাঁর ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়— সিনেমার জগতে সংক্ষেপে যিনি ডিজি নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গেও ঠাকুরবাড়ির সম্পর্ক ছিলো। তাঁর মেজভাই নগেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জামাতা। তা ছাড়া, ধীরেন্দ্রনাথ নিজেও ঠাকুর পরিবারের এক আত্মীয়াকে বিয়ে করেছিলেন। এঁর নাম প্রেমিকা দেবী।

নির্বাক ছবি *বিলেত ফেরতের* জন্যে ধীরেন্দ্রনাথ অ্যাডভোকেট বিধূভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সুশীলাকে নিয়ে এসেছিলেন। তা ছাড়া এনেছিলেন শ্রীরামপুরের গোঁসাই পরিবারের একটি মেয়েকে। ভদ্রপরিবারের মেয়েদের জন্যে অভিনয় করা তখনো এতো নিষিদ্ধ ছিলো যে, গোসাঁই পরিবারের এই মেয়েটি প্রমীলা ছদ্মনামে অভিনয় করতে রাজি হন। ধীরেন্দ্রনাথ এর থেকেও সাহসী যে-পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা হলো: তিনি নিজের স্ত্রী প্রেমিকা দেবীকেও সিনেমায় অভিনয় করাতে রাজি করান। ১৯২১ সালে বিয়ের পর থেকে ১৯৩০ সালে মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত প্রেমিকা দেবী বেশ কয়েটি ছবিতে অভিনয় করেন। তাঁর প্রথম ছবির নাম ছিলো *ফ্লেইমস অব ফ্লেশ*। আসল নাম প্রেমিকা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জনপ্রিয় নাম হয়েছিলো প্রেমলতিকা। প্রেমিকা দেবী মারা যাওয়ার পর ধীরেন্দ্রনাথ তাঁর দুই কন্যা পারুল এবং মণিকাকেও পর্দায় নিয়ে এসেছিলেন। মণিকার স্বামী পি গুহঠাকুরতা ছিলেন রীতিমতো গণ্যমান্য লোক। তিনিও তাঁকে অভিনয় করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথের আর-এক কৃতিত্ব তিনি কয়েকজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান তরুণীকে অভিনয় করতে রাজি করিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই বাংলা নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে নাম করেছিলেন সবিতা। বাংলায় কবিতা লিখতেন তিনি এবং বাঙালি বলে নিজের পরিচয় দিতেন।

ভদ্রঘরের তরুণীদের অভিনয়ের জগতে আনার ভূমিকা শিশিরকুমার ভাদুড়ীও পালন করেছিলেন। তিনি যাঁদের রাজি করিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন দুই বোন— কঙ্কাবতী এবং চন্দ্রাবতী। তাঁরা ছিলেন এক ব্রাহ্ম জমিদার এবং অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের কন্যা এবং জন্মেছিলেন মুজাফ্‌ফরপুরে। কঙ্কাবতী বেথুন কলেজ থেকে বিএ পাশ করেছিলেন। তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর অভিনয়ের হাতেখড়ি হয়েছিলো। ১৯২৮ সালে পঁচিশ বছর বয়সে তিনি শিশির ভাদুড়ীর আমন্ত্রণে মঞ্চে প্রবেশ করেন। পরে তাঁর সঙ্গে নিউ ইয়র্কে গিয়ে অভিনয় করেছিলেন। চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছিলেন তিনি। চন্দ্রাবতী ছিলেন কঙ্কাবতীর চেয়ে ছ বছরের ছোটো। তিনিও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং দীনেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখেছিলেন। ১৯২৯ সালে নির্বাক চলচ্চিত্রে তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। পরে তিনি বহু নাম-করা ছবিতে অভিনয় করেন। ১৯৪০-এর দশকে তিনি তিনবার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিশেবে পুরস্কার পেয়েছিলেন।

সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়ের জন্মও চন্দ্রাবতীর মতো ১৯০৯ সালে। তিনিও ছিলেন ভদ্রঘরের কন্যা এবং বধূ। সেকালে আইএ পাশ করেছিলেন। তাঁর স্বামীর সঙ্গে পরিচালক মধু বসুর পরিচয় ছিলো। সেই সূত্র ধরে এবং স্বামীর উৎসাহে তিনি অভিনয়ের জগতে প্রবেশ করেন। মধু বসু নিজের স্ত্রী সাধনা বসুকেও সিনেমায় নামিয়েছিলেন। নামিয়েছিলেন বললে কম বলা হয়। কারণ সাধনা রীতিমতো খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মর্জিনা চরিত্রে তাঁর অভিনয় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলো। নাচ এবং গান উভয় বিষয়ে তিনি নৈপুণ্য লাভ করেছিলেন। কেবল ওস্তাদদের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নয়, তিনি শচীন দেববর্মণ এবং হিমাংশু দত্তের কাছে বাংলা গানও শিখেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন কেশব সেনের পুত্র এবং পেশায় ব্যারিস্টার।

পরিচালক অথবা অভিনেতাদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে আরও কয়েকজন মহিলা অভিনয় করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। জ্যোৎস্না গুপ্ত যেমন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাতা হীরালাল সেনের ছাত্র এবং আত্মীয়। প্রতিমা দাশগুপ্তের পিতা ছিলেন পদস্থ কর্মকর্তা এবং এনজিনিয়ার। এ রকম অভিজাত ঘরের মেয়ের অভিনয় করার কথা নয়। কিন্তু তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

পারিবারিক পটভূমি এবং পরিবারের সদস্যদের উৎসাহও অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের অভিনয়ে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেবিকারানীর (জন্ম ১৯০৮) পিতা কর্নেল চৌধুরী ছিলেন মাদ্রাসের সার্জন জেনারেল। আর দেবিকা নিজে লেখাপড়া আর অভিনয় শিখেছিলেন ইংল্যান্ডে। পরিচালক হিমাংশু রায়ের আহ্বানে তিনি ভারতে ফিরে নির্বাক ছায়াছবিতে অংশ নেন। তারপরই ১৯২৯ সালে তিনি হিমাংশু রায়কে বিয়ে করেন। বিয়ের পর থেকে ১৯৪০ সালে হিমাংশু রায় মারা না-যাওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর সঙ্গে একযোগে বহু ছবিতে কাজ করেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি নিজেই চলচ্চিত্র প্রযোজনা এবং পরিচালনা করেন। তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা পরিচালক।

তরু ও অরু দত্তের বংশের মেয়ে দেবযানী দত্ত বিএ বিটি পাশ। তাঁর স্বামী ছিলেন আইসিএস কর্মকর্তা। একে নিজের খৃস্টান পটভূমি, তার ওপর স্বামীর উৎসাহে তিনি অভিনয়ে এসেছিলেন। প্রতিমা দাশগুপ্তও অভিনয় জগতে ঢুকেছিলেন অনেকটা রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়। পরে তিনি চিত্র পরিচালনাও করেছিলেন। শোভা সেনগুপ্ত জন্মেছিলেন ১৯২৩ সালে আর তৃপ্তি মিত্র ১৯২৫ সালে। দুজনই উচ্চবংশের মেয়ে। শোভা সেনগুপ্তের পিতা ছিলেন ডাক্তার। তিনি নিজে বেথুন থেকে বিএ পাশ করেছিলেন। কলেজে অভিনয় করে খানিকটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন আর স্বামীর উৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন আইপিটিএ-র সঙ্গে। তৃপ্তি মিত্রও যোগ দিয়েছিলেন আইপিটিএ-র সঙ্গে। তাঁর পিতা ছিলেন উকিল আর মা বিপ্লবী রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন।

প্রথম মুসলমান অভিনেত্রী বনানী চৌধুরীও (জন্ম ১৯২৪) স্বামীর উৎসাহে এ পথে এসেছিলেন। তাঁর জন্যে এ পথ ছিলো দ্বিগুণ কঠিন। ইসলাম ধর্মে অভিনয় নিষিদ্ধ এবং পর্দাপ্রথাও কঠোর। তখনকার দর্শকরাও মুসলমানদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন না। সে জন্যে তাঁর মূল নাম আনোয়ারা গোপন রেখে বনানী নাম নিয়ে তাঁকে অভিনয় করতে হয়েছিলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন ভদ্রঘরের অন্য মহিলারাও কেউ কেউ সত্যিকার নাম গোপন রেখে অভিনয়ে নেমেছিলেন। ভদ্রঘরের কোনো কোনো মহিলা অভাবে পড়েও অভিনয় করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যেমন, সুনন্দা দেবী (জন্ম ১৯২১), সরযূবালা দেবী (জন্ম ১৯১২) এবং মলিনা দেবী (জন্ম ১৯১৪)। প্রভা দেবী, শিশুবালা এবং রমা বসুও— দারিদ্র্যের কারণে অভিনয় করেছিলেন। ভদ্রঘরের মহিলাদের মধ্যে মলিনা দেবী অথবা আঙুরবালার মতো কেউ কেউ মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন নৃত্যশিল্পী হিশেবে— গোড়াতে তাঁরা অভিনয় করতেন না। পরে অভিনেত্রী হন। ইন্দুবালার মতো কেউ কেউ এসেছিলেন গায়িকা হিশেবে। মোট কথা, বিশ শতকের প্রথম ৩০ বছর বিশেষ বিশেষ কারণেই ভদ্রঘরের স্বল্পসংখ্যক মহিলা অভিনয়-জগতে এসেছিলেন। নয়তো তখনো বেশির ভাগ অভিনেত্রী আসতেন যাঁদের কুলশীলের পরিচয় নেই, এমনসব পরিবার থেকে।

অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু তার পরবর্তী তিন বছরের তিনি কোনো বিবরণ দেননি। হয়তো নিতান্ত গ্লানির মধ্যে কেটেছিলো বলে।

তাঁর সত্যিকারের অভিনয়-জীবন শুরু হয় ১৯৩০ সালে। ততোদিনে চলচ্চিত্র নির্বাক থেকে সবাকে পরিণত হয়েছিলো। তাঁর এ পর্বের প্রথম ছবি *জোর বরাত*। এ ছবি মুক্তি পেয়েছিলো ১৯৩১ সালে। এর পরের তিন বছর তিনি বসে থাকেননি। তবে সিনেমার-জগতে তিনি নিজের আসন পাকা করেন যে-ছায়াছবি দিয়ে তা হলো: ১৯৩৫ সালের *মানময়ী গার্লস স্কুল*। ততোদিনে তিনি ভরা যৌবনে পৌঁছেছিলেন। চলচ্চিত্রের ইতিহাসকার রবি বসু লিখেছেন যে, এ সময়ে কাননবালাকে দেখে যুবক এবং প্রৌঢ় অনেকেই হৃৎস্পন্দন বেড়ে যেতো। রূপবাণী সিনেমায় এই ছবির একটি রোম্যান্টিক দৃশ্যে কাননের অভিনয় দেখে একদিন এক উদ্ভ্রান্ত যুবক নাকি পর্দার দিকে ছুটে গিয়েছিলেন একবার কাননবালাকে একটু স্পর্শ করার জন্যে। কলকাতার রাস্তায় ধারে চট বিছিয়ে কাননের আলোকচিত্র বিক্রি হতো এ সময়ে। সৌন্দর্যে এবং ফ্যাশনে কানন এ সময়ে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। মহিলারা তাঁর ফ্যাশনের শাড়ি-ব্লাউজ পরতে আরম্ভ করেন। তাঁর ফ্যাশনের কানের দুল তৈরি করান।

তাঁকে প্রথম জীবনে সবচেয়ে খ্যাতি এনে দিয়েছিলো *মুক্তি* (১৯৩৭)। পরের বছর *বিদ্যাপতি* এবং *সাথী*ও জনপ্রিয় হয়েছিলো। ৪০-এর দশকের গোড়ায় তিনি *পরিচয়* এবং *শেষ উত্তর* ছবির জন্যে তিনি পর-পর দুবার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। বস্তুত, ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৪— এই সময়টাই নায়িকা হিশেবে তাঁর সবচেয়ে খ্যাতির পর্ব। এ সময়ে কাননবালা থেকে তিনি সম্ভ্রান্ত কানন দেবীতে পরিণত হন। তাঁর বয়সও হয় বছর তিরিশ।

অতঃপর তিনি রোম্যান্টিক নায়িকার বদলে স্ত্রী এবং মায়ের ভূমিকায় বেশি মানানসই হন। তিনি অভিনয়ে শান্ত সৌম্য সৌন্দর্য দিয়ে মায়ের যে-আদর্শ স্থাপন করেন, তা ছিলো অসাধারণ। *মুক্তি* ছবিতে তাঁর রোম্যান্টিক নায়িকার অভিনয় সাত দশক পরে এখন মনকে আন্দোলিত করবে কিনা, সন্দেহ হয়। কিন্তু তাঁর *মেজদিদি*র অভিনয় এখনো দর্শকের কাছে আদর্শ অভিনয় বলেই গণ্য হবে। কেবল *মেজদিদি* নয়, আলোচ্য কালে তিনি শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি বেশ কয়েকটি ছায়াছবিতে তিনি অভিনয় করেন। পাঠকরা যেভাবে শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মানস দৃষ্টিতে কল্পনা করে নিয়েছিলেন, কানন দেবীর মধ্যে তাঁরা সেই চরিত্রগুলোকে যেন বাস্তবে দেখতে পেলেন।

তিনি নিজেও তাঁর এই শক্তির কথা জানতেন। সে জন্যে ১৯৪৮ সালে তিনি যখন নিজেই শ্রীমতী পিকচার্স নামে চলচ্চিত্রের কম্পেনি গড়ে তোলেন, তখন বেশির ভাগ ছবিই করেছিলেন শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে। সেসব ছবিতে তিনি নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই কম্পেনিতে এসে তিনি কেবল অভিনয় এবং প্রযোজনাই করেননি, তিনি পরিচালকের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কাননের আর-একটি পরিচয় তিনি অভিনয় করতে করতে বিখ্যাত গায়িকায় পরিণত হন। বাড়ির কাছের একজন সাধারণ গায়কের কাছে হাতেখড়ি হলেও, পরে তিনি ওস্তাদ আল্লারাখার কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখেন। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, রাইচাঁদ বড়াল, নজরুল ইসলাম, অনাদি দস্তিদার, পঙ্কজ মল্লিক প্রমুখের কাছেও তিনি নানা ধরনের গান শিখেছিলেন। কেবল বহু আধুনিক গান নয়, বহু রবীন্দ্রসঙ্গীতও তিনি জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গান— আজি সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে— গেয়ে তিনি যে কেবল রবীন্দ্রনাথকেই খুশি করেছিলেন, তাই নয়, এ গানকে তিনি ভদ্রলোকের বসার ঘর থেকে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর গাওয়া আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ, যদি ভালো না লাগে তবে দিও না মন, আমি বনফুল গো, অনাদি কালের স্রোতে ভাসা ইত্যাদি গান ছিলো সেকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় গান।

কানন দেবীই সম্ভবত সমাজের নিচের তলা থেকে আসা শেষ বড়ো অভিনেত্রী। ১৯৪০-এর দশক থেকে পরিবার এবং সমাজ ভদ্রঘরের মহিলাদের অভিনয় মোটামুটি গ্রহণ করে নেয়। আমরা এর আগেই প্রেমিকা দেবী, দেবিকারাণী, সাধনা বসু, কঙ্কাবতী, তৃপ্তি মিত্র এবং শোভা সেনগুপ্তের মতো এই শ্রেণীর কয়েকজন অভিনেত্রীর নাম উল্লেখ করেছি। শিক্ষার বিকাশ, অভিনয় থেকে খ্যাতি এবং আর্থিক লাভ ইত্যাদি অনেক মহিলা এবং পরিবারকে এ দিকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করে থাকবে। কোনো কোনো সিনেমার পরিচালক যে তাঁদের আত্মীয়াদের সিনেমায় নামিয়েছিলেন, তাও ভদ্রমহিলাদের অভিনয়ের পথ সুগম করেছিলো। এমন কি, অভিনেত্রীরা যে-ঘর থেকেই আসুন না কেন, কোনো সিনেমা-পরিচালক এবং সমাজের ওপর তলার পুরুষরা যে তাঁদের বিয়ে করছিলেন, তাও অভিনেত্রীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিলো। তবে তখনো থিয়েটারে অভিনয় যতোটা গ্রহণযোগ্য ছিলো, সিনেমায় অভিনয় অতোটা নয়। সিনেমার পর্দায় যতোটা শরীর এবং নায়ক-নায়িকার ঘনিষ্ঠতা দেখানো হয়, চোখের সামনে মঞ্চে ততোটা দেখানো হয় না। এ হয়তো এর একটা কারণ। এখনো সিনেমা এবং মঞ্চে এই পার্থক্য এবং সে সম্পর্কে সমাজের মনোভাব বজায় আছে।

কানন দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে কিশোর বয়স থেকেই তাঁকে পর্দায় নগ্নতার অভিনয় করতে হয়েছে। তা ছাড়া, পর্দার বাইরেও কখনো নায়ক, কখনো পরিচালকের লোলুপতার শিকার হতে হয়েছে। কেউ হাত ধরে টানাটানি করেছেন, কেউ পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করেছেন, কেউ হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছেন ইত্যাদি। তাঁদের বাসনার যথাযথ উত্তর না-দেওয়ায় তাঁরা পরে কিভাবে তার প্রতিশোধ নিয়েছেন, সে কথাও কানন লিখেছেন। *জোরবরাত* (১৯৩১) ছবির একটি দৃশ্যে সংলাপের পর হঠাৎ নায়ক তাঁকে জড়িয়ে ধরে ইংরেজি কায়দায় ঠোঁটে চুমু খান। কাননের বয়স তখন বছর ষোলো। এতে তিনি এতো হকচকিয়ে যান যে,

ধাক্কা দিয়ে নায়ককে সরিয়ে দেন। পরে এ জন্যে পরিচালক আর এ দৃশ্য দেখাতে পারেননি। কানন দেবী, বলা বাহুল্য, দারুণ ব্যথিত এবং অপমানিত হয়েছিলেন। পরিচালক তাঁকে জানান যে, নায়ক যা করেছিলেন, তা তাঁরই নির্দেশে করেছিলেন। কিন্তু কাননকে আগে থেকে কিছুই জানানো হয়নি। অভিভাবকহীন নিচুঘরের মেয়ে হওয়ায় টাকাপয়সার লোভ দেখিয়ে অথবা অভাবের সুযোগ নিয়েও নগ্নতা প্রদর্শনের জন্যে বাধ্য করা হয়েছে। এ রকমের একটি ছবি ছিলো *বাসবদত্তা*। তিনি এ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। হয়তো সে জন্যেই নগ্নতা সত্ত্বেও এ ছবি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। তাঁর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রযোজকরা কিভাবে তাঁকে টাকাপয়সার ব্যাপারে ঠকিয়েছেন, তাঁর আত্মজীবনীতে সে সম্পর্কেও বর্ণনা আছে।

১৯৫০-এর দশকে সমাজের নিষেধ এতোটাই দুর্বল হয়ে এসেছিলো যে, অভিজাত ঘরের বাইশ-তেইশ বছরের একজন স্ত্রী এবং সন্তানের জননী— সুচিত্রা সেনও সিনেমার অভিনয় করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর শ্বশুর আদিনাথ সেন এবং স্বামী দিবানাথ তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। স্বামীর কাছ থেকে সুচিত্রা কেবল অনুমতি আদায় করেননি, তিনি স্বামীকে সঙ্গে নিয়েই ছবির জগৎ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। স্বামীকে তিনি বর্ম হিশেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। অসম্ভব নয় যে, তাঁর স্বামী এবং শ্বশুর মনে করেছিলেন যে, কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেই সুচিত্রার শখ মিটে যাবে এবং ঘরের বৌ ঘরে ফিরে আসবেন। কিন্তু অভিনয়ের জগতে এসে সুচিত্রা খুঁজে পেয়েছিলেন নিজের প্রতিভার যথার্থ জায়গা। তাঁর অভিনয়ের যদি বা সীমাবদ্ধতা থাকেও, যা অসীম পরিমাণে পেয়েছিলেন তিনি, তা হলো খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা। থিয়েটারে তাঁর চেয়ে যোগ্য অভিনেত্রী তাঁর আগে এবং পরে আরও এসেছিলেন, কিন্তু বাংলা সিনেমার জগতে তাঁর চেয়ে কোনো অভিনেত্রীই বেশি খ্যাতি লাভ করেননি। তিনি ৫৩টি বাংলা এবং অন্য ভাষায় ৭টি ছবি করেছিলেন। এর বেশির ভাগই দর্শকদের মন কেড়েছিলো।

রোম্যান্টিক নায়িকার অভিনয়ের নতুন আদর্শ স্থাপন করেছিলেন সুচিত্রা। তাঁর অসামান্য সৌন্দর্য, কথা বলার ভঙ্গি, স্মার্ট পোশাক, প্রেমবিহ্বল মুগ্ধ দৃষ্টি, নায়কের সঙ্গে সংকোচহীন ঘনিষ্ঠতা তরুণ-তরুণীদের মনে প্রেমিক-প্রেমিকার আদর্শ তুলে ধরেছিলো। মধ্যবিত্ত পরিবারে নিজেদের জীবনে যা ছিলো না, কিন্তু মনে মনে যে-জীবন তাঁরা কল্পনা করতেন, তারই প্রতিফলন তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন সুচিত্রা-উত্তমের অভিনয়ে। এমন কি, সুচিত্রা যখন বসন্ত চৌধুরী, অশোককুমার অথবা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিনয় করেছেন, তখন তাও খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। রোম্যান্টিক ভূমিকার সঙ্গে তাঁর নাম এমন সমার্থক হয়ে গিয়েছিলো যে, যখন তিনি চল্লিশের কোঠার শেষ দিকে পৌঁছলেন, যখন আর তাঁর পক্ষে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করা সম্ভব ছিলো না, তখন তিনি পর্দা থেকে একেবারে পুরোপুরি সরে

গেলেন, কানন দেবী অথবা অন্য সবার মতো মায়ের ভূমিকায় অথবা পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করতে রাজি হলেন না। আমার ধারণা, এ থেকে একদিকে তাঁর অত্যুজ্জ্বল পেশাদারী মনোভাব এবং সেই সঙ্গে আত্মমর্যাদা প্রকাশ পায়। তিনি সিকি শতাব্দী ধরে নিজের যে-ভাবমূর্তি দর্শকদের মনে তৈরি করেছিলেন, কোনো কিছুর বিনিময়ে তা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুযোগ পেলে বিনোদিনী কী করতেন, বলা শক্ত। কিন্তু কার্যকারণে তিনিও আজীবন নায়িকাই থেকে গিয়েছিলেন।

বস্তুত, সুচিত্রার জনপ্রিয়তা কেবল তাঁকে বড়ো করেনি, বাংলা সিনেমারও অসাধারণ উপকার করেছিলো। বিশেষ করে তিনি উত্তমকুমারের সঙ্গে যে-তিরিশটি ছবি করেছিলেন, তা দর্শকদের হিন্দী ছবির দিক থেকে বাংলা ছবির দিকে নিয়ে এসেছিলো। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় সুচিত্রা-উত্তমের জুটি বাংলা সিনেমার সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটি। শুধু সিনেমাকে নয়, এই জুটি তাঁদের অভিনয় দিয়ে বাংলা গানকেও শ্রোতাদের অন্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বহু গান রেকর্ডে শ্রোতাদের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতো কিনা সন্দেহ আছে, কিন্তু সিনেমার পর্দায় সুচিত্রা এবং উত্তম ঐ গান গাওয়ার অভিনয় করে সেসব গানকে অসাধারণ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

পেশাদারী ও ব্যক্তিগত জীবনে কানন এবং সুচিত্রার সফলতা-নিষ্ফলতা থেকে আরও একবার নারী এবং অভিনয় সম্পর্কে বাঙালি সমাজের দ্বৈতমানদণ্ডের প্রমাণ পাওয়া যায়। কানন দেবী এবং সুচিত্রা দুজনেই খুব সুন্দরী ছিলেন। যতো নিচুঘরের কন্যা হন না কেন, অভিনেত্রী কাননকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন অনেকেই। যে-হেরম্ব মৈত্র থিয়েটারের পথ কোনদিকে পথচারীকে তা বলে দেননি, সেই হেরম্ব মৈত্রের পুত্র ব্যারিস্টার অশোক মৈত্র আভিজাত্যের পঙক্তি এবং জাত ভেঙে তাঁকে বিয়ে করেন। তবে যে-পারিবারিক পিউরিটান মূল্যবোধের মধ্যে অশোক বড়ো হয়েছিলেন, হয়তো সে কারণেই কাননের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি। কানন তাঁকে কতোটা ভালোবেসেছিলেন জানিনে, কিন্তু ১৯৪৮ সালে তিনি রাজ্যপালের একজন উচ্চকর্মকর্তার প্রেমে পড়েন। এই প্রণয়ের গভীরতা অনুভব করা যায় তাঁর আত্মজীবনী থেকে। এই কর্মকর্তা— হরিদাস ভট্টাচার্য ছিলেন অশোক মৈত্রের মতোই ব্রাহ্মণ। তাঁর সঙ্গে কাননের বিয়ে হয় এবং বাকি জীবন তাঁরা যদ্দুর মনে হয় সুখেই বাস করেন। হরিদাস অল্পদিনের মধ্যে কাননের মতোই প্রবেশ করেন চলচ্চিত্র জগতে, তবে অভিনেতা হিশেবে নয়, পরিচালক এবং প্রযোজক হিশেবে।

সুচিত্রার বিয়েও সুখের অথবা খুব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। তিনি যখন সিনেমা-জগতে প্রবেশ করেন, তখনও তিনি তা করেছিলেন ছদ্মনামে। তাঁর আসল নাম ছিলো রমা। অসম্ভব নয় যে, এই নামের আড়ালে তিনি এবং তাঁর পরিবার তাঁর সত্যিকার পরিচয় খানিকটা ঢেকে রাখতে চেয়েছিলেন। তারপর একের পর এক রোম্যান্টিক নায়িকার চরিত্রে সুচিত্রার প্রাণবন্ত এবং অন্তরঙ্গ অভিনয়কে তাঁর স্বামী এবং স্বামীর

পরিবারের অন্য সদস্যরা সম্ভবত বাস্তব বলেই গণ্য করেছিলেন। ফলে বিয়ের পনেরো-ষোলো বছর পরে— ১৯৬৩ সালে— তাঁদের বিয়ে ভেঙে যায়। কানন বিয়ে ভেঙে যাবার পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন; সুচিত্রা তা করেননি। মাত্র ৩৪-৩৫ বছর বয়স থেকে এই অসাধারণ সুন্দরী এবং গুণী মহিলা বস্তুত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। আর তাঁর স্বামী ক্ষোভে, দুঃখে, পরনিন্দার ভয়ে দেশ থেকে চলে যান অনেক দূরে— অ্যামেরিকায়। সেখানেই তিনি মারা যান ১৯৬৯ সালে। সুচিত্রা নিজেও ১৯৭৮ সালে চলচ্চিত্র থেকে অবসর নেন। এবং নিজেকে একেবারে গুটিয়ে বন্দী করেন চার দেওয়ালের মধ্যে। সুকুমারী থেকে আরম্ভ করে অন্যসব অভিনেত্রীর মতোই গুরুর কাছে দীক্ষা নেন তিনি এবং ধর্মকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। অভিনেত্রী জীবনে অন্য পুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং রূপ ও দেহকে দেখিয়ে দর্শকচিত্তকে আকৃষ্ট করা যে পাপের— এ কথা রক্ষণশীল সমাজের মতো তাঁরা নিজেরাও বিশ্বাস করেছেন। সে জন্যেই সম্ভবত সুকুমারী থেকে সুচিত্রা পর্যন্ত সবাই পাপবোধ থেকেই শেষ জীবনে ধর্মকর্মে মন দিয়েছিলেন। আর সমাজের সমালোচনা এড়ানোর জন্যেই বোধহয় অনেক অভিনেত্রী সত্যিকারের নাম গোপন করে মঞ্চে নেমেছিলেন নকল নামের আড়ালে—সুকুমারী থেকে সুচিত্রা পর্যন্ত।

তবে বাংলা অভিনয়ের এই এক শো বছরের ইতিহাসে কতোগুলো ইতিবাচক দিকও ছিলো। প্রথমে অভিনেত্রীদের আগমনে রুচিবান ভদ্রলোকেরা থিয়েটার দেখাই বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু এ মনোভাব স্থায়ী হয়নি। ধীরে ধীরে তাঁরা মঞ্চে যেতে আরম্ভ করেছেন। এমন কি, শেষে নিজেদের কন্যা এবং স্ত্রীদের মঞ্চে উঠতে দিয়েছেন, রূপালি পর্দায় হাজির হতে উৎসাহিত করেছেন। কেউ বা অভিনেত্রীদের ঘরের বৌ করে এনেছেন। নারীদের প্রতি পুরুষপ্রধান বাঙালি সমাজে যেটুকু শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়েছে, তার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। শিক্ষাবিস্তার তার মধ্যে সবার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাবিস্তার থেকে অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। কিন্তু সেই সঙ্গে খানিকটা কৃতিত্ব এই অভিনেত্রীদেরও প্রাপ্য। তাঁরা নিজেরা সমাজের কাছে গৃহীত হয়েছেন। এবং সামগ্রিকভাবে নারীদের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন।

অভিনেত্রীদের দেখে দর্শকরা এখন আর ঘৃণা করেন না, বরং তাঁদের দেখতে ভিড় জমান। তাঁদের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলেও নিজেদের ধন্য মনে করেন। তাঁদের বিয়ে করতে পারলে অনেক ভদ্রলোক এখন ধন্য মনে করবেন। আর, যে-বীরপুরুষরা তাঁদের বিয়ে করতে সংকোচ বোধ করবেন, তাঁরা তাঁদের ফাও উপভোগ করার সুযোগ পেলে বর্তে যাবেন।

অভিনেত্রী হওয়ার সুযোগ পেলে এখন অনেক ভদ্রমহিলাই জীবনকে সফল মনে করবেন। সবচেয়ে বেশি যা লক্ষণীয়, তা হলো: অভিনেত্রীরা নিজেরাও এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হয়েছেন। তাঁরা বিনোদিনীর মতো বিনয় প্রকাশ করবেন না। বস্তুত, একটা সামাজিক এবং জাতীয় সমস্যা নিয়ে তাঁরা

যে শাবানা আজমী অথবা অপর্ণা সেনের মতো একটা বলিষ্ঠ প্রতিবাদী অবস্থান নিতে পারছেন, তা একদিনে সম্ভব হয়নি। তার পেছনে রয়েছে শতবর্ষের অর্জনের ইতিহাস।

সত্যি বলতে কি, বাংলা থিয়েটার ও সিনেমার ইতিহাসে পরিচালক এবং প্রযোজকরা চলচ্চিত্র নির্মাণ করে যেমন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন, তেমনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন বহু অভিনেত্রী। তাঁরা কেবল বাংলা থিয়েটার এবং চলচ্চিত্রকে এগিয়ে দেননি এবং তাকে জনপ্রিয় করেননি, বরং বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন, চলাফেরা, পোশাক ইত্যাদিতেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এ রকম প্রভাবশালী অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন। বিশেষ করে যাঁদের নাম মনে পড়ে, তাঁরা হলেন বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী, নরীসুন্দরী, কানন দেবী এবং সুচিত্রা। তাঁরা যে-গান মঞ্চে এবং পর্দায় গেয়েছেন, সে গান জনপ্রিয় হয়েছে। যে-ভঙ্গিতে শাড়ি পরেছেন, সেই ভঙ্গি ভদ্রমহিলারা অনুকরণ করেছেন। তাঁদের ভঙ্গিতে কথা বলা রপ্ত করেছেন। খোঁপা বেঁধেছেন। এমন কি, সুচিত্রার মতো চুলও ছেঁটেছেন অনেকে। বাঙালি মহিলাদের রুচি গঠনে এবং আত্মমর্যাদা অর্জনে এই অভিনেত্রীদের ভূমিকা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(*অন্যদিন*, নববর্ষ সংখ্যা, ১৪১৩)

৬

নারীবাদের সহি সবক

পঁচিশ বছর আগেও নারীবাদ শব্দটা বাংলা ভাষায় ছিলো না। মোটামুটি তখনই বাঙালি নারীদের নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলাম, কিন্তু তাতে এ শব্দটা ব্যবহার করিনি আমি। তখনো নারীদের উন্নতি বোঝানোর জন্যে যে-পরিভাষা চালু ছিলো, তা হলো: নারীস্বাধীনতা অথবা নারীমুক্তি। 'নারীপ্রগতি' এবং 'নারীদের আধুনিকতা' কথা দুটোও আমি ব্যবহার করেছিলাম। আমার ধারণা ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিক থেকে দু-একজন করে নারীবাদ শব্দটা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। সাম্যবাদ, সমাজবাদ, পুঁজিবাদ, বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদ, ফ্যাশিবাদ ইত্যাদির অনুকরণে ফেমিনিজমের অনুবাদ করা হয় নারীবাদ। ইংরেজিতে শব্দটা আসে ল্যাটিন ফ্যামিনা শব্দ থেকে, তার সঙ্গে ইজ্‌ম্‌ লাগিয়ে। সে যাই হোক, নারীবাদ ঠিক কী বস্তু সেটা আমাদের সবার কাছে দশ-পনেরো বছর আগেও পরিষ্কার ছিলো না, এখনো সম্ভবত নেই। এমন কি, যাঁরা এ বিষয়ে লেখেন, তাঁদের সবার ধারণাও যে খুব পরিষ্কার, তা মনে হয় না। বস্তুত, অনেকে এ শব্দটা ব্যবহার করেন ঢালাওভাবে— নারীমুক্তি অথবা নারীস্বাধীনতা— এই অর্থে।

ইংরেজিতে ১৮৩৭ সালে যখন এই শব্দটা প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত হয়, তখনো ঢালাওভাবেই ব্যবহৃত হয়েছিলো। নারীবাদ বললে তখন বোঝাতো নারীদের অধিকার আদায়ের অথবা তাঁদের উন্নতির আন্দোলন। কিন্তু এখন ফেমিনিজম কথাটার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। নারীবাদেরও থাকা উচিত।

যাঁরা গরিবদের প্রতি দয়া করার কথা বলেন অথবা দাবি জানান গরিবদের অবস্থা উন্নত করার, তাঁরা সবাই সমাজতন্ত্রী অথবা কমিউনিস্ট নন। কমিউনিজম এবং সমাজতন্ত্রের সঙ্গে একটা মতবাদ অথবা রাজনৈতিক ধারণার যোগ আছে। মানবিকতার কথা বললেই সমাজতান্ত্রিক অথবা কমিউনিস্ট হওয়া যায় না; বরং সমাজতান্ত্রিক অথবা কমিউনিস্ট তাঁদেরই বলা যায়, নিজেদের যাঁরা শোষিত একটি গোষ্ঠীর— প্রোলেটারিয়েট গোষ্ঠীর— সদস্য বলে চিহ্নিত করেন এবং পুঁজিবাদী শোষণ দূর করার উদ্দেশে একটা বিশেষ সমাধানে বিশ্বাস করেন। ফেমিনিজম অথবা নারীবাদও তেমনি। সত্যিকার অর্থে ফেমিনিস্ট সেই নারীরা, যাঁরা নিজেদের গণ্য করেন পুরুষদের হাতে নির্যাতিত নারীসমাজের একজন সদস্য হিশেবে। নারীদের অবস্থা উন্নত করার কথা বললেই তাই নারীবাদী বলা যায় না— বড়ো জোর তাঁদের বলা যায় নারী-দরদী। নারীবাদীকে তাঁর অধিকার এবং তা আদায় করার পন্থা সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

এক

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, পুরুষরা প্রধানত মাংসপেশী আর উপার্জনের ক্ষমতা দিয়ে প্রাচীন কাল থেকে নারীদের বন্দী করে রেখেছেন। বন্দী করে রেখেছেন চার দেয়াল এবং পর্দার বেড়া তৈরি করে । তারপর সেই বন্দী নারীদেরই যথেচ্ছা শাসন ও শোষণ করেছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের এই বন্দীত্ব এবং নিচু অবস্থানকেই স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে। ঐতিহ্যিক সমাজে এখনো নারীদের তুলনায় পুরুষরা উচ্চতর আসন অধিকার করে আছেন। এখনো পুরুষরা প্রায় সবাই বিশ্বাস করেন যে, নারীরা তাঁদের চেয়ে ছোটো— শারীরিক শক্তিতে তো বটেই, এমন কি, মননশক্তি, সাধারণ বুদ্ধি, ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতায়ও। যা আশ্চর্যের বিষয় তা হলো: মেয়েরা নিজেরাও একে স্বাভাবিক, এমন কি, ন্যায্য বলে মেনে নিয়েছেন। যুগ যুগ ধরে নারীরাও বিনা তর্কে এই মূল্যবোধে বিশ্বাস করে এসেছেন এবং তাঁদের কন্যাদেরও তাদের শৈশব থেকে এটা মেনে নেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এভাবেই নারীপুরুষের ভেদ বজায় ছিলো এবং এখনো অনেকটাই আছে। ফলে লিঙ্গবৈষম্যকেই স্বাভাবিক বলে বিবেচনা করা হয়। এতে আরও মনে করা হয় যে, পুরুষরা নারীদের থেকে প্রাকৃতিকভাবেই শ্রেষ্ঠ এবং নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভূমিকাই পালন করার কথা।

কেবল শারীরিক শক্তি এবং উপার্জনের ক্ষমতা দিয়েই নয়, নারীবাদীদের মতে, ধর্মের দোহাই দিয়েও পুরুষরা নারীদের নিম্নাবস্থানকে স্থায়ী করে রাখার চেষ্টা করেছেন। ধর্মের বিধানসমূহ বিশ্লেষণ করলে এই দাবির মধ্যে সত্যতা নেই— তা বলা যায় না। মনু যেভাবে নারীদের নিচু চোখে দেখেছেন এবং নারীদের সম্পর্কে যে-বিধান দিয়েছেন, বর্তমান কালের ম্যাসক্যুলিস্ট অর্থাৎ পুরুষবাদীরাও তা মেনে নিতে লজ্জা পাবেন। মনুর মতে, নারীদের অন্তঃকরণ নির্মল নয়; বেদস্মৃতিতে তাঁদের অধিকার নেই; তাঁরা ধর্মজ্ঞানবর্জিত; মিথ্যা পদার্থ; পুরুষ পেলেই তাঁরা সম্ভোগে মিলিত হতে চান; তাঁদের চিত্তের স্থিরতা নেই; পুরুষ দেখলেই তাঁদের মনে কামভাব জেগে ওঠে; শয্যা, আসন, ভূষণ, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা এবং পরহিংসা তাঁদের সহজাত প্রবৃত্তি। নারীরা নরকের দ্বার এবং নরকের কীট।

খৃস্টধর্ম অনুসারেও নারীরা বহু পাপের উৎস। তাঁরা পুরুষদের তুলনায় নিকৃষ্ট। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে সন্তান জন্মদান, বাড়ি এবং স্বামীর। সে জন্যে ধর্মের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগ নেই। এখনো খৃস্টধর্মের কোনো কোনো শাখা মহিলাদের ধর্ম প্রচারের ভূমিকা দিতে রাজি নয়। ইসলামেও নারীরা পুরুষদের তুলনায় নিকৃষ্ট। পুরুষের তুলনায় তাঁদের মননশক্তিও কম। দুজন নারীর সাক্ষ্য তাই একজন পুরুষের সমান। এমন কথা চালু আছে যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক স্বর্গ পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখেছিলেন যে, নরকে যারা শাস্তি পাচ্ছে, তারা বেশির ভাগই নারী। নারীরা ধর্ম প্রচার করবে— এটাও ইসলামে প্রত্যাশিত নয়। মোট কথা, সব ধর্মেই নারীদের

অনেক হেয় করে দেখা হয়েছে। অন্তত নারীরা যে পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট— ধর্মে ধর্মে মারামারি থাকলেও এই ব্যাপারে সব ধর্মই একমত।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, ধর্মপ্রচারকরা সবাই ছিলেন পুরুষ, সে জন্যে তাঁরা নারীদের হীনাবস্থাকেই ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে স্থায়িত্ব এবং দৈব মর্যাদা দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ নারীদের চিরকাল বশে রাখার জন্যেই পুরুষরা এসব ধর্মীয় অনুশাসন তৈরি করে নিয়েছেন। তাঁর মতে, ধর্মপ্রচারকরা নারী হলে এসব বিধান হয়তো অন্যভাবে লেখা হতো।

মোট কথা, শারীরিক শক্তি, উপার্জন ক্ষমতা এবং ধর্মীয় বিধান— যে-প্রক্রিয়া দিয়েই হোক না কেন, পুরুষরা নারীদের চিরদিন নিজেদের তুলনায় ছোটো করে রেখেছেন এবং হেয় করে দেখেছেন। নারীরাও বিরোধিতা না-করে মুখ বুজে সেই নির্যাতন এবং শোষণকে মেনে নিয়েছেন। এই মূল্যবোধ অস্বীকার করে পুরুষের মতো অধিকার লাভ করার আন্দোলন শুরু করা তাঁদের পক্ষে আদৌ সহজ ছিলো না। কারণ পুরুষরা খুশি মনে অথবা বিনা বাধায় তাঁদের উচ্চাসন এবং বর্ধিত অধিকার ছেড়ে দেবেন, এটা স্বাভাবিক নয়। সে অধিকার নারীদের সংগ্রাম করেই আদায় করতে হয়েছে। এ আন্দোলন বেশি দিন আগে শুরুও হয়নি।

গোড়াতে এ আন্দোলন ছিলো মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তা-ও পুরুষরা সহজে দিতে চাননি। কারণ, প্রথমত তাঁরা বিশ্বাসই করতেন না যে, লেখাপড়া শেখার মতো মননশক্তি মেয়েদের আছে। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন যে, নারীরা লেখাপড়া শিখতে পারেন, তখন তাঁরা আশঙ্কা করলেন যে, শিক্ষার সুযোগ দিলে মেয়েরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন। এই বঙ্গদেশে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজ বিশ্বাস করতো যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে নির্ঘাৎ বিধবা হবেন। এমন কি, মহিলারাও এটা বিশ্বাস করতেন। তা ছাড়া, সমাজ মনে করতো যে, শিক্ষা দিলে মহিলারা হবেন স্বামী এবং অন্য গুরুজনদের অবাধ্য। ঘরের কাজেও তাঁদের মন থাকবে না। সে জন্যে গোটা উনিশ শতক ধরে স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী শক্তি প্রবলভাবে কাজ করেছে। কেশব সেনের মতো প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারকও বলেছিলেন যে, বিদ্যালয়ে যেসব বিষয় পড়ানো হয়, তার সবগুলো মেয়েদের উপযোগী নয়। যেমন অঙ্ক এবং বিজ্ঞান শেখালে মেয়েদের কমনীয়তা নষ্ট হতে পারে। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে মুসলিম সমাজে বিরোধিতা ছিলো আরও বেশি। সে জন্যে বিশ শতকের প্রথম তিন দশক ধরে চেষ্টা করেও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বেশি মুসলমান মেয়েকে তাঁর স্কুলে আনতে পারেননি।

মেয়েদের শিক্ষার প্রতি এই যে বিরোধিতা, তা কেবল ভারতবর্ষ অথবা অনুন্নত সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। ইংল্যান্ডের মতো উন্নত দেশেও স্ত্রীশিক্ষা— বিশেষ করে নারীদের উচ্চশিক্ষা— সহজে প্রচলন করা যায়নি। এর বিরুদ্ধে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে নারীবাদীদের রীতিমতো লড়াই করতে হয়েছে। অক্সফোর্ড-কেমব্রিজও ১৯২০-

এর দশকের আগে পর্যন্ত মেয়েদের পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার অধিকার স্বীকার করে নেয়নি। সম্পত্তিতে মেয়েদের কোনো অধিকার ১৮৮৫ সালের আগে পর্যন্ত সে দেশে ছিলো না। ১৯২৮ সালের আগে পর্যন্ত ভোট দেওয়ার অধিকারও ছিলো না তাঁদের। শিক্ষা, সম্পত্তি এবং ভোটের অধিকার আদায় করার জন্যে উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে আরম্ভ করে বিশ শতকের প্রথম সিকি ভাগ পর্যন্ত নারীবাদীদের নানা ধরনের আন্দোলন করতে হয়েছে— আন্দোলন করতে হয়েছে সেই পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে যাঁরা ঐ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও মনে করতেন, মেয়েদের মননশক্তি নেই অথবা থাকলেও আছে পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। এই আন্দোলন করতে গিয়ে বিশ শতকেও নারীকর্মীদের কারাবাস করতে হয়েছে। শতাব্দীর শেষে এসেও তসলিমা নাসরিনের মতো নারীকর্মীকে নির্বাসনে যেতে হয়েছে।

শিক্ষা এবং ভোটাধিকার আদায় করার জন্যে যাঁরা আন্দোলন করেছিলেন, তাঁদের বলা যেতে পারে প্রথম যুগের নারীবাদী। কিন্তু আজকের নারীবাদীদের চোখে তাঁরা নারী-জাগরণের পথিকৃৎ ছিলেন, যথার্থভাবে নারীবাদী ছিলেন না। অত্যাধুনিক নারীবাদীরা এ ধরনের ন্যূনতম অধিকার ছাড়া সমাজ এবং সংসারে নারীদের অবস্থান সম্পর্কেই অনেক মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

সত্যি বলতে কি, আজও অনেক দেশে শিক্ষাদীক্ষায় মেয়েদের ন্যায্য অধিকার নেই। অথবা থাকলেও পুরুষ সমাজ এবং পুরুষ-শাসনে অন্ধ কিছু নারী সেই অধিকার দিতে চান না। বরং সেই অধিকার হরণ করতে চান। যেমন, কিছু কাল আগে আফগানিস্তানে মধ্যযুগীয় ধারণা নিয়ে যখন তালেবানরা ক্ষমতায় এসেছিলো, তখন তারা মেয়েদের শিক্ষার অধিকার তো হরণ করেই ছিলো, এমন কি, যে-নারীরা শিক্ষিত ছিলেন, তাঁদেরও পর্দার আড়ালে ঠেলে দিয়ে তাঁদের শিক্ষাকে অস্বীকার করেছিলো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, মহিলা ডাক্তারদের চিকিৎসা করার অধিকার পর্যন্ত তারা কেড়ে নিয়েছিলো। ইরানে আয়াতউল্লাহ খোমেনি এসেও মহিলাদের অন্তত এক প্রজন্ম পিছিয়ে দিয়েছেন। যে-ইরানী নারীরা রীতিমতো উচ্চশিক্ষা লাভ করে আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন, ইসলামী বিপ্লব-পরবর্তী নারীরা তার অনেকটাই বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন— পোশাকে, চলাফেরায় এবং পরিবারের বাইরে সামাজিক ভূমিকা পালন করায়। আজও সৌদী আরবের মতো কতোগুলো মুসলিম দেশে মেয়েদের ভোটাধিকার নেই। সৌদী আরবে মেয়েদের গাড়ি চালানো পর্যন্ত নিষেধ। এ ধরনের বৈষম্য দূর করার ধারণা থেকেই নারীবাদী চিন্তার জন্ম হয়েছিলো।

এমন কি, নারীদের বাঁচার অধিকার নিয়েও কোনো কোনো সমাজে নারীকর্মীদের আন্দোলন করতে হয়। কারণ, পৃথিবীর বহু সমাজে এখনো পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের চেয়ে বেশি বাঞ্ছিত বলে মনে করা হয়। আফ্রিকা এবং এশিয়ার বহু দেশ সম্পর্কেই এ কথা সত্য। এমন কি, ভারত অথবা চীনের মতো বেশ উন্নত দেশেও পুত্র এবং কন্যার মধ্যে এই ভেদ বজায় রয়েছে। ভারতের বহু জায়গায় কন্যা সন্তান মেরে ফেলার কথা প্রায়ই শোনা যায়। ভারতে নতুন যা ঘটছে, তা হলো: স্ক্যান করে

যদি জানা যায় যে, গর্ভস্থ সন্তানটি কন্যা— তা হলে সেই মায়েরা গর্ভপাত করাচ্ছেন। আর, চীনে একটি মাত্র সন্তান রাখার আইন গৃহীত হওয়ার পর থেকে সেখানে ব্যাপক হারে কন্যা সন্তান হত্যার খবর অনেক বারই প্রকাশিত হয়েছে। বহু বছর ধরে এই রীতি চলার ফলে চীনের বহু জায়গায় এখন নারী-পুরুষের অনুপাতে সমতা নেই। অনেক জায়গায় তাই বিয়ের জন্যে পাত্রী জোটানো একটা সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

দুই
নারীবাদের সূচনা

ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ ছিলো সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের। এর সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে নারীরা ১৭৮০-র দশকের শেষ দিকে সমানাধিকার দাবি করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লব থিতিয়ে এলে অল্পকালের মধ্যে এ দাবি তার তেজ হারিয়ে ফেলে। ফলে নেপোলিয়নের সময়ে যে-আইন প্রণীত হয়, তাতে এই অধিকার অগ্রাহ্য করা হয়। তার কয়েক দশক আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান যখন গৃহীত হয়, তখনো এই দাবি তোলা হয়েছিলো। কিন্তু এ ব্যাপারে উদারপন্থী নেতারাও যথেষ্ট উদার হতে পারেননি।

সত্যিকারের নারীবাদী কণ্ঠ প্রথমে শোনা যায় মেরি ওলস্টোনক্রাফটের গ্রন্থে। নারীদের অধিকার সম্পর্কে তাঁর সেই বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো ১৭৯২ সালে। এ গ্রন্থ নারীপুরুষ সবাইকেই ভাবিয়ে ছিলো তখন। কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে কোনো নারীবাদী আন্দোলন সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়নি, কারণ তার পরিবেশ তখনো তৈরি হয়নি। সেই আন্দোলনের সূচনা লক্ষ্য করি ১৮৪৮ সালে। তখন বেশ কিছু মার্কিন নারীকর্মী একটি সম্মেলনে নারীদের জন্যে অধিকতর সুযোগসুবিধার দাবি জানান নিউ ইয়র্ক শহরে। এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এলিজাবেথ স্ট্যানটন এবং লুক্রেশিয়া মট। তাঁরা যে-ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাকে তাঁরা নারী স্বাধীনতার ঘোষণা বলেন। তাতে শিক্ষা ও ভোটের অধিকারসহ আইন, বাণিজ্যিক ও উপার্জনের সুযোগসুবিধা, বেতন ইত্যাদিতে নারীদের সমানাধিকার দাবি জানান তাঁরা। বলা যেতে পারে নারীবাদের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় সেই সভায়। তারপর ইউরোপ হয়ে এখন সারা বিশ্বেই এই সচেতনতা কমবেশি ছড়িয়ে পড়েছে— যদিও তার মাত্রা এক-এক সমাজে এক-এক রকম। শিক্ষাদীক্ষায় যে-সমাজ যতো অগ্রসর এবং উন্নত, সে সমাজে নারীদের অধিকার ও সম্মান ততো বেশি স্বীকৃত হয়েছে। অনুন্নত সমাজে নারীরা এখনো পুরুষদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছেন। জাতিসঙ্ঘ ১৯৫২ সালে নারীদের সমানাধিকারের দাবি স্বীকার করে নেয় নিউ ইয়র্কের ঘোষণায়। নিঃশর্তভাবে এতে নারী এবং পুরুষদের অধিকার সমান বলে স্বীকৃত হয়েছে। তা ছাড়া, বেইজিং সম্মেলনে নারীদের ক্ষমতায়নের ঘোষণাও দেওয়া হয় এক দশক আগে। তা সত্ত্বেও আজও বিশ্বের বহু দেশে নারীদের ন্যায্য এবং মৌলিক অধিকার গৃহীত হয়নি।

তিন

নারীবাদের বিভিন্ন শাখা

ধর্ম এবং কউিনিজমের যেমন অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা আছে, নারীবাদেরও তেমনি অনেকগুলো ধারা আছে। এক দল যাঁদের নারীবাদী বলে মনে করেন, অনেকে আবার তাঁদের আদৌ নারীবাদী বলে স্বীকারই করেন না। যেমন, তত্ত্বগতভাবে পুরুষদের পক্ষে নারীবাদী হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, একজন পুরুষ নিজেকে নির্যাতিত নারীসমাজের সদস্য হিশেবে চিহ্নিত করতে পারেন না। তিনি বড়ো জোর হতে পারেন নারী-দরদী। এই নারী-দরদী পুরুষরা নারীদের সমানাধিকারের কথা বললেও নির্যাতিত নারীসমাজের হয়ে পুরুষদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেননি। সুতরাং সত্যিকারের নারীবাদীরা এঁদের নারীবাদী বলে মেনে নিতে নারাজ। কিন্তু নারী-জাগরণের ইতিহাস-লেখকদের অনেকে এই নারী-মুক্তির সমর্থক পুরুষদেরও নারীবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বঙ্গদেশে প্রথম যিনি নারী-জাগরণের কথা লিখিতভাবে প্রকাশ করেন, তিনি রামমোহন রায়। সেদিক দিয়ে তিনি বঙ্গদেশের প্রথম নারীবাদী। তাঁর পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ যে-সমাজসংস্কারকরা নারীদের শিক্ষা এবং মর্যাদা দানের জন্যে আন্দোলন করেন, তাঁরাও সবাই সীমিত অর্থে নারীবাদী। কিন্তু আগেই বলেছি, বর্তমানে নারীবাদের যে-সংজ্ঞা প্রচলিত আছে, তাতে নারীবাদী বলে এঁরা বিবেচিত হতে পারেন না। শুধু এ জন্যে নয় যে, এঁরা পুরুষ; বরং এটাই বড়ো কারণ যে, এঁরা সবাই নারীদের সমানাধিকারের দাবিও করেননি। কেউ কেউ কেবল শিক্ষা দান করে এবং পর্দা থেকে অংশত মুক্ত করে নারীদের অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নত করার দাবি জানিয়েছিলেন। এমন কি, কেউ কেউ নারীদের উচ্চশিক্ষার বদলে সীমিত শিক্ষা দানের পক্ষপাতী ছিলেন।

যে-নারীদের সত্যিকারভাবে নারীবাদী বলে স্বীকার করা হয়, তাঁদের আমরা তিন ভাগে ভাগ করে দেখতে চাই— নরমপন্থী, মধ্যপন্থী আর চরমপন্থী। নরমপন্থীরা নারীদের ন্যূনতম অধিকার থাকলেই সন্তুষ্ট। চরমপন্থীরা পুরুষদের তুলনায় নারীদের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। তা ছাড়া, তাঁরা অনেকে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্যে চরম ব্যবস্থা নিতে চান। এঁদের বলা যায়, জঙ্গী নারীবাদী। কিন্তু মধ্যপন্থীরা কেবল বিশ্বাস করেন যে, নারী আর পুরুষের অধিকার সমান। ইংরেজিতে দুই লিঙ্গের এই সমান অধিকারকে বলা হয়: জেন্ডার ইগালিটারিয়ানিজম। যাঁরা এই মতে বিশ্বাসী তাঁদের চোখে নারীও মানুষ এবং পুরুষদের মতো সমান মানুষ। এঁরা এমনও বিশ্বাস করেন যে, কেবল নারীদের অধিকার আদায় করতে গিয়ে পুরুষের বিরোধিতা করলে তার ফলে এক ধরনের লিঙ্গবৈষম্য প্রকাশ পেতে পারে। এঁদের দাবি হলো ন্যূনতম। তাঁরা

চান যে, শিক্ষা, উপার্জন, ঘরের কাজ, রাজনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা ইত্যাদিতে নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার এবং সমান সুযোগ থাকবে।

বাঙালিদের মধ্য থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় যে, নরমপন্থী নারীবাদী ছিলেন কৃষ্ণভাবিনী দাস। তিনি সমাজ-সংসারে নারীদের অধিকতর মর্যাদা থাকার কথা লিখেছিলেন তাঁর প্রথম গ্রন্থ ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলায় (১৮৮৫)। ইউরোপের নারীদের দেখে দেশের নারীদের দুর্দশা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিলেন তিনি। তিনি লিখেছিলেন যে, আমাদের দেশের নারীরা স্বাধীনতার স্বাদ কখনোই পান না। তাঁদের অবস্থার উন্নতির জন্যে তিনি তাই প্রথমেই তাঁদের ভালো শিক্ষা দানের দাবি জানিয়েছিলেন। তিনি নিজে মেয়েদের স্কুল খুলে সেখানে শিক্ষা দেওয়ার কাজও করেছিলেন। তা সত্ত্বেও নারী ও পুরুষ সমান মর্যাদা পাবেন— এ কথা তিনি বলেননি।

অপর পক্ষে, তাঁর দু দশক পরে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রথম সত্যিকারের নারীবাদী হিশেবে আত্মপ্রকাশ করেন। কারণ তিনি শুধু নারীদের অবস্থার উন্নত করতে হবে— এ কথা বলেননি, বরং নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা রীতিমতো যুক্তি দিয়ে বলেছেন। সেই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, নারীদের কেবল উপার্জনের অধিকার থাকাই উচিত নয়, বরং তাঁদের অবশ্যই উপার্জন করতে হবে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না-থাকলে তাঁরা সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ অথবা পরিবারে সমান সম্মান পেতে পারেন না।

সত্যি বলতে কি, ১৯০০/০৫ সালে প্রকাশিত তাঁর মতিচূরের একাধিক প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করলে তাঁকে শুধু সমানাধিকারবাদী বলা যায় না। নারীদের পুরুষের সমান হতে হবে— এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, পুরুষ ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ দেখানো যাচ্ছে না বলেই তিনি লিখেছেন নারীদের হতে হবে পুরুষদের সমান। পুরুষরা যা যা করতে পারেন,তাঁর মতে, নারীরা তার সবই করতে পারেন। এমন কি, পুরুষের মতো তাঁরা মাঠে গিয়ে কৃষিকর্মও করতে পারেন। কিন্তু এর অতিরিক্ত তাঁদের এমন কিছু গুণ আছে, যা পুরুষদের নেই। তিনি যেভাবে এ কথা লিখেছেন, তা থেকে ধারণা হতে পারে যে, তাঁর মতে পুরুষদের তুলনায় নারীরা শ্রেষ্ঠ, যদিও সরাসরি তিনি এ কথা লেখেননি। সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থে তিনি পুরুষদের ঘরের কাজের দায়িত্ব দান করে নারীদের দিয়ে দেশ ও সমাজ পরিচালনার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি নারী-শাসিত আদর্শ সমাজের যে-ছবি এঁকেছিলেন, তা পুরুষ শাসিত সমাজের তুলনায় অনেক উন্নত এবং সংঘাতবর্জিত। এ থেকেও মনে হতে পারে যে, তিনি নারীদের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করতেন।

তবে তাঁর সম্পর্কে আরও একটা কথা বলা দরকার যে, তিনি জঙ্গী নারীবাদী ছিলেন না। কারণ নারীদের অবস্থা উন্নত করার কাজে সহায়তা করার জন্যে তিনি পুরুষদের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, নারী এবং

পুরুষ সমান না-হলে অসমান চাকাওয়ালা গাড়ির মতো গোটা সমাজই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরপাক খেতে থাকবে। সুতরাং পুরুষদের উচিত তাঁদের নিজেদের উন্নতির জন্যেই নারীদের শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু তিনি পুরুষদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নারীস্বাধীনতা অর্জনের কোনো সুপারিশ করেননি। সেদিক থেকে তিনি অত্যাধুনিক নারীবাদীদের মতো নন।

বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তুলনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার আগে থেকে হওয়ায়, সেখানে নারীবাদী মনোভাব যতোটা দানা বেঁধেছে, মুসলমান-প্রধান বাংলাদেশে ততোটা বাঁধেনি। মুসলমান সমাজে এমনিতেই রক্ষণশীলতা বেশি। তার ওপর, সেখানে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হয় তুলনামূলকভাবে দেরিতে এবং বর্তমানে সেখানে নারীদের শিক্ষার হার পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় যথেষ্ট নিচুতে। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের মধ্যে নারীবাদী চিন্তা যাঁদের রচনায় বেশ লক্ষ্য করা যায়, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন মহাশ্বেতা দেবী, কেতকী কুশারী ডাইসন, নবনীতা দেবসেন, সুস্মিতা সেন, বুলা চৌধুরী এবং সংযুক্তা দাশগুপ্ত। অপর্ণা সেনও চলচ্চিত্রে নারীবাদী চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তবে এঁরা কেউ কট্টর নারীবাদী নন। বাংলাদেশে পূরবী বসু, দিলারা হাশিম, মালেকা বেগম, সেলিনা হোসেন, সনিয়া আমিন প্রমুখের রচনায় নারীবাদী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সত্যিকারের নারীবাদের চেয়ে বাংলাদেশে বরং নারীদের অতি হীন অবস্থা থেকে খানিকটা উপরে টেনে তোলার মতো মনোভাব অনেক বেশি লক্ষ্য করা যায়।

নারীবাদীদের মধ্যে যাঁরা রীতিমতো জেহাদী, তাঁরা হলেন নারীশ্রেষ্ঠত্ববাদী। অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন যে, নারীরা পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁদের মতে, পুরুষরা যা যা করতে পারেন, নারীরা তা সবই পারেন। তদুপরি, নৈতিক এবং অন্যান্য দিক দিয়ে পুরুষের থেকে তাঁদের অবস্থান উচ্চতর। যেমন, মেরি ডেলির মতে পুরুষদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে গেলে বিশ্বের অবস্থা অনেক উন্নত হবে। এই নারীবাদীরা নারীদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অনেক সময়ে পুরুষদের হেয় এবং নিন্দা করেন। বলা বাহুল্য, পুরুষদের পক্ষে এই ধারণা অথবা দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এই নারীরাও তাই পুরুষদের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন না অথবা পুরুষদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করাও তাঁদের পক্ষে শক্ত। এঁরা অনেকে আবার পুরুষদের আন্তরিকভাবেই ঘৃণা করেন। যৌনতার দিক দিয়েও এঁদের অনেকে তাই লেসবিয়ান অর্থাৎ নারীদেরই যৌনসঙ্গী হিশেবে নির্বাচন করেন।

চরমপন্থী নারীবাদের প্রত্যক্ষ শিকার হলেন পুরুষরা। এর ফলে দেখা দিতে পারে পুরুষ নির্যাতন এবং পুরুষদের প্রতি বৈষম্য। সে জন্যে মধ্যপন্থী নারীবাদীরা নারীশ্রেষ্ঠত্ববাদী ধারণা সমর্থন করেন না। তাঁরা বরং অনেকে মনে করেন যে, এই মত মেনে নিলে নারী ও পুরুষ সমান— এই ধারণাকে অস্বীকার করতে হয়। তাঁদের মতে, এ রকমের নারীবাদ এক ধরনের লিঙ্গবৈষম্যের কথা বলে। সুতরাং সেটা

আদর্শ স্থানীয় হতে পারে না। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল সমাজে নারীশ্রেষ্ঠত্ববাদী থাকা প্রত্যাশিত নয়। তবে কেউ কেউ হয়তো তসলিমা নাসরিনের মতো নারীবাদীকে উগ্র নারীবাদী বলতেও পারেন। নারীরা পুরুষদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ— এটা তসলিমা নাসরিন বিশ্বাস করেন কিনা, সেটা তাঁর রচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা না-গেলেও, তিনি যে পুরুষদের ঘৃণা করেন, সেটা অনেক সময়ে প্রকাশ পায়। কেবল তাই নয়, যেহেতু পুরুষরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারীদের শাসন ও শোষণ করেছেন, সুতরাং তিনিও পুরুষদের ব্যবহার করে ছিবড়ের মতো ফেলে দিতে চান— এ কথা তিনি তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন।

বস্তুত, নারীদের রক্ষা করার জন্যে অনেক সময়ে পুরুষদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা অসম্ভব নয়। বিশেষ করে গার্হস্থ্য সহিংসতায় পুরুষদেরই সাধারণত দায়ী করা হয়। কর্মস্থানে যৌন হয়রানির অভিযোগ করলেও সাধারণত পুরুষদের বিশ্বাস না-করে নারীদেরই বিশ্বাস করা হয়। ধর্ষণের অভিযোগ করলেও সাধারণত পুরুষদেরই সন্দেহ করা হয়। বাংলাদেশের নারী নির্যাতন আইনে পুরুষদের প্রতি বৈষম্য দেখানো হয়েছে বলে আমার ধারণা। এ কথা ঠিক যে, নারীদের রক্ষা করার ব্যাপারে এ আইনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং এ ধরনের পুরুষ-প্রধান সমাজে নির্যাতনের হাত থেকে নারীদের বাঁচানোর জন্যে কঠোর আইন থাকাও উচিত, কিন্তু এই আইনের ফলে কখনো কখনো পুরুষরা অন্যায্যভাবে অসুবিধায় পড়তে পারেন। পশ্চিমা বিশ্বেও গার্হস্থ্য সহিংসতায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদের দায়ী করা হলেও কখনো কখনো মহিলারাও দায়ী থাকেন। কিন্তু মহিলারা দায়ী এটা সাধারণত কেউ বিশ্বাস করে না।

নারীবাদ সবচেয়ে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছিলো ১৯৭০-এর দশকে। তখন নারীরা নতুন-পাওয়া নারীবাদের স্বাদে বিশেষ উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৯০-এর দশক থেকে তাঁদের মধ্যে এ সম্পর্কে নতুন করে ভাববার প্রবণতা দেখা দেয়। তাঁরা অনেকেই প্রশ্ন করেন, সংসারে সমানাধিকার পেলেই কি নারীরা সবচেয়ে সুখী হবেন? ১৯৭০-এর দশক থেকে তাঁরা কেউ কেউ এ অধিকার ভোগ করে লক্ষ্য করেছেন যে, সমানাধিকার পেলেই জীবনে সবচেয়ে বেশি পরিপূর্ণতা এবং সুখ লাভ করা যায় না। স্বামী অথবা পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে মারামারি করে অধিকার আদায় করেই সংসারে শান্তি আসে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে সংসারে দুঃখ নেমে আসে। বাস্তবের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁরা অনুভব করেন যে, সুখ এবং তৃপ্তি কেবল অধিকারের ওপর নির্ভর করে না। ক্ষমতার চেয়ে আনন্দ বড়ো। এই চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে আরম্ভ হয় উত্তর-নারীবাদী বা পোস্ট-ফেমিনিস্ট আন্দোলন। এখনো এই আন্দোলন চলছে। এখনো এই বিতর্ক শেষ হয়নি।

চার

নারীমুক্তির ধারা

উনিশ শতকের শেষ দিকে ইংল্যান্ডে নারীদের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটে— যদিও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের শিক্ষার অধিকার স্বীকার করে নেয়নি। এমন কি, চাকরি-বাকরিতেও তাঁদের অধিকার তেমন গৃহীত হয়নি। তখনো মেয়েদের চাকরি বললে বোঝাতো শিক্ষকতা আর নার্সিং। তারপর নারীরা ঘরের বাইরের কাজে ব্যাপক সংখ্যায় এগিয়ে আসেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে। তখন পুরুষদের অনেকেই গিয়েছিলেন যুদ্ধে। নিহতও হয়েছিলেন লাখ লাখ। ফলে কলকারখানা চালানো থেকে আরম্ভ করে বিচিত্র ধরনের কাজে মহিলাদেরই অংশ নিতে হয়েছিলো। এমন কি, যুদ্ধের প্রস্তুতির কাজেও তাঁরা সাহায্য করেছিলেন। যুদ্ধের সময়ে এই দেশসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯১৮ সালে তাঁদের ভোটের অধিকার না-দিলেও নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার অধিকার দেওয়া হয়। ভোটের অধিকার তাঁরা লাভ করেন আরও দশ বছর পরে— ১৯২৮ সালে। ইংল্যান্ডের ভোটাধিকারের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এমিলি ডেভিস, এমিলিন প্যাঙ্কহ্যার্স্ট, এলিজাবেথ গ্যারেট অ্যান্ডারসন প্রমুখ নারীবাদী। এঁদের মধ্যে প্যাঙ্কহ্যার্স্ট এই অধিকার আদায় করতে গিয়ে কারা বরণ করেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে চাকরি-করা মহিলার সংখ্যা দ্রুত বাড়লেও তাঁদের চাকরির ক্ষেত্রে যদ্দূর সম্ভব বৈষম্য বজায় রাখে পুরুষ সমাজ। উচ্চপদে না-বসানো, একই কাজের জন্যে তাঁদের কম বেতন দেওয়া, কতোগুলো কাজের জন্যে তাঁদের অনুপযুক্ত বিবেচনা করা— এসব ছিলো সেই বৈষম্যের অংশ। কিন্তু নারীবাদীদের অব্যাহত আন্দোলনের ফলে গত বিশ-পঁচিশ বছরে পুরুষরা তাঁদের অধিকার প্রায় সবটাই স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এখনও ব্যবস্থাপনার কাজে অথবা কর্মস্থানে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজে পুরুষ সমাজ রক্ষণশীলতা দেখায়। কিন্তু নারীদের অধিকার মেনে নিতে পুরুষ সমাজ বাধ্য হয়েছে। তা ছাড়া, নারীরা এখন এমন সব পেশায় নামছেন, যাতে আগে তাঁদের কল্পনা করা যেতো না। বাস, লরি, ট্রেন, বিমান ইত্যাদি চালানো, বাড়িঘর নির্মাণের মতো তথাকথিত পুরুষালি কাজ তাঁরা এখন করছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। এমন কি, এখন তাঁরা নিজেরাই ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তোলার উদ্যোগ নিচ্ছেন এবং ক্রমবর্ধমান মাত্রায় তাতে সাফল্য লাভ করছেন।

ইংল্যান্ডের মতো পশ্চিমা অন্য দেশগুলোতেও মোটামুটি একই সময়ে নারীদের অধিকার বৃদ্ধির আন্দোলন চলেছে এবং তাতে সাফল্য এসেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভোটাধিকারের কথা বলা যেতে পারে। ইংল্যান্ডের অনেক আগেই তাদের উপনিবেশ অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যান্ডে ভোটাধিকার দেওয়া হয় ১৯০২ সালে। ইউরোপের মধ্যে সবার আগে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় ফিনল্যান্ডে— ১৯০৬ সালে।

নরওয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, জার্মেনি ও সুইডেন, আয়ারল্যান্ড এবং ফ্রান্স এই অধিকার মেনে নেয় যথাক্রমে ১৯১৩, ১৯১৭, ১৯১৮, ১৯১৯, ১৯২১ এবং ১৯৪৫ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নারীদের ভোটাধিকার দেয় ১৯২০ সালে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভোটাধিকার স্বীকার করে নিলেও পশ্চিমা জগতে দীর্ঘকাল রাজনীতিতে নারীদের নেতৃত্ব পুরুষরা মেনে নেননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আজও কোনো মহিলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হননি। ইংল্যান্ডে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন ১৯৭৯ সালে— ভারতের পনেরো বছর পরে। ফ্রান্সের নারীরা খুব আধুনিক বলে তাঁদের খ্যাতি-অখ্যাতি দুইই আছে। কিন্তু সেই ফ্রান্সে এখনো কোনো মহিলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হননি। জার্মেনিতে সবেমাত্র মহিলা চ্যান্সেলর নির্বাচিত হয়েছেন।

বেশির ভাগ দেশে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হলেও পার্লামেন্টে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব এখনো আনুপাতিকভাবে খুব কম, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে। ২০০৪ সালে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে পার্লামেন্টে নারী সদস্যদের হার ছিলো শতকরা ৩৬ থেকে ৪৫। তারপর আইসল্যান্ড, জার্মেনি, নেদারল্যান্ডস এবং স্পেনে শতকরা ৩০ থেকে ৩৬। কিন্তু যে-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনে নারীবাদের সূচনা হয়েছিলো, সে দু দেশে এই হার ছিলো যথাক্রমে ১৫ এবং ১৮।

বাঙালি নারীদের দিকে তাকালে লক্ষ্য করি যে, গত অর্ধ-শতাব্দীতে তাঁদের বৈপ্লবিক উন্নতি হয়েছে। তার আগে পর্যন্ত শিক্ষা ধীরে ধীরে চালু হলেও, ডিগ্রি নিয়ে তাঁরা পরিবারকে অলংকৃত করতেন। কাজে লাগাতেন না। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে তাঁরা অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসেন। বিশেষ করে দেশবিভাগ এবং দাঙ্গা-পরবর্তী পশ্চিম বঙ্গে এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে মহিলারা রাতারাতি অর্থনৈতিক কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। রক্ষণশীল সমাজে মহিলাদের পক্ষে অবাধ নির্বাচনে জয়ী হওয়া এখনো শক্ত।

উপার্জন, ভোটাধিকার ইত্যাদি ছাড়া নারীবাদীদের আর-একটা বড়ো দাবি হলো রান্নাবান্না-সহ ঘরের কাজে পুরুষদের সমান অংশ গ্রহণ। অর্থাৎ এ দায়িত্ব কেবল নারীদের নয়, পুরুষদেরও তা সমানভাবে পালন করতে হবে। কিন্তু পুরুষ-সমাজ এর বিরোধিতা করে যুক্তি দেখায় যে, তাঁরা উপার্জন করেন, সুতরাং নারীরা ঘরের কাজ করবেন— যেন উপার্জন করাটা ঘরের কাজের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এর কারণ, পুরুষদের উপার্জন করার বিষয়টা যতোটা স্পষ্টভাবে সবার চোখে পড়ে, নারীদের ঘরের কাজ তেমন করে পড়ে না। ধরেই নেওয়া হয় যে, সেটা চাকরির মতো কোনো কঠিন কাজ নয়, তাতে কোনো যোগ্যতা লাগে না এবং সেটা জন্মগতভাবে নারীদেরই দায়িত্ব। পুরুষ মোট কতো উপার্জন করলেন, সেটা বেতনের হিশেবে নির্দিষ্টভাবে বলা যায়। কিন্তু নারীরা ঘরের কাজ বাবদে কোনো টাকাপয়সা পান না বলে এই কাজের কোনো সুনির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। সাম্প্রতিক কালে জাতিসঙ্ঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘরের কাজের মূল্য নির্ধারণ করা হলে দেখা যাবে যে, নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশি উপার্জন করেন। আর যে-নারীরা বাইরেও কাজ করেন, তাঁদের উপার্জন পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি। কেবল তাই নয়, জাতিসঙ্ঘের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশি সময় ধরে কাজ করেন।

আধুনিক কালে ঘরের কাজ নিয়ে স্বামীস্ত্রীর দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে দানা বেঁধেছে, বিশেষ করে পশ্চিমা জগতে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীস্ত্রী দুজনই চাকরি করেন। তেমন অবস্থায় রান্না করবেন কে ? ঘরের আর-পাঁচটা কাজ করবেন কে ? সন্তান লালন-পালন করবেন কে ? পুরুষরা এসব দায়িত্ব সহজে স্বীকার করে নেননি, এখনো সহজে স্বীকার করেন না। এখনো বহু পরিবারে মহিলারাই ঘরের কাজ পুরোপুরি করেন অথবা বেশির ভাগ করেন। কিন্তু সংসারের শান্তি বজায় রাখার জন্যে পুরুষরা একটা-দুটো করে এসব কাজে মহিলাদের সাহায্য করতে আরম্ভ করেছেন। এখন পশ্চিমা জগতে বহু পরিবারেই রান্নার খানিকটা স্বামীরা করেন। এমন কি, এ রকম পরিবারও আছে যেখানে রান্নার পুরো দায়িত্বই স্বামীদের।

বাংলাদেশে অথবা পশ্চিম বঙ্গে নারীদের অধিকার আদায় করার জন্যে এবং সে সম্পর্কে সচেতনতা জাগিয়ে তোলার জন্যে যে-নারীরা লড়াই করছেন, তাঁরা এখনো রান্নার কাজে সহায়তা করার জন্যে স্বামীদের ডাক দেননি। তার কারণ এই যে, এ অঞ্চলে রান্নার কাজ গৃহিণীরা নিজেরাই কম করেন, অথবা আদৌ করেন না— এখনো কাজের লোক পাওয়া যায় বলে। কিন্তু যখন কাজের লোক পাওয়া যাবে না, তখন যে এই প্রশ্ন নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিতর্ক এবং বিরোধ দেখা দেবে, তাতে সন্দেহ নেই। এবং কে কী কাজ করবেন তা নিয়ে সংসারে সংসারে যে মন কষাকষি চলবে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। সেই দ্বন্দ্বের শেষে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা কী দাঁড়াবে, এখনই তা বলা যাচ্ছে না। তবে ঘরের কাজ নারীবাদের একটা প্রধান প্রশ্ন।

নারীবাদের আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরিবারের আয়তন। পুরুষরা স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার করেই খালাস। কিন্তু স্ত্রীদের সেই সন্তান দীর্ঘ ন মাস গর্ভে ধারণ করতে হয়। এবং সন্তান জন্মের পরও মাকেই সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব নিতে হয়। সন্তান মানুষ করা মোটেই সহজ কাজ নয়। তা সত্ত্বেও এখনো বহু সমাজে মেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের গর্ভ ধারণ করতে বাধ্য করা হয়। নারীবাদীদের মতে, গর্ভ ধারণ করা অথবা না-করার অধিকার থাকা উচিত পুরোপুরি নারীদের। এই জন্যে পশ্চিমা জগতে সন্তানসংখ্যা সীমিত রাখার যে-সচেতনতা দেখা দেয়, তা থেকেই শুরু হয় গর্ভপাতের আইন প্রণয়ন এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল আবিষ্কারের গবেষণা। কিন্তু সেখানে প্রধান বাধা আসে ধর্মের তরফ থেকে। ক্যাথলিকরা কোনো রকম জন্মনিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করেন না। গর্ভপাতের তো প্রশ্নই ওঠে না, এমন কি, পিল খাওয়াতেও নয়। সংযম পালনই তাঁদের জন্যে একমাত্র ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, এটা কোনো কার্যকর ব্যবস্থা অথবা যুক্তির কথা নয়।

তাই নারীবাদীদের একটা গোষ্ঠী নারীদের গর্ভপাত এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্যে সংগ্রাম করেন। বিশেষ করে ধর্ষিতা মহিলারা গর্ভবতী হলে অবশ্যই তাঁদের গর্ভপাতের অধিকার থাকা উচিত বলে তাঁরা দাবি করেন। তাঁদের এই দাবির মুখে বিশ শতাব্দীতে গর্ভপাতের অধিকার অনেক দেশেই স্বীকৃত হয়েছে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রযুক্তিতে উন্নত কিন্তু মনোভাবের দিক দিয়ে মৌলবাদী দেশের একাংশ এখন গর্ভপাতের বিরুদ্ধে রীতিমতো সহিংস আন্দোলন করছে। যাঁরা গর্ভপাত করান তেমন ডাক্তারদের পর্যন্ত তারা হত্যা করেছে অথবা ভয়ভীতি দেখিয়েছে। কিন্তু তা অগ্রাহ্য করে এই অধিকার বহাল রাখার জন্যে নারীবাদীরা জেহাদী মনোভাব দেখাচ্ছেন। এ ব্যাপারে নারীবাদীদের একাংশ এমনই কট্টরবাদী যে, অনেকে তাঁদের বলেন ফেমিনাৎসি— অর্থাৎ নারীবাদের নাৎসি। জঙ্গী নারীবাদী। এ শব্দটি প্রথম বারের মতো ব্যবহৃত হয় ১৯৯০ সালে।

তবে স্বীকার করতে হবে আন্দোলন ছাড়াই ১৯৬০ সাল থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল বাজারে বের হওয়ার পর থেকে পশ্চিমে সন্তানের সংখ্যা খুবই কমে গেছে। অরক্ষিত যৌনকর্মের পরের দিন সকালে পিল খেয়ে গর্ভনিরোধের ওষুধও আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে কার্যকরভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এখন আছে। তা ছাড়া, অনেক পরিবারে স্বামীস্ত্রী আগে থেকেই সন্তান না-নেওয়ার সংকল্প করেন। তাঁরা মনে করেন যে, সন্তান নিলে জীবন উপভোগ করার সুযোগ অনেক কমে যাবে। কর্মজীবী বহু মহিলা আবার মনে করেন যে, সন্তান নিলে কর্মস্থানে উন্নতির প্রতিযোগিতায় তাঁরা পিছিয়ে পড়বেন। এই সমস্ত কারণে পশ্চিমা জগতে কোনো কোনো দেশে জন্মের হার এতো কমে গেছে যে, সেসব দেশে মোট জনসংখ্যা কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বলা যেতে পারে, এসব দেশে গর্ভপাতের যে-অধিকার রয়েছে, তা নীতিগত অধিকার, বাস্তবে তার প্রয়োগ অতো ব্যাপক নয়।

অনেক পুরুষসমাজেই দেখা যায় যে, ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে অংশত নারীদেরই দায়ী করা হয়। ধর্ষিতা নারী কী ধরনের পোশাক পরেছিলেন এবং সাজগোজ করেছিলেন, কেমন আচরণ করেছিলেন, ধর্ষককে যদ্দুর সম্ভব শারীরিকভাবে বাধা দিয়েছিলেন কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন তোলা হয়। কিন্তু ধর্ষণ করার দায় যে পুরুষের সেটা এক কথায় স্বীকার করে না। ধর্ষিতা নারীকেই প্রমাণ করতে হয় যে, তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে। ভারতে ২০০৩ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর চার লাখের বেশি ধর্ষণের মামলা হয়েছে। এই সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে পুলিশ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আংশিকভাবে নারীদেরই দায়ী করেছে। তাদের বক্তব্য হলো মেয়েরা ধর্ষণের আগে অনেক ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় পোশাক পরেছিলেন এবং উস্কানিমূলক আচরণ করেছিলেন।

পাকিস্তানের মতো ইসলামী দেশে ধর্ষণ প্রমাণ করার দায় পুরোটাই নারীদের ওপর। তার অর্থ প্রমাণ করতে না-পারলে সেই নারী কেবল অপমান সহ্য করতেই বাধ্য হবেন না, বরং অনেক ক্ষেত্রে শাস্তিও পেতে পারেন। পাকিস্তানের আইন অনুযায়ী যদি চারজন পুরুষ সাক্ষ্য দেন যে, তাঁরা দেখেছেন একজন পুরুষ এক মহিলাকে ধর্ষণ করছে, তা হলেই তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে। অন্যথায় নয়। এর থেকে অন্যায্য আইন হওয়া শক্ত। কিন্তু তবু এ আইন পাকিস্তানে প্রচলিত আছে। এই আইনের বিরুদ্ধে মুখতারান মাই নামে এক ধর্ষিতা নারী যে-অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার জন্যে তিনি সারা বিশ্বের নারীবাদীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। ধর্ষণের জন্যে মহিলাদের দায়ী করার এই মনোভাব নারীবাদীরা দূর করতে চান।

নারীদের অধিকার সম্পর্কিত আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যৌনতা। যৌনকর্ম নারী এবং পুরুষ উভয়ের সমান উপভোগ করার কথা। কিন্তু অল্পকাল আগেও মনে করা হতো যে, নারীদের যৌনতার অস্তিত্বই নেই অথবা এই কর্মে তাঁদের ভূমিকা নিতান্তই নিষ্ক্রিয় এবং এতে তাঁদের তৃপ্তি-অতৃপ্তির কোনো প্রশ্ন ওঠে না। নারীদের যৌনতাকে সাধারণত পাপ এবং নোংরা বিষয় বলে গণ্য করা হতো। ব্যাপকভাবে মনে করা হয় যে, তাঁদের যৌনতা আছে শুধু পুরুষদের তৃপ্ত করার জন্যে। এ ব্যাপারে পুরুষদের স্বার্থপরতার সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত আরবী ভাষী এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। এই দেশগুলোতে মেয়েদের যৌনাঙ্গের একটা অংশ (ক্লাইটরিস) কেটে ফেলে খতনা দেওয়ার নিয়ম এখনো ব্যাপকভাবে চালু আছে। এসব দেশ থেকে যাঁরা পশ্চিমে চলে এসেছেন, তাঁরা সেসব দেশেও গোপনে গোপনে এই রীতি অনুসরণ করেন বলে অনেক সময়ে জানা যায়। এভাবে খতনা করলে মেয়েদের যৌনসুখ অনুভব করার ক্ষমতা অনেকাংশেই হ্রাস পায়। ফলে নারীকে তৃপ্ত করার দায় থেকে বীর পুরুষরা অব্যাহতি পান।

বস্তুত, মানব সভ্যতার গোড়া থেকেই বহু নারী সারাজীবনে হয়তো কখনোই সত্যিকার যৌনসুখের স্বাদ পেতেন না। কিন্তু তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে তেমন সচেতনতা অথবা অভিযোগ ছিলো না। তাঁরা যা পেতেন, মনে করতেন, সেটাই স্বাভাবিক এবং তাই নিয়েই সুখী থাকতেন। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকে জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল বাজারে চালু হওয়ার পর তাঁদের মধ্যে এ সচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পায়। কারণ তাঁরা গর্ভের আশঙ্কা না-করেই যৌনকর্মে অধিকতর অংশ গ্রহণের সুযোগ পান। তা ছাড়া, পিলের দৌলতে মেয়েরা প্রথম বারের মতো যৌনস্বাধীনতার আস্বাদও লাভ করেন। এর ফলে বিবাহ-বহির্ভূত যৌন অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পায়। চিরাচরিত সতীত্বের মাপে এটাকে যেমনই মনে করা হোক না কেন, এ থেকে কোনো কোনো নারী তুলনা করেও যৌনসুখের মান বিচার করার সুযোগ পান।

যাঁরা বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতার স্বাদ পাননি, তাঁরাও ১৯৫০-এর দশক থেকে উন্নতমানের যৌনবিজ্ঞানের বই পড়ে নারীদের যৌনতা সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানতে পান। এ বিষয়ে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত অ্যালফ্রেড কিন্সলির সেক্সুয়াল বিহেবিয়ার ইন দ্য হিউম্যান ফিমেইল এবং উইলিয়াম মাস্টার্স ও ভ্যর্জিনিয়া জনসনের হিউম্যান সেক্সুয়াল রেসপন্স (১৯৬৬) রীতিমতো পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সত্যিকারের জনপ্রিয়তা লাভ করে অ্যালেক্স কমফর্টের দ্য জয় অব সেক্স (১৯৭২)। এই গ্রন্থটি প্রকাশের পর ৭০ সপ্তাহ ধরে তা বেস্টসেলারের তালিকায় ছিলো। এসব বই থেকে নারীরা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে, তাঁরাও পুরুষদের সমান যৌনসুখ পেতে পারেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নারীরা যে-অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন লাভ করেন, তাও তাঁদের অধিকতর স্বাধীনচেতা করেছিলো। এসবের মিলিত ফল হলো: ১৯৬০-৭০-এর দশক থেকে যৌনস্বাধীনতার প্রসার।

সচেতনতা লাভের ফলে নারীবাদীরা নারীদের যৌনতার ইতিবাচক দিকগুলোও তুলে ধরতে চান। বহু শতাব্দী ধরে এ সম্পর্কে পুরুষ সমাজে যে-একপেশে এবং স্বার্থপরতার মূল্যবোধ গড়ে উঠেছিলো, তাঁরা তার স্বরূপ উন্মোচন করেন। যৌনতার বিষয়ে পুরুষ সমাজে যে-দ্বৈত মূল্যবোধ রয়েছে, তাঁরা তারও সমালোচনা করেন। তাঁরা বলেন যে, পুরুষরা যৌনবিষয়ে সক্রিয় হলে তার কোনো বদনাম হয় না, বরং সেটাকেই স্বাভাবিক বলে বিবেচনা করা হয়। অপর পক্ষে, কোনো নারী যৌনতার ব্যাপারে উৎসাহী এবং সক্রিয় হলে তাকে চরিত্রহীন, বেশ্যা, ছেনাল ইত্যাদি বলে নিন্দা করা হয়। এই বৈষম্য এবং ভণ্ডামি দূর করা নারীবাদীদের একটি বড়ো লক্ষ্য। পুরুষরা তাঁদের নিজেদের বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক রাখাকে প্রায় নির্দোষ বলে গণ্য করেন, কিন্তু তাঁদের স্ত্রীদের কাছ থেকে শতকরা এক শো ভাগ সতীত্ব দাবি করেন।

এই রকমের ভণ্ডামির আরও দৃষ্টান্ত হলো পুরুষমুখী সমাজে পুরুষের ভুল-ক্রটি, অন্যায়কে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হয়, কিন্তু নারীদের নয়। যেমন, কোনো পুরুষ অসঙ্গত অথবা ক্রুদ্ধ আচরণ করলে তার কারণ ব্যাখ্যা করে হয়তো বলা হয় যে,

কোনো কারণে তার মেজাজ ভালো ছিলো না, অথবা সে মানসিক চাপের মুখে ছিলো। কিন্তু মেয়েরা এমন আচরণ করলে সমাজ তা সহানুভূতির চোখে দেখে না। কোনো ছেলে বদমায়েসি করলে অথবা, ধরা যাক, কোনো মেয়ের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করলে তার তেমন নিন্দা হয় না— বরং ছেলেরা অমনই হয় বলে তার সাফাই গাওয়া হয়, কিন্তু মেয়েরা একই ধরনের কিছু করলে সমাজে তার অনেক নিন্দা হয়। এমন কি, কোনো পুরুষ কর্মস্থানে দক্ষতা দেখালে সেটাকে তার স্বাভাবিক ক্ষমতা এবং সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশ বলে বিবেচনা করা হয়; অপর পক্ষে, কোনো নারী দক্ষতা দেখালে তাঁকে ন্যায্য কৃতিত্ব দেওয়া হয় না। বরং তাঁকে কেউ সাহায্য করেছে অথবা দৈবক্রমে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বলে তাঁর কাজকে ছোটো করে দেখা হয়। নারীবাদীরা এই মনোভাবও আমূল বদলে ফেলতে চান।

নারীবাদীরা ভাষায় যে-লিঙ্গবৈষম্য আছে, তাও দূর করতে চান। ভাষা বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, সব ভাষাই কমবেশি পুরুষশাসিত সমাজের তৈরি। সে জন্যে ভাষায় অনেক শব্দ থাকে যাতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। যেমন, ইংরেজিতে বলা হয়: ম্যান ইজ মর্টাল। এখানে ম্যান বলতে নারীও বোঝানো হয়। মনুষ্যজাতিকে বলা হয় ম্যানকাইন্ড। এখানেও ম্যান অর্থ তাবৎ মানুষ, কেবল পুরুষ নয়। কিন্তু ম্যান শব্দটি পুংলিঙ্গবাচক।

বাংলায়ও এ রকমের বহু লিঙ্গবৈষম্যমূলক দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, বাংলায় বলা হয় মানব জাতি— যদিও তার মধ্যে মানবীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বঙ্গদেশে এক সময় কন্যাসন্তান এতোই অবাঞ্ছিত ছিলো যে, মেয়ে জন্মালে তাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য করার জন্যে বলা হতো মেয়েছেলে। সমাস করার সময় সংক্ষিপ্ত শব্দটি আগে এবং লম্বা শব্দটি পরে রাখতে হয়। কিন্তু যেমন রাজপুরুষ। কিন্তু স্বামী এবং স্ত্রী সমাস করলে স্ত্রীস্বামী না-বলে বলা হয় স্বামীস্ত্রী। তেমনি বাবামা। এরও কারণ পুরুষ এবং নারীদের মধ্যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, সতরাং ব্যাকরণেও লিঙ্গবৈষম্য বজায় রাখতে হয়। সভা যিনি পরিচালনা করেন তাঁকে বলা হয় সভাপতি। কিন্তু মহিলা সভাপতিকে সভাপত্নী বলা হয় না। নারীবাদীরা এ ভাষার বিরোধী। পশ্চিমা বহু দেশে তাই লিঙ্গবৈষম্যমূলক বহু পরিভাষার পরিবর্তে এখন উভয় লিঙ্গে ব্যবহার করার মতো শব্দ তৈরি হয়েছে। যেমন, সভাপতির বদলে বলা হয় চেয়ার পার্সন। বাংলায় অধ্যাপক শব্দের প্রতিশব্দ তৈরি হয়েছে অধ্যাপিকা। কিন্তু তারপরও বহু শব্দ থেকে যাচ্ছে, যা লিঙ্গবৈষম্যমূলক। যেমন মন্ত্রী। বাংলাদেশের দুজন মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন কিন্তু তাঁদের প্রধানমন্ত্রীই বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শব্দটি শুনতে অবশ্য অতো খারাপ লাগে না। কিন্তু বাংলাদেশে কখনো মহিলা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে তাঁকে কী বলা হবে, তা চিন্তার বিষয়— নিশ্চয় রাষ্ট্রপত্নী নয়। এ রকমের আর-একটি শব্দ অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষা এখনো ব্যবহৃত হয়েছে বলে দেখিনি, যদিও পশ্চিমঙ্গ এবং বাংলাদেশে বহু মহিলা অধ্যক্ষ আছেন।

সবশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নারীবাদীদের লক্ষ্য সব সমাজে অভিন্ন নয়। আফ্রিকার একটা অনুন্নত সমাজে যা প্রাগ্রসর নারীবাদী ধারণা বলে মনে হতে পারে, ইউরোপের একটা উন্নত সমাজে তা আগে থেকেই অর্জিত হয়েছে বলে হয়তো আদৌ নারীবাদীদের কাছে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে না। কারণ, সেটাকেই ন্যূনতম প্রত্যাশা বলে গণ্য করা হয়। যেমন, বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার।

স্বাধীনভাবে বিবাহ করার অধিকার পুরুষ ও মহিলা— উভয়ের জন্যেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর ওপর সারা জীবনের সুখ এবং শান্তি নির্ভর করতে পারে। তা সত্ত্বেও পশ্চিমা জগতে এটা কোনো নারীবাদী বিতর্কের বিষয় নয়। কারণ, সেখানে এ অধিকার দীর্ঘকাল আগে থেকেই স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল সমাজে এটা এখনো একটা নারীবাদী বিতর্কের বিষয় বলে বিবেচিত হতে পারে। তাই বাঙালি নারীবাদীরা এ সম্পর্কেও আন্দোলন করেন।

এ রকম, নারীদেরও পুরুষের মতোই বিবাহবিচ্ছেদের সমান অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু অনেক সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার যথেষ্ট পরিমাণে নেই। যেমন, খৃস্টধর্ম অনুযায়ী নারী-পুরুষ কারোই এ অধিকার নেই। এখনো ক্যালিকদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ খুবই অবাঞ্ছিত বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু ধর্মীয় এ বাধা সত্ত্বেও ষোড়শ শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে একটি-দুটি করে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটতে থাকে। ইংল্যান্ডে বিবাহবিচ্ছেদ আইনী সমর্থন লাভ করে সপ্তদশ শতাব্দীতে।

খৃস্টানদের মতো হিন্দুদেরও বিবাহ হলো দৈব ঘটনা। সুতরাং অবিচ্ছেদ্য। সে জন্যে হিন্দুদের মধ্যেও বিবাহবিচ্ছেদ স্বীকৃত ছিলো না। তবে ১৯৫৫ সালে ভারতে যে-পারিবারিক আইন গৃহীত হয়, সে আইন অনুযায়ী হিন্দু, বৌদ্ধ এবং শিখদের জন্যে এ অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, যদিও সর্বক্ষেত্রে নয়। বাংলাদেশের হিন্দুরা দেশের আইন অনুযায়ী বিবাহ করতে পারেন। মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে বিবাহ আইনগত চুক্তি, অতএব এ চুক্তি বাতিল করা সম্ভব। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অধিকার অনেক কম। যেমন, পুরুষরা তিনবার তালাক বললেই বিবাহ ভেঙে যায়, কিন্তু মহিলারা শুধু তালাক বলে বিবাহ ভাঙতে পারেন না। তার জন্যে তাঁদের আইনের আশ্রয় নিতে হয়। স্বামীদের কোনো কারণ দেখানোর দরকার নেই, কিন্তু নারীদের দেখাতে হয় শারীরিক অথবা মানসিক নির্যাতন, স্বামীর অন্য যৌনসম্পর্ক অথবা এ ধরনের কোনো কারণ।

যতো দিন সম্ভব ছিলো পুরুষরা ততোদিন নারীদের শাসন এবং শোষণ করেছেন। কিন্তু শিক্ষার বিকাশ এবং অর্থনৈতিক সাবলম্বন লাভের ফলে নারীদের মধ্যে যে-সচেতনতা দেখা দেয়, তা থেকেই নারীবাদের সূচনা। পুরুষ প্রথমত বিশ্বাসই করতে পারেনি যে, নারীরা পুরুষদের মতো মননশক্তির অধিকারী অথবা সংসারের কাজ ছাড়া কোনো কাজ করতে সমর্থ। কিন্তু যখন নারীরা প্রমাণ করলেন

যে, তাঁদের মননশক্তি পুরুষদের মতোই এবং তাঁরা যে-কোনো কাজই করতে পারেন, তখন পুরুষ সমাজ সহজে নিজেদের সুবিধাজনক অবস্থান ছেড়ে দিতে রাজি হয়নি। নারীদের তা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আদায় করে নিতে হয়েছে। গোড়ার দিকে এ কাজে কিছু পুরুষও তাঁদের সহায়তা করেছেন।

সমাজ কতোটা রক্ষণশীল তার ওপর নির্ভর করে এক-এক সমাজে নারীবাদীদের কতোটা বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আবার কতোটা অধিকার নিয়ে নারীরা সন্তুষ্ট হবেন, তাও নির্ভর করেছে, সে সমাজ কতোটা আধুনিক অথবা কতোটা রক্ষণশীল তার ওপর। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, ক্যাথলিক সমাজে এখনও নারীদের ধর্মীয় বিধান শিথিল করার আন্দোলন করতে হচ্ছে, কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্ট সমাজ করতে হচ্ছে না। ক্যাথলিকদের কাছে যৌন-স্বাধীনতা এখনো অতোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, অথচ সুইডেনের মতো দেশে দু দশক আগে সেটাই ছিলো নারীবাদী আন্দোলনের একটা প্রধান বিষয়। বাঙালি নারীবাদীদের কাছেও যৌনস্বাধীনতা এখনো তেমন প্রাসঙ্গিক নয়, যদিও কালে কালে তা হওয়া অসম্ভব নয়। মুসলমানদের মধ্যেও নারীমুক্তির ধারণা যথেষ্ট বাধার মুখোমুখি হয়েছে।

আবার, পর্দা প্রথা থেকে মুক্তি পাওয়া মুসলমান ছাড়া কোনো সমাজেই একটা আন্দোলনের বিষয় নয়। কিন্তু বিরাট মুসলিম বিশ্বে নারীবাদীদের কাছে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, নারীদের বন্দী করে রাখার যতো উপায় আছে, পর্দা তার প্রধান হাতিয়ার। ধর্মীয় বিধান দিয়ে যেহেতু একে পালনীয় বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে জন্যে এই বিধান অস্বীকার করে নারীদের মুক্ত করার জন্যে আরও সময় লাগবে বলে মনে হয়। গত পঞ্চাশ বছরে শিক্ষা এবং নারীদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ফলে সমাজের একাংশে যেভাবে পর্দা খসে পড়েছে, তা থেকে অবশ্য মনে হয়, কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন থাকলেও কালে কালে পর্দা প্রথা থাকবে না। এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত হওয়ায় এবং বিশ্বায়নের হাওয়া লাগায়ও আন্তর্জাতিক আবহাওয়া কোনো দেশ অথবা কোনো সমাজই পুরোপুরি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে বলেও মনে হয় না। সেদিক দিয়ে মনে হয়, আন্তর্জাতিক বিশ্বে নারীমুক্তির যে-দৃষ্টান্ত শক্ত ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়েছে, তা রক্ষণশীল সমাজগুলোকেও কমবেশি প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে এবং একদিন নারীরাও পুরুষদের মতো একই অধিকার লাভ করবেন। এবং সে অধিকার লাভের পরই নারীও মানুষ বলে স্বীকৃতি লাভ করবেন। আপাতত পুরুষরা পুরোপুরি মানুষ, নারীরা নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ।

(*অন্যদিন*, ঈদ সংখ্যা, ২০০৬)

৭
ধর্ম ও নারী

গত ২৪ শে মার্চ (২০০৪) নিউ ইয়র্কের ইসলামিক সেন্টারে বিনে পয়সার ভোজের সঙ্গে শেখ মোহাম্মদ আল-শরীফ একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিলো: বিবাহ এবং তার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক কী। নানা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করে তিনি যা বলেছিলেন, তা সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিংটিংছট— বিয়ের সঙ্গে ভালোবাসার কোনো সম্পর্ক নেই। শুনে কারো কারো একটু খটকা লাগতে পারে। কেউ কেউ বিস্মিত হতে পারেন। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে স্বীকার করতেই হবে যে, বিয়ে মানে হলো একজন পুরুষের সঙ্গে একজন মহিলার সহাবস্থান, সহবাস! পুরুষপ্রধান ঐতিহ্যিক সমাজের প্রত্যাশা হলো: দিনের বেলা স্বামী বাইরে যাবে, টাকাপয়সা নিয়ে আসবে। তাই দিয়ে সংসার চলবে। আর বৌ ঘরে বসে রান্নাবান্না করবে, সংসারের কাজকম্ম করবে, বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করবে, আর রাতে স্বামীর সঙ্গে শোবে। তাতে ভালোবাসার কথাটা প্রায় অবান্তর। ধান ভানতে শিবের গীত গাইবার মতো। এ যুগের শেখ সাহেবই নয়, প্রাচীন শাস্ত্রকার মনুও এই একই বিধান দিয়েছেন। আসলে সব শিয়ালের একই রাঁ! মনু বলেছেন, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। অর্থাৎ পুত্র জন্ম দেওয়ার জন্যে বৌ আনা। তা না-হয়ে খাল কেটে কুমির আনে কে ? একটা লোকের খাওয়া-পরার জন্যে তো ব্যয় কম হয় না! তদুপরি, তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে গেলে কিছু ছাড় তো দিতেই হয়! তা ছাড়া, এটা বিজ্ঞানের কথা— সন্তান জন্ম দিতে ভালোবাসা লাগে না। ধর্ষণ করলে কি গর্ভ হয় না ?

শেখ মুহাম্মদ আল-শরীফ এবং মনু— দুজনই যা বলেছেন, তা শাস্ত্রীয় আইনের কথা। মনুর বিধান তো রীতিমতো হিন্দুদের কোড অব লাইফ। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী, ষষ্টী— কবে কুমড়ো খাওয়া যাবে, কবে যাবে না— এ ধরনের বিষয় থেকে আরম্ভ করে কবে যৌন সম্ভোগ করা যাবে, কবে যাবে না— সবই আছে মনুতে। এর চেয়ে কমপ্লিট কোড অব লাইফ আমার জানা নেই। আর থাকলেও, তার কোনো দরকার নেই। আর শেখ মুহাম্মদও যা বলেছেন জেনেশুনেই বলেছেন। তিনি প্রথম যৌবনেই হাফিজ হয়েছেন কোরান মুখস্থ করে। তার পর খোদ মদিনা থেকে ডিগ্রি করেছেন ইসলামী আইন নিয়ে। খৃস্টানরা কি বাদ যান ? না, যান না। যুগে যুগে সংস্কার নামক নানা প্রক্ষেপ ঢুকে পড়েছে খৃস্টধর্মে। শাখার হিশেবে খৃস্টধর্ম বোধ হয় হিন্দু ধর্মকেও হারিয়ে দিয়েছে। তবু খৃস্টধর্মের সেই বিচিত্র মতের মধ্যেও নারীদের কম কাবু বা কোণঠাসা করা হয়নি। তবে পশ্চিমা দেশের অধিকাংশ নাগরিক চার্চে যান না, সকালে-সন্ধ্যায় প্রার্থনাও করেন না। কাজেই সেখানে মেয়েদের ওপর ধর্মের শাসনটাকে— অন্তত বাইরে থেকে— লোহার শিকলের মতো দুর্ভর মনে হয় না।

ধর্মে ধর্মে দুস্তর ভেদ আছে। এক ধর্মে যা পুণ্যের কাজ, অন্য ধর্মে তা রীতিমতো পাপ বলে বিবেচিত হতে পারে। এক ধর্মে শুয়োর খাওয়া কোনো অন্যায় কাজ নয়, কিন্তু আর-এক ধর্মে শুয়োরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। আবার কোনো ধর্মে সব রকমের মাসং খাওয়াই নিষিদ্ধ। বিচার করে দেখলে ধর্মে ধর্মে এ রকমের অমিল দেখা যাবে বিস্তর। কিন্তু সব ধর্মেই পুরুষদের তুলনায় নারীদের হেয় করে দেখানো হয়েছে। ধর্মের বিধান অনুযায়ী নারীরা মনুষ্যেতর জীব। তবে সেই জীবটা অন্য মানুষের মতো দেখতে, মানুষের মতো কথা বলে, মানুষের মতো বুদ্ধি রাখে, এমন কি, এই জীবটিকে না-হলে তথাকথিত মানুষগুলোর চলেও না। কিন্তু এই জীবটিকে ছোটো করে তার সীমানার মধ্যে রাখার জন্যে সব ধর্মেই এন্তার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

গরু ছাগল থেকে শুরু করে তাবৎ জীবের অন্তত স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার আছে। নারীদের তাও নেই। তাদের দেহটা যেহেতু পুরুষদের কামনার বস্তু, সে জন্যে সেই দেহটা নিয়ে পুরুষদের ঈর্ষা এবং দুশ্চিন্তার সীমা নেই। সে জন্যে যে-মহাপুরুষ বিধবাদের বিবাহ দেওয়ার অনুমতি দেন, তিনিই আবার নিজের বিধবাদের বিবাহ নিষিদ্ধ করেন। কেবল তাই নয়, নারীদেহটাকে ঢেকে-ঢুকে রাখার বিধান দেওয়া হয়েছে সব ধর্মে। বোধ হয় প্রাচীন হিন্দু ধর্মে এ ব্যাপারে অতো শুচিবাইগ্রস্ত ছিলো না। সে কালের যতো নারীমূর্তি দেখা যায়, বিশেষ করে টপলেস মূর্তি, তা থেকে এ ধারণা হতে পারে। তা ছাড়া, মন্দিরে মিথুনরত মূর্তি থেকেও এমন মনে হতে পারে। কোনো কোনো মন্দির আছে, যাকে বলা যায় বাৎস্যায়নের প্র্যাকটিকল ডেমনস্ট্রেশান। কয়েকজন পুরুষ মিলে এক নারীকে সঙ্গম, কয়েক নারীকে এক পুরুষের সঙ্গম থেকে আরম্ভ করে যৌনকর্মের এমন কোনো বৈচিত্র্য নেই, যার নমুনা নেই এসব মূর্তিগুচ্ছে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের এই ব্যতিক্রম বাদ দিলে সব ধর্মই নারীদেহ নিয়ে মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কতোভাবে সেই সুন্দর দেহটিকে ঢেকে রাখা যায়, তার প্রতিযোগিতা চলে ধর্মে ধর্মে।

ডিবিশন অব লেবার। এই ডিবিশন অব লেবারের প্রতি সব ধর্মেরই কমবেশি সমর্থন রয়েছে। ধর্ম নারীপুরুষের ভূমিকা মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে বেঁধে দিয়েছে। তুমি ঘরে বসে হাত পুড়িয়ে রান্না করো, থালা-বাটি মাজো, ঘাম ঝরিয়ে কাপড় কাচো, ঘর পরিষ্কার করো, আমি ভদ্র পোশাক পরে বাইরে গিয়ে কিছু টাকাপয়সা নিয়ে আসি। অর্থাৎ শক্ত কাজটা তুমি করো, হাল্কা কাজটা আমি সারি। এভাবে পেশী আর অর্থ দিয়ে পুরুষরা একেবারে আদি কাল থেকে নারীদের রেখেছে বন্দী করে।

তার ফলে যেসব সামাজিক আইন তথা লোকাচার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তৈরি হয়েছে, তা পুরুষরাই তৈরি করেছেন। কোনো কোনো প্রভাবশালী পুরুষ আবার এসব আইনকে অদৃশ্য শক্তি ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে আরও জোরদার করেছেন। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে, পুরুষের আইন আর ধর্ম সম্পূরকের মতো কাজ করেছে। পুরুষের আইনই ধর্মের লেবাসে অবশ্য-পালনীয় প্রশ্নাতীত বিধানে পরিণত হয়েছে। কারণ পুরুষের আইন লুকিয়ে-চুরিয়ে কখনো কখনো অমান্য করা যায়। বীরপুরুষরা সবসময়ে হাজির থাকেন না, সর্বত্রগামীও নন। বাকি সময়টা মেয়েদের পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব বেছে নিলেন স্বয়ং ঈশ্বর মহোদয়, যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বদ্রষ্টা, সদাজাগরূক, সর্বত্রগামী। সুতরাং তাঁর বিধান অমান্য করার উপায় নেই। তিনি আবার অনেকগুলো দেবতা (অথবা অপদেবতা) লাগিয়ে রেখেছেন মেয়েদের পাহারা দেওয়ার জন্যে। এটা হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করতে পেরেই নারীবাদীরা অতো চটা ধর্মের ওপর।

নারীবাদীরা চটা— তার কারণ তাঁরা অনুভব করতে পেরেছেন যে, কখনো অনুনয়-বিনয় করে, কখনো ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিষিদ্ধ ফল খাইয়ে, কখনো মিনসের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে যদিবা একটু এধার-ওধার করা যায়, ঈশ্বর বাবুর কথা স্বামী অগ্রাহ্য করতে চান না, এমন কি, নারীরা নিজেরাও অমান্য করতে ভয় পান। কী জানি, শেষে কী হয়! ফলে সেই মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসা আইনই কবুল করে নিতে হয়। নারীবাদীরা মুক্তির, স্বাধীনতার, উন্নততর জীবনের, সমানাধিকারের সৃষ্টিছাড়া চিন্তাভাবনা করলেও, সাধারণ নারীরা আদৌ ভেবেই দেখেন না, পুরুষরা কী কী উপায়ে এক্সপ্লয়েট করেন তাঁদের।

স্বাধীনভাবে চিন্তা করার বিষয়টা ধর্ম তথা সনাতন মূল্যবোধ ঠিক উৎসাহিত করে না। ধর্মের কথা হলো: তুমি ভাববে কেন ? তোমাকে যেমনটা করতে বলা হয়েছে, ঠিক তেমন করো— পুস্তকী ভাষায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না-করে, ডানে-বাঁয়ে না-তাকিয়ে যেমন বলা হয়েছে— ঠিক তেমনই— সামনে চলো। ধর্ম যতো আগেই বিধান দিয়ে থাক, সেটা প্রশ্নাতীত। সেটা এ যুগে চলতে পারে কিনা, অথবা সেটা মেনে চললে উন্নতির পথে যাওয়া সম্ভব কিনা, এটা কেউ বিচার করে না। এমন কি, এ প্রশ্ন কেউ তুললে রক্ষণশীল সমাজ রক্তচক্ষু দেখিয়ে তাকে শাসন করে। এসব

ঝামেলায় বেশির ভাগ লোকই যেতে চায় না। বস্তুত, সনাতন মূল্যবোধ মেনে চললে শামসুর রাহমানের ভাষায় মেষের মতো সুখে থাকা যায়— মেষরে মেষ তুই আছিস বেশ!

নারীরা কিছুকাল আগে পর্যন্ত সেই বেশ সুখেই ছিলেন। কিন্তু পথভ্রষ্ট কিছু নারীদরদী— ভাষান্তরে— স্ত্রৈণ পুরুষ এবং কিছু উচ্চাভিলাষী মহিলা মিলে নারীদের মনে অশান্তির বীজ বপন করেন দেড় শো / দু শো বছর থেকে। তখন থেকেই ঘরে-ঘরে নারীদের মনে অ-সনাতনী চিন্তা দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। নারীপুরুষের অধিকার সমান ইত্যাদি বৈপ্লবিক ধারণা বাসা বাঁধে। এখন ধর্মগুরুরা পই পই করে মন্ত্র যপ করে ফের এই অবাধ্য নারীদের ঘর-মুখো করতে চেষ্টা করছেন। অনেক স্বামীও যোগ দিয়েছেন এই চেষ্টায়। তাঁরা বৌদের এবং ক্ষেত্রবিশেষে মেয়েদের শ্লীলতার দোহাই দিয়ে কয়েক পরত কাপড়চোপড় পরাচ্ছেন। দুবেলা মন্ত্র যপ করাচ্ছেন। উঠতে-বসতে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, স্বামী পরম গুরু। স্বামীর পদতলেই স্বর্গ। কিন্তু যে-স্ত্রীরা শিক্ষার আলো দেখেছেন, একবার চার দেয়ালের বাইরে কাজ করার স্বাদ পেয়েছেন, রান্নাবান্নার চেয়েও তৃপ্তিদায়ক কাজের জগতের সন্ধান পেয়েছেন, সন্তান জন্মদান এবং তাদের লালনপালন করার চেয়েও অর্থবহ জীবনের দেখা পেয়েছেন, সেই নারীরা আর পুরোনো মূল্যবোধের খাঁচায় বন্দী হবার সম্ভাবনায় আনন্দে লাফাচ্ছেন না। ফলে রক্ষণশীল সংসারে নারীপুরুষে দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে, সেই দ্বন্দ্ব কখনো কখনো এমন গুরুতর হচ্ছে যে, তার ফলে সংসার ভেঙে যাচ্ছে। এই অশান্তি এবং দ্বন্দ্বের জন্যে সমাজ সাধারণত অবাধ্য নারীদেরই দোষারোপ করে। সমাজে এঁদের ভালো চোখে দেখা হচ্ছে না।

আর, নারীদের অধিকারের কথা যাঁরা বলছেন, এবং সেই অধিকার আদায়ের জন্যে প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডাটা একটু উঁচু করে তুলে ধরছেন, সেই নারীবাদীদের রীতিমতো ভয়ভীতি এবং সহিংসতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে স্ত্রীশিক্ষার হার অনেক বেশি, যে-সমাজে নারীপ্রগতির ধারা বইতে শুরু করেছে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে, সেখানেও তিলোত্তমা অথবা সুস্মিতাদের অনেকে ভালো চোখে দেখেন না। আর, বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজে সনাতন ভূমিকার বাইরে কোনো নারী কিছু করলে, তাকে সমাজের শাসন সহ্য অথবা অগ্রাহ্য করতে হয়। তসলিমার মতো কেউ নারীদের অধিকার এবং পুরুষদের অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে তাঁকে ফতোয়ার শিকার হতে হয়। কেবল ব্যক্তি নয়, এনজিওর মতো কোনো সংস্থা নারীদের উন্নতির কাজে এগিয়ে এলে তাকেও মৌলবাদীদের বোমাবাজি অথবা অগ্নিসংযোগের শিকার হতে হয়।

ধর্ম এবং নারীদের সংঘাত অবশ্য ফতোয়া অথবা ধর্মীয় বিধান দিয়ে মীমাংসা করা যাবে বলে মনে হয় না। কারণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতি হচ্ছে বলতে গেলে রকেটের গতিতে। গোটা বিশ্বের নারীপুরুষের মিলিত কর্মজীবনের ক্রমবর্ধমান আদর্শ

যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবীতে। ইচ্ছে করলেও সেই প্রগতির ধারাকে ঠেকিয়ে রাখার উপায় নেই। ফলে মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার মতো রক্ষণশীল সমাজগুলোও এই নতুন জীবনের আদর্শ দিয়ে কমবেশি প্রভাবিত হতে আরম্ভ করেছে। এসব দেশে শিক্ষার হার যতো ছড়িয়ে পড়বে, এই আদর্শ ততোই প্রশস্ত পথে রক্ষণশীলতার দুর্গগুলিকে দুর্বল করবে। তাতে ধর্ম যাই বলুক না কেন। কিছু কাল এমন হবে যে, মানুষ ধর্ম এবং বাস্তব জীবনকে দুটো কম্পার্টমেন্টে ভাগ করে নেবে। ধর্ম পালন করার সময়ে ধর্ম করবে, আবার জীবন পালন করার সময়ে আধুনিকতাকে মেনে নেবে। ধর্ম এবং জীবনের মধ্যে এক ধরনের আপোশ করে নেবে। যেমন, এখন পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে লক্ষ্য করা যায়। এমন কি, অল্পবিস্তর লক্ষ্য করা যায় মধ্যপ্রাচ্যে।

ধর্ম অত্যন্ত শক্তিশালী একটি বিশ্বাস। এই শিক্ষা অস্থিমজ্জায় মিশে থাকে। ভেতর থেকেই সে আমাদের শাসন করে। তার বিধানকে অগ্রাহ্য করা অথবা অবহেলা করা তাই আদৌ সহজ নয়। কিন্তু তাই বলে ধর্ম চিরকাল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। সব ধর্মের দিকে তাকিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, তাতে ধীরে ধীরে কমবেশি পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। তাই ধর্ম যতোই শক্তিশালী হোক, সে সময়ের ঘড়িটাকে আটকে রাখতে পারবে না, অথবা যে-নারী একবার মুক্ত হাওয়ার স্বাদ পেয়েছে, তাকেও ফের বদ্ধ অন্ধকার ঘরে বন্দী করতে পারবে না।

৮
নর-বানর

রবীন্দ্রনাথ আপসোস করে লিখেছিলেন: "আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে ...।" আমি অদ্দূর পেছনে যেতে চাইনে। আপাতত, তাই বলতে পারি, আমি যদি জন্ম নিতাম ডারউইনের কালে ...। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, আমি তা হলে কী করতাম ? না, না, আমি কিছুই করতাম না। তবে ডারউইনের মস্ত লাভ হতো। তাঁর তত্ত্ব নিয়ে আজও যে-বিতর্ক আছে, তা আদৌ থাকতো না।

একেবারে যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা বললেও, বিবর্তনবাদ প্রমাণ করা ডারউইনের পক্ষে মোটেই সহজ ছিলো না। অন্তত গবেষণাগারে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিশিয়ে পানি তৈরি করে দেখানোর মতো অতো সহজ ছিলো না। তাই তিনি যেসব প্রমাণ দিয়েছেন, তাকে অনেকে অকাট্য বলে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর জীবদ্দশাতেই অনেকে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা তো তাঁকে রীতিমতো ধর্মবিদ্বেষী বলেও ফতোয়া দিয়েছেন। তারপর চলে গেছে দেড় শো বছর। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। তা সত্ত্বেও আজও অনেকে তাঁর তত্ত্ব মানতে চান না। আসলে, হাতে-কলমে তিনি প্রমাণ করতে পারলেন না যে, বিবর্তনের মধ্য দিয়েই বানরের মতো একটা জীব নরে পরিণত হয়েছে। এর কারণ, তিনি এমন কোনো নর অথবা বানরের দৃষ্টান্ত হাজির করতে পারলেন না, যাকে দেখে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে, হ্যাঁ, এ জন্তু অর্ধ-নর, অর্ধ-বানর। অর্থাৎ নর এবং বানরের মাঝখানকার হারিয়ে-যাওয়া সূত্র— ইংরেজিতে যাকে বলে মিসিং লিঙ্ক— তার সন্ধান তিনি দিতে পারেননি। কিন্তু আমি যদি তাঁর সমসাময়িক হতাম, তা হলে তিনি অনায়াসে আমাকে হাজির করে তাঁর তত্ত্বের প্রতি সবার সমর্থন আদায় করতে পারতেন! আমাকে যাঁরা দেখেছেন, আশা করি তাঁরা একবাক্যে বানরের সঙ্গে আমার সাদৃশ্যের কথা স্বীকার করবেন। সে যাই হোক, আমা-বিহনে ডারউইন মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন আর অন্যরা ১৮৭১ সালে বানর-রূপী ডারউইনের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে তাঁর বক্তব্য যে ঠিক নয়, সেটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন।

মোরগের জন্ম আগে, না ডিমের জন্ম আগে— তা নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে অনেক তক্কো হয়ে থাকে। কেবল মোরগ আর ডিম নয়, জানোয়ার-শ্রেষ্ঠ মানুষেরা কোথা থেকে এলো, তা নিয়েও বচসা শুরু হয় খৃস্টের জন্মের আগে থেকেই। কিন্তু এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব ডারউইন এবং অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের আগে পর্যন্ত কেউ দিতে পারেননি। এমন কি, এঁরা দুজন তত্ত্ব দেওয়া সত্ত্বেও এই বিতর্ক থেকেই গেলো।

১৮৫৬ সালে— ডারউইন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বাইরে থেকে জীবজন্তুদের চেহারা যতোটা ভিন্ন রকমের দেখায়, তাদের দেহের মূল কাঠামো অতোটা ভিন্ন নয়। গোড়ায় এই কাঠামো ছিলো কমবেশি একই রকমের। তারপর কোটি কোটি বছর ধরে ধীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারা এখন নানা রকম প্রজাতি এবং জীবজন্তুতে পরিণত হয়েছে। তা সত্ত্বেও তাদের শরীরের মূল কাঠামো বিশ্লেষণ করলে এখনো সেই সাদৃশ্য খানিকটা চোখে পড়ে। চারটি একেবারে ভিন্ন ধরনের জন্তু দিয়ে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে— মাছ, পাখি, মানুষ এবং ঘোড়া। তাদের চেহারা, ফলাফেরা এবং জীবনযাত্রার মধ্যে কোনো মিল নেই। মাছের হাত-পা নেই এবং তারা বাস করে পানিতে। পাখিরও হাত নেই এবং তারা উড়তে পারে। মানুষ চলে দু পায়ে। আর ঘোড়ার আছে চারটি পা— হাত নেই। কিন্তু এদের কঙ্কালগুলো পাশাপাশি রাখলে এদের দেহের মৌলিক কাঠামোতে একটা অত্যাশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যাবে। মাথা, গলা, বুক, পেট, পা ইত্যাদিতে।

বিবর্তনবাদীদের যুক্তি হলো: কোটি কোটি বছর ধরে মাছ পানিতে বাস করায় তার পায়ের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তাই তাদের পা নেই। কিন্তু শরীরের যেখানটাতে পা থাকার কথা ছিলো, সেখানে এখনো রয়ে আছে পায়ের দুটি চিহ্ন। পাখিরা উড়ে বেড়ায় বলে তাদের মানুষের মতো ছোটো হাত থাকলে চলে না। সে জন্যে তাদের হাত দুটোই বড়ো পাখায় পরিণত হয়েছে। মানুষ দু পায়ে চলে বলে তার হাত দুটো ঘোড়ার সামনের পা দুটোর মতো নয়। ঘোড়ার মতো তার লেজেরও দরকার নেই। তাই তার লেজটা খসে পড়েছে। কিন্তু যেখানে লেজ থাকার কথা ছিলো, সেখানে এখনো লেজের গোড়াটা রয়ে গেছে। (তা ছাড়া, লেজ না-থাকলেও মাঝেমধ্যে এক-একটা কারণে মনুষ্যত্ব ঘুচে গিয়ে তার অদৃশ্য লেজটা বেরিয়ে পড়ে।)

ডারউইনের মতে, আদিম অবস্থায় জন্তু-জানোয়ারের সূচনা হয়েছিলো এক অথবা একাধিক কোষ দিয়ে। তারপর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারা বর্তমান শারীরিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। মানুষের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় যে, এখন মানুষ দু পায়ে চলাফেরা করলেও, সুদূর অতীতে তা করতো না। তখন তারা চলতো চার হাত-পায়ে। সেই হোমো হাবিলিস পর্যায়ের পর তারা যখন খাড়া হয়ে চলতে আরম্ভ করলো, সেই পর্যায়ের মানুষকে বলা হয় হোমো ইরেক্টাস। তারপর এখন থেকে প্রায় দু লাখ বছর আগে তারা পরিণত হয় হোমো সেপাইনসে। সেই হোমো সেপাইনস-ই আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ।

বানরও কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের বানরে পরিণত হয়েছে। তার অর্থ অবশ্য দাঁড়ায় এই যে, নর এবং বানরের মধ্যে চেহারার মিল থাকলেও তারা এক জন্তু নয়। বানর থেকে নরের উদ্ভব হয়নি। এমনি কি, শিম্পাঞ্জি, গরিলা এবং ওরাং ওটাংকে ঢালাওভাবে বানর বলা হলেও তারাও এক প্রজাতির জন্তু নয়। বানরের যেমন নানা রকমের প্রজাতি আছে, অতীতে মানুষেরও তেমনি

একাধিক প্রজাতি ছিলো। যেমন, নিয়্যান্ডারটাল মানুষ পঞ্চাশ হাজার বছর আগেও বেঁচে ছিলো। তারপর মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে তারা তাদের আলাদা অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। হবিট নামের খুদে মানুষও ছিলো মানুষেরই আর-একটি প্রজাতি। পঁচিশ হাজার বছর আগেও তারা জীবিত ছিলো।

বিজ্ঞান যাই বলুক না কেন, শাস্ত্রে কিন্তু মানুষের জন্ম হয়েছে বিবর্তনের মাধ্যমে— তা বলা হয়নি। বস্তুত, ধর্মগুরুরা বলেছেন, সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি। কেউ বা বলেছেন, ঈশ্বর বললেন, হও! অমনি হয়ে গেলো। কেউ বলেছেন, ঈশ্বর তাবৎ সৃষ্টি শেষ করলেন সপ্তাহ খানেকের মধ্যে। কেউ বললেন, ঈশ্বর এক বারেই নিখুঁত মানুষ এবং অন্য জন্তুদের সৃষ্টি করে পৃথিবীতে ফেলে দিলেন। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং আধুনিক জীবজন্তুদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের এখন যেমন দেখা যায় হুবহু সেই চেহারায়। বিবর্তনের ধারণা ধর্মশাস্ত্রে নেই। শাস্ত্রমতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও বিবর্তন হচ্ছে না— যদিও হাবল টেলিস্কোপ দিয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এখনো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্প্রসারিত হচ্ছে প্রচণ্ড গতিতে।

শাস্ত্রে এমনও বলা হয়েছে যে, সব জীবজন্তুই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের ভোগে লাগবে বলে। কুতার্কিকরা অবশ্য কিছুই এ কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে চান না। তাঁরা বলেন, এ কথা সত্য হলে, মানুষের জন্মের কোটি কোটি বছর আগে ডাইনোসরের জন্ম হলো কেন ? অথবা আজও যদি ডাইনোসর থাকতো, তা হলে তারা মানুষের কোন কাজে লাগতো ? হাল আমলের মশা, মাছি, ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস এসবই বা কোন কাজে লাগে ? শাস্ত্রকারেরা এর ব্যাখ্যা দেননি। সে জন্যে অবিশ্বাসীদের মনে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়।

সত্যি বলতে কি, শাস্ত্রে সৃষ্টিরহস্যের যে-ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, বিজ্ঞান দিয়ে তা সমর্থন করা যায় না। ঐতিহাসিক প্রমাণও তার উল্টোটাই বলে। যেমন, শাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের বয়স বড়োজোর দশ হাজার বছর। অথচ মানুষের তৈরি যেসব হাতিয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গেছে, এমন কি, গুহার ভেতরে মানুষের আঁকা যেসব চিত্র পাওয়া গেছে, তার বয়স দশ হাজার বছরের অনেক বেশি। তাদের কোনো কোনো হাতিয়ার কয়েক লাখ বছরের পুরোনো।

প্রশ্ন করতে পারেন, এতো কাল পরে হঠাৎ বিবর্তনবাদ এবং সৃষ্টিতত্ত্বের বিতর্কের কথা তুলছি কেন ? তুলছি, বিজ্ঞানের প্রমাণ অগ্রাহ্য করে চার দিকে পেছনের দিকে যাওয়ার যে-উন্মত্ত প্রয়াস দেখা যচ্ছে, তা দেখে। ইন্দোনেশিয়া থেকে আলাস্কা, আর্জেন্টিনা থেকে ভ্লাডিভস্টক পর্যন্ত সর্বত্র এক দল মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রবল হুজুগ। ধর্মগুরুরা বিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করেছেন একেবারে প্রাচীন কাল থেকেই। সে জন্যে যখনই শাস্ত্রের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ দেখা দিয়েছে, তখনই ধর্মগুরুরা বিজ্ঞানের পরীক্ষিত জ্ঞানকে অস্বীকার করেছেন, আর বিজ্ঞানীদের নিন্দা জানিয়েছেন।

এক সময়ে জনপ্রিয় বিশ্বাস ছিলো যে, সূর্য ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে। কিন্তু ষোলো শতকের প্রথম ভাগে কোপারনিকাস যখন তার উল্টোটা বললেন, তখন তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলেন। শোনা যায়, তেরো বছর অপেক্ষা করার পর মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁর গ্রন্থ দেখতে পান। গেলিলিওর ভাগ্য ছিলো আরও খারাপ। তিনি যখন কোপারনিকাসের তত্ত্ব সমর্থন করলেন এবং দাবি করলেন যে, পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে নয়, তখন পোপ সেটা মানতে পারলেন না। ফলে তাঁকে বাকি জীবন কাটাতে হয় গৃহবন্দী. হিশেবে। কোনো কোনো শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সূর্য রাতের বেলায় গিয়ে সৃষ্টিকর্তার সিংহাসনের তলায় বিশ্রাম নেয়। পরের দিন ভোরে সে আবার তার দায়িত্ব পালনের জন্যে নিজের জায়গায় ফিরে যায়। এই ব্যাখ্যার মধ্যেও পৃথিবী স্থির থাকার ইঙ্গিত রয়েছে। কোনো কোনো ধর্মে এমনও বলা হয়েছে যে, পৃথিবী গোলকের মতো নয়, পৃথিবী হলো সমতল ভূমির মতো। এসব কথা মেনে নিলে আমাদের মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প থাকে না।

জ্ঞানবিজ্ঞানের যথেষ্ট অগ্রগতির পরে ডারউইন যে বিবর্তনবাদের তত্ত্ব দিয়েছিলেন, রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ প্রায় এক শো বছর পর্যন্ত তার সরাসরি কোনো প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু তারপর ১৯৫০ সালে পোপ ফতোয়া দেন যে, বিবর্তনবাদ মেনে নিলে মানুষকে ছোটো করা হয়। তবে বিজ্ঞানের অসাধারণ আবিষ্কারের কথা পোপ জানতেন। তাই তিনি নিজেও সৃষ্টিতত্ত্বকে আক্ষরিকভাবে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন, সৃষ্টিতত্ত্বকে মেনে নিতে হবে প্রতীকী অর্থে।

পশ্চিমা বিশ্বের স্কুল-কলেজে সৃষ্টির রহস্য বোঝার জন্যে বিবর্তনবাদ পড়ানো শুরু হয়েছিলো। কিন্তু পোপ এই ফতোয়া দেওয়ার পর থেকে রোম্যান ক্যাথলিক এবং ইভ্যানজেলিকাল (তবলিগীদের মতো) খৃস্টানরা বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করেন। জন হুইটকম্ব এবং হেনরি মরিসের মতো শিক্ষিত ব্যক্তিও সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে নতুন করে গ্রন্থ রচনা করেন। সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করার জন্যে একাধিক সংগঠনও প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়: সৃষ্টিতত্ত্বকে প্রচার করে তাকে জনপ্রিয় করা। ১৯৮১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্কেনসতে একটি আইন পাশ হয়, যাতে বিবর্তনবাদ পড়ানোর সময় সৃষ্টিতত্ত্বের জন্যেও সমান সময় ব্যয় করার বিধান থাকে। কিন্তু এই আইন বাতিল হয়ে যায় আদালতে। পরে লুইসিয়ানায়ও অনুরূপ একটি আইন প্রণীত হয়। কিন্তু এ আইনও সুপ্রিম কোর্টে বাতিল হয়। বস্তুত, ষাটের দশক থেকে অনেক জায়গাতেই সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতি একটা নতুন উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব বাংলায়ও এ সময়ে বরকাতুল্লাহ নামে একজন লোক সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে— এই মতবাদ প্রচার করে বই লিখেছিলেন। তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে কয়েকজন লোকের সামনে তাঁর হাস্যকর বক্তব্য পেশ করতে শুনেছিলাম।

তা সত্ত্বেও, ১৯৬০-এর দশকেই এই পেছনে ফিরে যাওয়ার আন্দোলন অতো জোরালো হতে পারেনি। কিন্তু সম্প্রতি সারা বিশ্বে যে-মৌলবাদী চেতনা সুনামির

মতো ছড়িয়ে পড়েছে, তার প্রভাবে অ্যামেরিকার মতো জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত দেশেও বিবর্তনবাদ বর্জন করে সৃষ্টিতত্ত্ব পড়ানোর দাবি উঠেছে। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে রক্ষণশীল মনোভাব প্রচার করার এই ধরনের মনোভাব ভারতীয় উপমহাদেশেও লক্ষ্য করা যায়। ভারতে বিজেপির পৌরোহিত্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী মনোভাব থেকে পাঠ্যপুস্তক সংস্কার করার সরকারী উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাংলাদেশেও এর প্রবল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ধর্মশিক্ষা নয়, তেমন বইয়ের গোড়াতেও থাকে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা— ধান ভানতে শিবের গীতের মতো। ১৯৭১ সালে যে-দেশ গড়ে উঠেছিলো ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তির ওপর, সেই দেশই মুসলিম জাতীয়তাবাদী ভাবনার জোয়ারে প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষণশীল করে তুলেছে। এর জন্যে পাঠ্যপুস্তকে মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তা ছাড়া, সরকারী এবং বিদেশী অর্থে গড়ে ওঠে হাজার হাজার মাদরাসা।

মুশকিল হলো: সৃষ্টিতত্ত্ব মানলে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে কেউই অস্বীকার করতে পারছেন না। সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসীরাও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগান তাঁদের মধ্যযুগীয় বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে। তাই একই সঙ্গে পাশাপাশি চলছে রক্ষণশীলতা এবং পুস্তকী বিজ্ঞানের চর্চা। যে-শিক্ষার্থী বিশ্বাস করে সৃষ্টিতত্ত্বে, সে-ই আবার অভিসন্দর্ভ লেখে বিবর্তনবাদ নিয়ে। বিজ্ঞান মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশ করে; আর জীবনাচরণের জন্যে মুখ ফেরায় শাস্ত্রের দিকে।

সৃষ্টিতত্ত্ব পড়ানোর ফলে রাতারাতি মানব সভ্যতা মধ্যযুগে ফিরে যাবে— এটা মনে করার কারণ নেই। কিন্তু এই মধ্যযুগীয় মূল্যবোধের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকানোর প্রবণতা একটা মনোভাবের ইঙ্গিত দেয়। সেই মনোভাব আধুনিকতা, উদারতা, ইহলৌকিকতা এবং প্রগতির বিরোধী। কিন্তু আমার মনে হয়, এই প্রবণতা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের একটা সাময়িক জলোচ্ছ্বাস মাত্র। বেশি দিন থাকবে না। কারণ, আমাকে না-পেয়ে ডারউইন মহাশয়ের যে-অসুবিধে হয়েছিলো, সেটা জন্তুদের বাহ্যিক কাঠামোর সাদৃশ্য দেখানো ব্যাপারে। কিন্তু এখন জীনতত্ত্ব দিয়ে অনেক দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করা যাচ্ছে যে, মানুষ আর কেঁচো যে-বস্তু দিয়ে তৈরি তা প্রায় একই। মানুষের সঙ্গে একটা ওরাং ওটাং-এর মিল আরও বেশি— শতকরা নিরানব্বুই ভাগ। এমন প্রমাণের মুখে পেছনে ফিরে যাওয়ার মনোভাব চিরদিন টিকে থাকবে না; টিকে থাকতে পারে না।

৯

আল্লাহ্ হাফেজ

বেইজিং-এ অথবা মস্কোতে বৃষ্টি হলে অনেক কমিউনিস্ট নাকি ঢাকা-কলকাতায় ছাতা খোলেন। তার কারণ, কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি তাঁদের অতিভক্তি। তেমনি ইদানীং ধর্মের নামে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি অনেকের আনুগত্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যে-পুণ্যলোভাতুর ঠিকাদার অসৎভাবে এন্তার টাকা করছেন, তিনি বেশি পুণ্য লাভের আশায় গরু কোরবানি না-দিয়ে উট কোরবানি দেওয়ার কথা চিন্তা করেন। অর্থাৎ ধর্মের আদর্শ অনুসারে সৎ না-হলেও, আনুষ্ঠানিকতায় এঁরা কেবলামুখী। এই মনোভাব থেকেই সম্প্রতি দেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের প্রতি হিড়িক পড়ে গেছে। তা না-হলে জন্মে কোনো দিন ঈদে মিলাদুন্নবীতে শোভাযাত্রা দেখিনি। কিন্তু এখন গাঁটকাটাদের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জাঁকজমকও তেমন বৃদ্ধি পেয়েছে।

সত্য কথা বলা শক্ত। জীবনে সৎ থাকাও শক্ত। বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা আরও শক্ত। কিন্তু পড়শির ঘাড় মটকে তার সম্পত্তি দখল করবো— এ কথা চিন্তা করতে করতে এক বেলা ধর্মীয় আচার পালন করা সহজ। জীবনাচরণে পুণ্যের পথে চলা কঠিন। কিন্তু ঘুষ খেয়ে তীর্থস্থান ঘুরে আসা সহজ। ধর্মের স্পিরিট নয়, বরং আনুষ্ঠানিকতা পালনের প্রতি এই যে আগ্রহ বৃদ্ধি— তার প্রতিফলন ঘটছে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার একটি গল্প আছে— শওকত ওসমানের— কাঁকড়মণি। চালের মধ্যে পাথর মিশিয়ে বিক্রি করছে এক দোকানদার। খদ্দের তাতে আপত্তি করলে, দোকানদার বললো: এ পাথর খোদ আরব দেশ থেকে আনা। খেলে পুণ্য হবে। বর্তমান অবস্থা সে রকমই।

যখন ঢাকা হলে থাকতাম, তখন সেখানে একটি প্রেয়ার রুম ছিলো নীচ তলায়। কিন্তু সেখানে কেউ প্রার্থনা করতে যেতেন বলে দেখিনি। এখন সেই ঢাকা হলে মসজিদ হয়েছে। ভালো কথা। এ থেকে বোঝা যায় যে, যাঁরা ধর্ম পালন করেন, তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাই বলে সৎ মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, এটা কেউ বলতে পারবেন না। বরং হাইজ্যাকার, চাঁদাবাদ, সন্ত্রাসী, দলীয় টাউট, নকলবাজ, বেয়াদব বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে— খবরের কাগজ খুললেই তার প্রমাণ মেলে।

ধর্মের মূলের দিকে ফিরে যাওয়ার একটা প্রবণতা সাম্প্রতিক কালে দেখা দিয়েছে প্রবলভাবে। সহজ বাংলায় এটা হলো মৌলবাদী মনোভাবের প্রতিফলন। এই মনোভাব থেকে বাংলা বা ফারসি ভাষার বদলে আরবি ভাষা ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিলো ফারসি ভাষায়। সে জন্যেই সালাত, রমজান, আল্লাহ, রসুল, জান্নাত এবং জাহান্নামের বদলে বঙ্গদেশে বলা হয়

নামাজ, রোজা, খোদা, পয়গম্বর, বেহেস্‌ৎ এবং দোজোখ। কিন্তু এখন খোদা শব্দ দিয়ে আর পরম ঈশ্বরের নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই তাঁকে ডাকতে হচ্ছে আল্লাহ নামে।

আমার ছাত্র জীবনে— অর্থাৎ ৬০-এর দশকের গোড়ায় বিদায়ের সময় কাউকে "খোদা হাফেজ" বলতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু পাকিস্তানীকরণের ফলে ধীরে ধীরে খোদা হাফেজের মতো ধর্মীয় বিদায় সম্ভাষণ জনপ্রিয় হতে থাকে। তারপর তা সার্বজনিক সম্ভাষণে পরিণত হয় ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে। স্বাধীন হওয়ার পর যে-নব্য সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয়, তারই অন্য পিঠে ছিলো মৌলবাদী আন্দোলন। মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোডলারের আনুকূল্যে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে দেশে যে ধর্মপ্রচার শুরু হয়, তার ফলে ধর্মীয় পরিভাষা যদ্দুর সম্ভব আরবীমুখী হতে থাকে। এরই প্রভাবে খোদার আসনে বসলেন আল্লাহ। শুধু খোদার নামই নয়, মানুষের ফারসি নামের জায়গাও দখল করলো নব্য-আরবী নাম। এমন কি, রাতারাতি বহু লোকের নামের সঙ্গে লেজুড়ের মতো যুক্ত হলো ইবনে, বিনতে। ষাটের দশকে বাংলা নাম রাখা একটা ফ্যাশানে পরিণত হতে আরম্ভ করেছিলো। সত্তরের দশকে তা-ও জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ হাফেজ এই প্রক্রিয়ারই একটা অংশ।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: এর পেছনে কী কী মনোভাব থাকতে পারে?— হতে পারে এঁরা ভাবেন আল্লাহ বলে ডাকলে সেটা সৃষ্টিকর্তার কাছে বেশি আবেদন সৃষ্টি করবে; দুই. ফারসি (এবং বাংলা) আল্লাহ বুঝতে পারেন না; তিন. সমাজতাত্ত্বিক কারণ— আভিজাত্য দেখানোর প্রয়াস। সমাজতত্ত্বের পরিভাষায় একে বলা হয় সংস্কৃতায়ন।

আল্লাহ যদি সব কিছু সৃষ্টি করে থাকেন, তা হলে বাংলা, ইংরেজি, হিব্রু, চায়নীজ, তামিল, তেলেগু— সব ভাষাই তো তাঁর বোঝার কথা। বস্তুত, একজন বাঙালি যদি বলেন, হে পরম করুণাময়, হে দয়াময়— সেটা নিশ্চয় রহমানউর রাহীম বলার চেয়ে কম আন্তরিক নয়। বরং না-বুঝে ভালো ভালো মন্ত্র জপ করার চেয়ে বুঝে বলাই কি ভালো নয়?

আসলে যাঁরা খোদা হাফেজ না-বলে আল্লাহ হাফেজ বলেন, তাঁদের অনেকে বেশি পুণ্য হবে এই আশায় বলেন। কিন্তু আল্লাহ শব্দটির ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এটি ইসলামী শব্দ নয়। প্রাক-ইসলামী আমল থেকেই আরবি ভাষায় এ শব্দ চালু ছিলো। সবচেয়ে প্রধান দেবতার নামই ছিলো আল্লাহ। অনেকেরই নামের অংশ ছিলো আল্লাহ। যেমন, ইসলাম ধর্ম প্রবর্তকের পিতার নাম ছিলো আবদুল্লাহ— আল্লাহর আবদুল। যাঁরা আল্লাহ হাফেজ-পন্থী তাঁদের ভোলা উচিত নয় যে, সে নামটা ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পরে তাঁকে দেওয়া হয়নি! বস্তুত, সর্বশক্তিমান স্রষ্টা বোঝাতে এই আল্লাহ শব্দটিকেই ইসলাম ধর্মে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং গোলাপকে আপনি যে-নামেই ডাকুন না কেন, সে সুগন্ধ দিতেই থাকবে। খোদা,

ঈশ্বর, গড— যে-নামেই ধার্মিক তাঁকে স্মরণ করুন না কেন, তাঁর শুনতে পাওয়ার কথা। বোঝারও কথা। যদি তিনি না-বোঝেন, তবে তিনি কিছুতেই সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ নন।

আল্লাহ্ হাফেজ শুনলে তাই আমার মনে তুলনামূলকভাবে বেশি ভক্তির উদয় হয় না, বরং ভয় হয় মৌলবাদীর সংখ্যা আরও একটি বেড়ে গেলো— এই চিন্তা থেকে। আমার এই আশঙ্কা ভুলও হতে পারে, কিন্তু এ যে অন্ধভাবে ধর্মীয় আচার পালন করার দৃষ্টান্ত, তাতে ভুল নেই।

সমাজবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বলেছেন যে, পাপের অন্য পিঠে থাকে ধর্ম। পাপ বোধ থেকেই নাকি ধর্মের উদ্ভব। এ নিয়ে এন্তার বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে যাবো না। কথাটা মনে পড়লো এ জন্যে যে, সম্প্রতি চারদিকে অসাধুতা, দুর্নীতি এবং অমানুষিক ক্রিয়াকাণ্ড যেমন দারুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা পালনের হুজুক। তা হলে পাপ আর পুণ্য কি হাত ধরাধরি করে এক সঙ্গে চলে ?

(*প্রথম আলো*, ২০০৬)

১০

ঈশ্বরের ভাষাজ্ঞান

প্রশ্নটা অনেক সময়ে আমার মনে জেগেছে— কিন্তু তাই বলে খবরের কাগজে ছাপিয়ে উচ্চকণ্ঠে চিন্তা করিনি। প্রশ্নটা হচ্ছে: ঈশ্বর কি সব ভাষা বোঝেন? এ প্রশ্ন আমি বিশেষ কাউকে জিজ্ঞেসও করছিনে। কারণ উত্তরটা হয়তো সঠিক কারো জানা নেই।

প্রস্তাবনাটা এ রকম। আগে যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনকার তুলনায় অনেক খারাপ ছিলো, তখন পৃথিবীতে ভাষা ছিলো এখনকার চেয়ে অনেক বেশি। এক-একটা ছোটো-ছোটো অঞ্চলের এক-একটা ভাষা। এক-একটা ছোটো-ছোটো জনগোষ্ঠীর এক-একটা ভাষা। অপর পক্ষে, এখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া সহজ হয়েছে। এক জায়গার ভাষা অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়াও সহজ। এমন কি, বইপত্র এবং বেতার-টেলিভিশনের কল্যাণে এখন কতোগুলো ভাষা বড়ো বড়ো অঞ্চলের প্রামাণ্য ভাষায় পরিণত হয়েছে। বস্তুত, বই এবং সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে প্রধান ভাষাগুলো আরও প্রবল হয়ে উঠছে, আর তার ফলে মার খাচ্ছে ছোটো ভাষাগুলো। কোনো কোনো ভাষা একেবারে হারিয়েও যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও এখনো পৃথিবীতে ছ হাজারেরও বেশি ভাষা চালু আছে। প্রশ্ন হচ্ছে: এই ছ হাজার ভাষাই কি ঈশ্বর জানেন? এতোগুলো ভাষা শেখা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু তিনি যেহেতু গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং কল্পনাতীত শক্তির অধিকারী এবং সব ভাষাই তাঁর পক্ষে শিখে ফেলা সম্ভব। তা ছাড়া, তাঁর যে রকম জনবল, তাতে তাঁর পক্ষে বিভিন্ন ভাষার ইন্টারপ্রেটার অথবা দোভাষী রাখারও কোনো সমস্যা নেই। এতো বিশাল মহাবিশ্বে নতুন নতুন অফিস ভবন তৈরিরও কোনো সমস্যা নেই। তদুপরি, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন!

কিন্তু রসিকতা থাক। এমন উদ্ভট প্রশ্ন আমার মনে আসার কারণ কী? আপাতত দুটো কারণ বলছি। প্রথমটা হলো: পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মানবতা-বিধ্বংসী এতো সব প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে যে, তার মধ্যে অসহায় লোকেরা সারাক্ষণই নিজেদের বাঁচানোর জন্যে আকুল কণ্ঠে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন। কিন্তু ঈশ্বর যে তার কিছু মাত্র প্রতিকার করছেন, দেখে-শুনে তা মনে হয় না। তা থেকে এমন ধারণা হতেই পারে যে, তিনি নির্দয় অথবা তিনি এসব ভাষায় ডাকলে বুঝতে পারেন না। তবে নির্দয় আমি তাঁকে বলছিনে, কেননা সবাই তাঁকে দয়াময় বলেই জানেন। এতোগুলো লোক না-বুঝেশুনে তাঁকে কি এমন একটা বিশেষণ দিলেন! তা হতেই পারে না। তা হলে? বাকি থাকলো: অন্য সম্ভাবনাটি! অর্থাৎ তিনি সব ভাষা বোঝেন না। কিন্তু তাই বা মনে করি কি করে? ধর্মগ্রন্থগুলো একেবারে অসার না-হলে, যেসব ভাষায় এগুলো লেখা হয়েছে, তাঁর অন্তত সে ভাষাগুলো তো জানারই কথা! অথচ হিব্রু-ভাষী (যেমন

ইসরাইলের), আরবি-ভাষী (যেমন ইরাকের), সংস্কৃত-ভাষী— সব ভাষাভাষী লোকেদেরই দুঃখ-কষ্টের সীমা নেই। তাঁরা তারস্বরে হাহাকার করে কপাল চাপড়ে ঈশ্বরকে ডেকে ডেকে স্বরভঙ্গ করে ফেলছেন, কিন্তু ঈশ্বর তবু নির্বিকার!

এ থেকে আরও একটা সম্ভাবনা মনের কোণে উঁকি দেয়। সে হলো: ঈশ্বর সব ভাষাই বোঝেন, কিন্তু তিনি সব প্রার্থনা মঞ্জুর করেন না। তার উপায়ও নেই। চোর নিরাপদে চুরি করে ফিরে আসার প্রার্থনা জানায়, বাড়ির মালিক তাঁর সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যে প্রার্থনা করেন। হবু ধর্ষক সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে জিভ লক্‌লক্ করতে করতে সাফল্য লাভের জন্যে প্রার্থনা জানায়, মানত করে, আর সুন্দরী মেয়েটি এবং তার স্বজনরা সে যাতে নিরাপদে ফিরে আসতে পারে, আকুল হৃদয়ে তার প্রার্থনা জানান। এই দু পক্ষের প্রার্থনাই মঞ্জুর করা সম্ভব নয়। অথবা এমনও হতে পারে যে, বিশ্বে যা কিছু ঘটে, তা ঈশ্বরের অজ্ঞাতেই ঘটে। ঈশ্বর শুধু কল্পনা! মনকে সান্ত্বনা দেবার প্রতীক। বিপদে আপদে রোগে শোকে ঈশ্বর নামটি সাহস জোগায়। কিন্তু এমন নাস্তিকের মতো কথা বলে আস্তিকদের মনে আঘাত দিতে আমি চাইনে।

ধরে নিচ্ছি, ঈশ্বর সব ভাষা বোঝেন। প্রশ্ন করতে পারেন: তা হলে তিনি বিশেষ বিশেষ ভাষায় ধর্মগ্রন্থ পাঠালেন কেন? এর উত্তর খুব কঠিন নয়। ধর্মপ্রচার করেছেন যে মহাপুরুষরা তাঁরা তা করেছেন তাঁদের মাতৃভাষায়। কারণ, ঈশ্বর জানলেও এই মহাপুরুষরা সব ভাষা জানতেন না। অথবা তাঁরা যাঁদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করেছেন, তাঁরাও সব ভাষা জানেন না। তবে এ প্রশ্নের সহজ উত্তর থাকলেও যে-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত, তা হলো: ধর্মগুরু এবং ধর্মব্যবসায়ীরা এক-একটা ভাষাকে অন্যান্য ভাষার তুলনায় বেশি পবিত্র বলে দাবি করেন কেন? তাঁরা এমনভাবে এ দাবি করেন যা থেকে মনে হতেই পারে যে, সেই ভাষায় ঈশ্বরকে না-ডাকলে তিনি তার অর্থ বুঝতে পারবেন না অথবা সেই ভাষায় ডাকলে ঈশ্বর একটু বেশি সদয় হবেন।

ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিলো আরব দেশে। এবং তখনকার আরবি ছিলো প্রাচীন আরবি। তা সত্ত্বেও বিশ্বের তাবৎ মুসলমান ঈশ্বরকে ডাকেন সেই প্রাচীন আরবি ভাষায়। ভাবখানা এমন যে, আরবিতে না-ডাকলে তিনি শুনবেন না, অথবা আরবিতে ডাকলে তাতে তিনি বেশি প্রসন্ন হবেন। পোপ তাঁর ধর্ম প্রচার করেন ল্যাটিন ভাষায়। ল্যাটিন ভাষায় খৃস্টধর্ম প্রচারিত হয়নি। তা সত্ত্বেও ল্যাটিন ভাষায় বাইবেল আবৃত্তি করলে অথবা বাইবেলের বাণী প্রচার করলে বেশি পুণ্য হবে বলে মনে করেন অনেক খৃস্টান। বেদ-উপনিষদ লেখা হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। আধুনিক বাঙালিরা সংস্কৃত জানেন না। পুরুতরাও কমই জানেন। আর যে-উচ্চারণে তাঁরা সংস্কৃত আওড়ান তাতে শতায়ু হওয়ার আশীর্বাদ হতায়ু হওয়ার অভিশাপে পরিণত হয়। অর্থাৎ হিতে বিপরীত হয়। সুতরাং ধ্রুপদী ভাষার দেয়াল তুলে ধর্মকে সাধারণ মানুষের নাগাল থেকে দূরে রাখার কারণটা কী?

কারণের কথায় পরে আসি। তার আগে ইতিহাসের দিকে এক ঝলক তাকানো যাক। বেদ-উপনিষদ আবৃত্তি করতে হবে সংস্কৃত ভাষায় এবং তা করতে পারবেন

একমাত্র ব্রাহ্মণরা— এই ছিলো হিন্দুধর্মের বিধান। তাই ধর্মগ্রন্থ দেশীয় ভাষায় শুনলে অথবা শোনালে তার শাস্তি হিশেবে নির্ধারিত হলো রৌরব নরকে গমন। অর্থাৎ ধর্মচর্চা করবেন ব্রাহ্মণরা, অন্যরা কেবল তাঁদের ব্যাখ্যা এবং অমৃতবাণী শুনেই ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে তাঁদের অষ্টাঙ্গে প্রণাম করবেন। তাঁদের দক্ষিণা দেবেন। গৌতম বুদ্ধ এটা মানতে পারেননি। তিনি তাই ধর্ম প্রচার করেছিলেন মুখের ভাষা পালিতে। এভাবে তাঁর ধর্ম আলাদা হয়ে গেলো বৈদিক ধর্ম থেকে।

খৃস্টধর্মের সে অর্থে কোনো প্রেরিত গ্রন্থ নেই। তবে যিশু খৃস্টের বাণী তাঁর শিষ্যরা প্রচার করেছিলেন হিব্রু ভাষায়। কিন্তু কালে কালে খৃস্টধর্মের ভাষা হিশেবে দাঁড়িয়ে গেলো ল্যাটিন। কারণ, রোমে অবস্থিত পোপ হলেন খৃস্টধর্মের প্রধান নেতা। পোপরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ল্যাটিন ভাষায় খৃস্টধর্ম প্রচার করেছেন। তার ফলে সে ধর্ম দূরে সরে যায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। ধর্ম প্রাত্যহিক জীবনের আচরিত বস্তু না-হয়ে পরিণত হয় একটা দুর্বোধ্য রহস্যে। ধর্মচর্চার অধিকার এবং ব্যবসা সীমিত থাকলো পুরুতদের মধ্যে। মার্টিন লুথার সেটা ভাঙতে চেষ্টা করলেন। তিনি প্রথমেই বাইবেলের অনুবাদ করলেন সাধারণ মানুষের ভাষায়। তিনি রহস্য উন্মোচন করে বাইবেলের বক্তব্য তুলে ধরলেন সাধারণ মানুষের কাছে। ফলে ফতোয়া দিয়ে পোপ তাঁকে বহিষ্কার করলেন খৃস্টধর্মের আওতা থেকে। মধ্যযুগের বাঙালি কবি সৈয়দ সুলতান ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন বাংলা ভাষায়, এবং এটা অনেকে ভালো চোখে দেখেননি। তাঁর রচনা থেকে জানা যায় যে, তাঁকে অনেকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন, যদিও তিনি ধর্মের বাণী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই বাংলায় ধর্মের কথা লিখেছিলেন।

সারা পৃথিবীর মুসলমানরা মনে করেন যে, তাঁদের ধর্মীয় ভাষা হলো আরবি। পৃথিবীর যেখানেই তাঁরা বাস করেন না কেন, তাঁরা ধর্ম পালন করেন আরবি ভাষায়, বেশির ভাগই না-বুঝে। যেখানটায় হয়তো বলা হয়েছে কোন্ কোন্ মহিলাকে বিবাহ করা যাবে না— না-বুঝে সে কথা শুনেই হয়তো ধর্মভীরু মোমিন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। অথচ ধর্মগ্রন্থের মূল বিধান তাঁদের কাছে রয়ে যায় অজানা। অনেক সময়ে তাই কুসংস্কারকেও তাঁরা গণ্য করেন ধর্ম বলে।

মোট কথা, কোনো বিশেষ ভাষাকে পবিত্র বলে বিবেচনা না-করে সাধারণ মানুষের ভাষায় যদি ধর্মের বাণী প্রচার করা হয়, তা হলে চোরে না-শুনলেও, সাধারণ ভক্ত শুনতে এবং খানিকটা বুঝতে পারবেন। এমন কি, সে বাণী থেকে কিছু শিক্ষা হয়তো বাস্তব জীবনে গ্রহণও করতে পারেন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এ যদি তাঁরা সত্যি বিশ্বাস করেন, তা হলে, সেই ঈশ্বর নিশ্চয় সব ভাষাই বুঝতে পারবেন। তা হলে এই সত্য আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে, কোনো ভাষা পবিত্র অথবা অপবিত্র নয়— সব ভাষাই আসলে কেবল ভাব প্রকাশের বাহন।

(*যুগান্তর*, ২০০৬)

১১
শহীদের অপমৃত্যু

সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ :

একজন রাজাকার (সুশান্তি বর্ষিত হোক তাহার উপর!)—
নামজাদা এক রাজাকার
অপঘাতে হয়েছেন, আহা রে, শহীদ ...

সত্যি সত্যি এখন প্রতিদিন যে-হারে শহীদ হচ্ছে সবাই, তাতে উপরের খবরটা হঠাৎ একদিন ছাপা হলে অবাক হওয়ার কারণ থাকবে না। এমন ঢালাওভাবে শহীদ কথাটা সম্প্রতি ব্যবহৃত হচ্ছে যে, এর তাৎপর্য তো নয়ই, কোনো অর্থই বাকি আছে কিনা, বলা শক্ত। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে শব্দটা অর্থবহ ছিলো, এখন কেবল অর্থহীন নয়, রীতিমতো দুর্বিষহ।

ইহুদী এবং খৃস্টান ধর্মে মার্টায়ার কথাটার অর্থ গোড়াতে ছিলো সাক্ষী— নিজের ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করার বদলে যে নিজের মৃত্যু অথবা হত্যা প্রত্যক্ষ করে অর্থাৎ তার সাক্ষী হয়, সে হলো মার্টায়ার। ইসলাম ধর্মে শহীদ কথাটা এসেছে এই ধারণা থেকেই। এবং প্রথমে এর অর্থ সাক্ষীই ছিলো— নিজের বিশ্বাসের জন্যে যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে মেনে নয়। অপর পক্ষে, হাদিসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার আদেশে ধর্মযুদ্ধে যে নিহত হয়, সে-ই হলো শহীদ। মহাযান বৌদ্ধধর্মে বোধিসত্ত্ব কথাটার সঙ্গেও শহীদের ধারণার খানিকটা যোগ রয়েছে। কিন্তু হিন্দু ধর্মে শহীদের ধারণা নেই। বাংলা ভাষাতেও না।

দোভাষী ইসলামী পুঁথি, বিশেষ করে মহররমের কাহিনী নিয়ে রচিত পুঁথির মাধ্যমে শহীদ শব্দটা প্রথম বারের মতো বাংলা ভাষায় ঢুকে পড়ে। একটি পুঁথির নামই যেমন শহীদে কারবালা। কিন্তু মূলধারার মুদ্রিত বাংলা সাহিত্যে শহীদ শব্দের ব্যবহার বিশ শতকের আগে হয়েছিলো কিনা, আমার জানা নেই। তবে ১৯০৫ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর রচনায় এ শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। তার বছর পনেরো/ষোলো পরে নজরুল ইসলামও এ শব্দ ব্যবহার করেন তাঁর রচনায়। এভাবে বাংলা ভাষায় ভীরু ভীরু পায়ে এ শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকলেও, এখন কারণে-অকারণে শহীদ কথাটার যথেচ্ছ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর ফলে কথাটার মাহাত্ম্য এবং ধার একেবারে ক্ষয়ে গেছে। এমন কি, লোপ পেয়েছে বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না।

১৮৬৬ সালে কানাইলাল শীল বাংলা ভাষার অন্যতম পুরোনো অভিধান— *শব্দার্থ রত্নমালায়* এ শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করেননি। তিনি সম্ভবত শোনেনওনি। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত রামকমল বিদ্যালঙ্কারের *সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধানেও* এ শব্দটা

নেই। এমন কি, ১৯১৩ সালে প্রকাশিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির শব্দকোষেও শহীদ শব্দটি অনুপস্থিত। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত সুবল মিত্রের অভিধানেও।

এ শব্দটি প্রথমবারের মতো অভিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় সম্ভবত ১৯১৬ সালে— জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাসের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে*। এ শব্দের সঙ্গে তিনি রোকেয়ার *মতিচূর* থেকে দৃষ্টান্তও দেন। ১৯৩০-এর দশকে সংকলিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধান— *বঙ্গীয় শব্দ কোষেও* আছে এ শব্দটা। কিন্তু তাতে এর অর্থ— যথার্থভাবেই— দেওয়া আছে: ধর্মের কারণে নিহত মুসলমান। ১৯৩৮ সালে আশুতোষ দেব তাঁর *নূতন বাঙ্গালা অভিধানে* শহীদ কথাটাই নয়, সেই সঙ্গে শাহাদাৎ কথাটাও অন্তর্ভুক্ত করেন। এবং শাহাদাৎ শব্দের সঠিক অর্থ দিয়েছেন: সাক্ষ্য।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা আশুতোষ দেব এই শব্দের সঠিক সংজ্ঞা দিলেও, তার আগেই কাজী নজরুল ইসলাম এ শব্দের অপব্যাখ্যা করেছিলেন। ১৯২২ সালের অগস্ট মাসে ধূমকেতু পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় ক্ষুদিরাম বসুর একটি ছবি ছাপিয়েছিলেন তিনি। ছবির জন্যে ছবি। তার সঙ্গে কোনো খবর, নিবন্ধ অথবা কবিতা ছিলো না। কেবল লেখা ছিলো "বাঙলার প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম"। নজরুলের উদ্দেশ্য ছিলো যাঁরা দেশের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, ছবির মধ্য দিয়ে তাঁদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা এবং অন্যদের তা দিয়ে অনুপ্রাণিত করা। এর আগে কোনো অমুসলমানকে কেউ শহীদ বলে আখ্যায়িত করেছেন বলে আমার জানা নেই। এমন কি, ধর্মযুদ্ধ ছাড়া অন্য কারণে নিহত কোনো ব্যক্তিকেও শহীদ বলে তাঁর ওপর গৌরব আরোপ করার দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তা সত্ত্বেও নজরুলের হাতে ক্ষুদিরাম শহীদ হয়ে যান। মুসলমান নজরুল ইসলামের হাতেই নয়, হিন্দু লেখকদের হাতেও ক্ষুদিরাম পরে এই বিশেষণে সম্মানিত হয়েছিলেন। যেমন, ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র ক্ষুদিরামের যে-জীবনী লিখেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন *শহীদ ক্ষুদিরাম*। কমলা দাশগুপ্তও ভারতকোষে ক্ষুদিরামের কথা লিখতে গিয়ে তাঁকে শহীদ আখ্যায়িত করেন।

মোট কথা, নজরুল ইসলাম নতুন অভিধায় শহীদ কথাটা ব্যবহার করার পর থেকে এ শব্দের মূল অর্থ পাল্টে যেতে থাকে। এর ব্যবহারও বৃদ্ধি পায় ক্রমবর্ধমান মাত্রায়। সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে তখন যাঁরা প্রাণ দিচ্ছিলেন, তাঁর ত্যাগকে গৌরবান্বিত করার জন্যে শহীদ কথাটাকে বিশেষ উপযোগী মনে হয় তখনকার লেখকদের। সন্ত্রাসবাদীরাও এই ঐতিহ্য বজায় রাখেন। এমন কি, তার পরে কমিউনিস্টরাও। বাংলা ভাষায় এর কোনো প্রতিশব্দ না-থাকায় হিন্দু লেখকরাও তাই এ শব্দটি অকাতরে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।

তবে এ শব্দটি পূর্ব বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর। আর পশ্চিমবঙ্গে ষাটের দশকে বামপন্থীদের কল্যাণে। ভাষা আন্দোলনের সময়ে একুশে এবং বাইশে ফেব্রুয়ারি যাঁরা পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন, (বেশির ভাগই নিজেদের অনিচ্ছায়), তাঁদের সবাইকে শহীদ আখ্যায়িত

করা হয়েছিলো। কোনো একজন তাঁদের এই বিশেষণ দেননি— সবার মুখে মুখেই ধীরে ধীরে তাঁরা শহীদে পরিণত হন। এই ঘটনা নিয়ে একেবারে প্রথম দিকে মাহ্‌বুব আলম অথবা আবদুল গফফার চৌধুরীর মতো যাঁরা কবিতা অথবা গান লিখেছিলেন, তাঁরা এ শব্দটি তখনই ব্যবহার করেননি। কিন্তু পরে এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

আসলে, ভাষা আন্দোলন যে-তীব্র ভাবাবেগের জন্ম দিয়েছিলো, সেই ভাবাবেগের পরিপ্রেক্ষিতেই তখনকার লেখক, সাংবাদিক, রাজনীতিক এবং সংস্কৃতিসেবীরা নিহতদের "শহীদ" শব্দ দিয়ে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন— যদিও এই নিহত ব্যক্তিরা বেশির ভাগই আন্দোলনে যোগ দেননি, স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন তো দূরের কথা। আমার ধারণা, শহীদ শব্দের ব্যবহার নিয়ে প্রথম দিকে খানিকটা দ্বিধা ছিলো। এই দ্বিধাটা এসেছিলো আরবি-ফারসির সঙ্গে বাংলার বিবাদ থেকে। সে জন্যেই দেখতে পাই প্রথম দিকের স্লোগানে জিন্দাবাদ না-বলে, বলা হতো অমর হোক। অসম্ভব নয় যে, বাংলা ভাষার কারণে যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের আরবি ভাষায় শহীদ বলা হবে কিনা, তা নিয়ে খানিকটা সংশয় দেখা গিয়েছিলো। কিন্তু যেহেতু এই আত্মত্যাগ বোঝানোর জন্যে বাংলায় কোনো জুৎসই শব্দ ছিলো না, সে জন্যে অল্পকালের মধ্যেই এটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

পশ্চিম বাংলায় যখন কমিউনিস্ট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ষাটের দশকে, তখন সেখানেও এই শব্দ ব্যহৃত হতে থাকে। তাঁরা যেমন নামের আগে বিদেশী কমরেড শব্দ দিয়ে নিজেদের চিহ্নিত করতেন, তেমনি এই আন্দোলনের জন্যে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁদের আত্মত্যাগকে গৌরাবান্বিত করার জন্যে বিদেশী শব্দ শহীদের স্মরাণাপন্ন হন। এর ব্যবহার এতো বৃদ্ধি পায় যে, একবার এক সম্ভাব্য আততায়ীর হামলায় জ্যোতি বসু এক হাতের কড়ে আঙুলে আঘাত পেলে পত্রিকায় লেখা হয়েছিলো হাফ-শহীদ জ্যোতি বসু।

অপর পক্ষে, ভাষা আন্দোলনের পরেও বাংলাদেশের একাধিক রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে এবং ১৯৭১ সালের আগে পর্যন্ত তাতে নিহতও হয়েছেন অনেকে। কিন্তু তাঁদের সবাইকে শহীদ আখ্যা দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ শহীদ উপাধি পেয়েছিলেন। যেমন, অধ্যাপক শামসুজ্জোহা এবং আসাদ। এঁদের দুজনের মৃত্যুই তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলনকে দারুণ উস্কে দিয়েছিলো। সে জন্যে, তাঁদের আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি জানানো হয়েছিলো শহীদ বলে। কিন্তু শহীদ দিবস বললে তখন একুশে ফেব্রুয়ারিকেই বোঝাতো। শহীদ মিনার বললেও একটি মিনারকেই বোঝাতো। প্রথম দিকে শহীদ কথাটা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত না-হওয়ার একটা পরোক্ষ প্রমাণ তখনকার ইংরেজি পত্রিকাগুলো। এতে তাঁদের ইংরেজিতে বলা হতো: মার্টায়ার। শহীদ দিবসকে বলা হতো: মার্টায়ার্স ডে। মোট কথা, শহীদ কথাটা তখনো বাংলাদেশের ইংরেজি পত্রিকায় চালু হয়নি।

শহীদ শব্দ দিয়ে যে-চরম আত্মবিসর্জনের কথা বোঝানো যায়, যে-আবেগের জন্ম দেওয়া যায়, কোনো বাংলা শব্দ দিয়ে তা যায় না। সুতরাং ভাষা আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের এই বিশেষণ দিয়ে চিহ্নিত করার যুক্তি বোঝা যায়। কিন্তু এ শব্দ তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর। যাঁরা এই যুদ্ধে অংশ নিতে গিয়ে হানাদার বাহিনী অথবা তাদের দালালদের হাতে নিহত হন, তাঁরা ধর্মের জন্যে না-হলেও দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন। সেদিক দিয়ে তাঁদের শহীদ বললে কথাটার পুরোপুরি অপব্যবহার করা হয় কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। অথবা যাঁরা বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বাস বজায় রাখতে গিয়ে স্বেচ্ছায় অথবা বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বাসের দরুন অনিচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন, তাঁদেরও শহীদ বলা হয়তো গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যাঁরা পাইকারী হত্যাকাণ্ডে সাধারণভাবে নিহত হন, তাঁদের শহীদ বলা যায় কেমন করে? বস্তুত, পাইকারী হারে এভাবে সবাইকে শহীদ আখ্যা দেওয়ার ফলে শহীদ কথাটা ৭২ সাল থেকে খানিকটা মূল্য হারিয়ে ফেলে— পশ্চিমবঙ্গের মতোই। কিন্তু পুরোপুরি নয়। পুরোপুরি যে নয়, সেটা বোঝা যায় শেখ মুজিবের দৃষ্টান্ত থেকে।

শেখ মুজিব ছিলেন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা— এখন জাতীয়তাবাদীরা (আসলে ভিন-জাতীয়তাবাদীরা) তাতে যা-ই বলুন না কেন। তাঁরই আহ্বানে সমগ্র জাতি স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করেছিলো— কোনো সেপাই বা সেনাপতির আহ্বানে নয়। কিন্তু সেই শেখ মুজিব যখন সেনাবাহিনীর উচ্চপদে নিয়োজিত কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় এবং কয়েকজন নিম্নপদস্থ সদস্যের সক্রিয় চেষ্টায় নিহত হলেন, তখন জাতির জনক হওয়া সত্ত্বেও শহীদ পদবী তাঁর ভাগ্যে জুটলো না।

এমন কি, তাঁর বছর ছয়েক পরে যখন জিয়াউর রহমান তাঁর সহকর্মীদের হাতে নিহত হলেন, তখনো তিনি সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হতে পারলেন না। কিন্তু কয়েক বছর পরে তাঁর নাম ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক ফয়দা লোটার কথা ভেবে বেশ হিশেব-নিকেশ করে তাঁর দলের নেতারা তাঁকে এই অন্যায্য উপাধি দেন। অন্যায্য বলছি এ জন্যে যে, সত্যি সত্যি তিনি ধর্মের জন্যে স্বেচ্ছায় প্রাণ দেননি। দেশের জন্যেও নয়। তিনি যেভাবে ক্ষমতায় এসেছিলেন, তাকেও সেরাতুল মুস্তাকিম তো দূরের কথা, ঠিক সহজ সরল পথ বলা যায় না। তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন সেনাবাহিনীর ভেতরকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে। নিহতও হয়েছিলেন সেনাবাহিনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে। নিহত হওয়ার আগেই তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর বিরুদ্ধে তেইশটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিলো। তাই তাঁকে কিভাবে শহীদ জিয়া বলা যায়, অথবা হাফ-আরবি ভাষা দিয়ে গৌরব আরোপ করে তাঁর মৃত্যুদিবসকে শাহাদাত বরণের দিন বলা যায়— বাংলাভাষী একজন মানুষ হিশেবে সেটা আমার মাথায় আসে না। তা-ও তিনি দেশের জন্যে ৭১-এ লড়াই করেছিলেন। বীর উত্তম উপাধি পেয়েছিলেন স্বাধীনতা-যুদ্ধে তাঁর অবদানের জন্যে। সুতরাং ন্যায়ত না-হলেও তাঁকে না-হয় শহীদই বলাই হলো।

কিন্তু ৮০-র দশক থেকে এ শব্দটা উল্কার গতিতে যেভাবে নিজের চরিত্র হারালো, তা দেখে শব্দটার দুর্ভাগ্যের কথাই মনে হয়। দেখে দুঃখ হয় যে, বেচারা "শহীদ" এক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে অকালে শাহাদত বরণ করলো!)

এখন যারা বাংলাদেশকে পাকিস্তানে পরিণত করার প্রকাশ্য সংগ্রামে অংশ নিচ্ছে, তারা তো বটেই, এমন কি, দালাল, আলবদর, পাড়ার মাস্তান, সন্ত্রাসী এবং চাঁদাবাজ-সহ যে-কোনো লোক অন্যের হাতে নিহত হলে কবর দেওয়ার আগেই শহীদ হয়ে যায়। বাস-চাপা পড়ে মারা গেলেও শহীদ হয় সম্ভবত। আর, রাজাকার নিহত হলে আর রক্ষা নেই— অমনি তার সাগরেদরা তাকে শহীদ আখ্যা দেয়। শুনেছি, অনেক রাজাকার নাকি সরকারী মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট পেয়েছে। কোনো ফী অথবা ঘুসটুস দিয়ে মরার আগেই একটা অগ্রিম শহীদের সার্টিফিকেট জোটানোর ব্যবস্থাও কালে কালে হবে কিনা, সেটা এখন বিবেচনার বিষয়। তা হলে একটা সার্টিফিকেট অনেকে জুটিয়ে রাখবেন। (আমি নই— বাপরে! অপঘাতে মরার সামান্যতম ইচ্ছে আমার নেই।)

যেভাবে মরে ভূত হয়ে গেছে, তাতে মনে হয় না "শহীদ"কে আর বাঁচানো যাবে। তবে একটা ভরসা দিগন্তে দেখা দিয়েছে। তাবলিগীদের চেষ্টায় সাম্প্রতিক কালে খোদা তাঁর শুদ্ধ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ-য় পরিণত হয়েছেন। পয়গম্বর রসুলে পরিণত হয়েছেন। তা ছাড়া, ক্রমবর্ধমান মাত্রায় আরবি শব্দ সৌদী উচ্চারণে এবং সঠিক অর্থে ব্যবহার করার প্রবণতাও দেখা দিয়েছে। সাত জন্মে যা দেখিনি, রাতারাতি বাদশা মিয়া, গনি মিয়া ইবনে আলি হোসেন কিংবা ইবনে কালু মিয়ায় পরিণত হচ্ছেন। মোট কথা, প্রচলিত বহু বাংলা শব্দকে হটিয়ে দিয়ে অনেকেই কুফুরি জবান বাংলার সংস্কার করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন। কেউ প্রকাশ্যে, কেউ বা গোপনে। ইদানীং বামপন্থী (আসলে পাকিস্তানপন্থী) কোনো কোনো লেখকের জবান থেকে সংস্কারের এই খোশবু পাচ্ছি। শহীদের অপমৃত্যুর কথাটা এই সংস্কারবাদীদের নজরে আনলে হয়। তাঁরা তা হলে হয়তো একটা ফতোয়া দিয়ে মৃত শহীদকে ফের জীবন দিতে পারেন।

(*যুগান্তর*, ২০০৬)

১২

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত

আমাদের দেশে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের আইনটা বেশ শক্ত। যে-দেশে নানা ধর্মের লোক বাস করেন, সে দেশে শক্ত থাকাই উচিত। কারণ প্রত্যেকেরই নিজ-নিজ মত অনুসারে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা আছে। সেই অধিকারে বঞ্চিত করলে, মৌলিক অধিকারেই আঘাত করা হয়। সুতরাং এ আইন অবশ্যই থাকা দরকার। এবং তা যথাযথভাবে পালন করাও দরকার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: যে-দেশে একাধিক ধর্ম আছে, সে দেশে বাস্তবে এ আইন কিভাবে প্রয়োগ করা হবে? কী ব্যাখ্যা দেওয়া হবে ধর্ম আর ধর্মীয় অনুভূতির?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করতে হয়, ধর্মের সংজ্ঞা কী? কোনটা সত্যিকারের ধর্ম, কোনটা অধর্ম— সেই তাত্ত্বিক প্রশ্নে যাবো না। আমরা যদি ধরেও নিই যে, ধর্ম মানে বিধিবিধান সংবলিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম, তা হলেও ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া এমন কিছু সহজ হয় না। বাংলাদেশ কেবল মুসলমান-প্রধান দেশ নয়, এরশাদী সংশোধন অনুসারে এ দেশের প্রধান হলেন স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং বাংলাদেশ আল্লাহ-তন্ত্রী দেশ, অর্থাৎ ইসলামী দেশ। সেই ইসলাম ধর্মের অনুভূতি নিয়েই তাত্ত্বিক আলোচনা করা যাক।

ইসলাম ধর্মের একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ আছে। কিন্তু যেভাবে বাস্তবে তা পালিত হয়, তা থেকে বলতে হয়: তার কি কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা আছে? এ ধর্মের একেবারে গোড়ার শর্ত হলো: ঈশ্বর এক এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষ হলেন হজরত মোহাম্মদ। কিন্তু শুধু এটুকুন মেনে নিলে তবেই তাবৎ মুসলমান এক খেয়ায় চড়তে পারেন। এর বেশি কোনো শর্ত দিলে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন বাহন বেছে নিতে বাধ্য হবেন। কারণ, তার পরেই আসে ধর্মের বিচিত্র দিকের ব্যাখ্যা নিয়ে নানা মতের কথা। প্রথমেই সুন্নি আর শিয়ার পার্থক্য। শিয়ারা মনে করেন, তাঁরা সঠিক, সুন্নিরা মনে করেন তাঁরা সঠিক। সুন্নিরা তাঁদের ধর্মমতের কথা বললে, শিয়ারা মনে করতে পারেন যে, তাঁদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। আবার, উল্টোটাও হতে পারে। সেই আঘাত এবং প্রত্যাঘাতের ফলে কী হতে পারে— ইরাক এবং পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নির বিরোধ থেকেই অনুমান করতে পারবেন। কথা হচ্ছে: বিচারক কোন শাখার মতানুসারে রায় দেবেন?

সুন্নিদের মধ্যেও সবাই এক মতে বিশ্বাস করেন না। বড়ো চারজন ধর্মগুরু এই ধর্মের যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেই ব্যাখ্যা অনুসারে সুন্নিরা চারটি ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের লোকেরা যা বিশ্বাস করেন, অন্য ভাগের লোকেদের সঙ্গে তার অনেক অমিল লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি বাস করলে এই চার সম্প্রদায়ের মধ্যে তা নিয়ে সংঘর্ষ দেখা দেওয়াও অসম্ভব নয়। এক সম্প্রদায় যেভাবে ধর্ম পালন করবেন, তাতে অন্য

সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতি আহত হতে পারে। তখন বিচারক কোনটাকে অনুমোদন করবেন ? শাস্তি দেবেন কাকে ?

ভাগ্য ভালো: বাংলাদেশের সুন্নিরা বেশির ভাগই হানাফি। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের মধ্যে অনৈক্য থাকার কথা নয়। কিন্তু বাংলাদেশের তাবৎ হানাফি কি একই তরিকায় বিশ্বাস করেন ? যেমন, আহালে হাদীস সম্প্রদায়ের সঙ্গে মূলধারার মুসলমানদের মতের কি মিল হয় ? মধ্যযুগে বাংলাদেশে ধর্ম প্রচার করেছিলেন প্রধানত সুফি-পীরেরা। তাঁরা যে-ভক্তিবাদী ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তার সঙ্গে হানাফি মতের মিল হয় না। সে জন্যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শের বিরোধ এবং তা থেকে সংঘর্ষ হতেই পারে। সাম্প্রতিক কালেও হয়েওছে। জঙ্গী ইসলামীরা সুফি পীরের আখড়ায় হামলা চালিয়েছে, এমন কি, পীর এবং তাঁর সাগরেদদের খুন করেছে। এ তো কেবল ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত নয়, রীতিমতো ধর্ম পালনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

এ রকমের আর-একটি সম্প্রদায় হলো আহমদিয়া। আহমদিয়ারা অনেকেই যেহেতু সচ্ছল, সে জন্যে সুফিদের মতো নীরবে তাঁরা অত্যাচার মেনে নেননি। তাঁরা রীতিমতো আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। তাঁদের আন্দোলনের প্রতি দেশ-বিদেশের প্রভাবশালী লোকেরা, এমন কি, কূটনীতিকেরাও সমর্থন জানিয়েছেন। তা সত্ত্বেও খতমে নবুয়তের জঙ্গীরা নানা জায়গায় আহমদিয়াদের ওপর হামলা চালিয়েছে। কিন্তু সেই জঙ্গীদের কোনো আদালতে বিচার হয়েছে বলে খবর পাইনি। আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষে আহমদিয়ারা পুরোপুরি বিশ্বাস করেন। নিজেদের তাঁরা মুসলমান বলেই দাবি করেন। তাই তাঁরা তাঁদের উপাসনালয়কে বলেন মসজিদ। জঙ্গীরা তাতেও আপত্তি করে। তাদের যুক্তি হলো: এটা মূলধারার মুসলমানদের মসজিদ নয়। সুতরাং এটাকে মসজিদ বলা যাবে না। যাঁরা আহমদিয়া নন, তাঁদের চোখেও এটাকে অত্যন্ত অযৌক্তিক বলে মনে হবে।

উপাসনালয়ের নাম যা-ই রাখুন না কেন— গির্জা, মন্দির, সিনাগগ— তাতে অন্য সম্প্রদায়ের কিছু মাত্র বলার নেই। তাঁরা যদি দাবি করেন, ঈশ্বর একজন নয়, সহস্রজন— তাতেও অন্যদের কিছু যায় আসে না— আপত্তির কারণ থাকাতো দূরের কথা। মুসলমানরা মনে করেন, যিশু খৃস্ট ছিলেন প্রেরিত পুরুষ। কিন্তু খৃস্টানরা মনে করেন, তিনিই ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অংশ। এ নিয়ে খৃস্টান এবং মুসলমানদের মাথা ফাটাফাটি হওয়ার কারণ নেই। কারণ, নিজের মত অনুসারে ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে প্রত্যেকেরই। মূল কথাটা হলো: নিজের ধর্ম। ধর্ম মানে কতোগুলো বিশ্বাসের সমাহার। আপনার চোখে যা অধর্ম, আমার চোখে হয়তো সেটাই পরম পবিত্র ধর্ম। আপনার ধর্মের সমালোচনা করে আপনাকে আমি পরিকল্পিতভাবে দুঃখ দিতে পারি না। অথবা তা দেওয়া উচিত নয়। তেমনি আমি কোনো ধর্ম পালন না-ও করতে পারি। তাতে আপনার কিছু বলার থাকতে পারে না। অথবা আপনি জোর করে আমাকে কোনো ধর্ম পালন করতে বাধ্য করতে পারেন না। আমি যদি বলি, বহু বছর প্রবাসে থাকার সময়ে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বহু বার আমি শুয়োরের মাংস খেয়েছি অথবা বলি রোজ আমি এক গেলাশ লোহিত মদ্য পান করি— তাতে আপনি চমকে উঠতে পারেন। কিন্তু তা বন্ধ করার জন্যে আমাকে বাধ্য করতে পারেন না। আপনার ধর্ম আপনার, আমার ধর্ম আমার। আপনার ধর্মীয় অনুভূতিতে ইচ্ছা করে আঘাত করা যেমন ভদ্রতা, ভব্যতা এবং মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী— অন্যায়; তেমনি আমার ধর্মীয় অনুভূতিতেও আপনার আঘাত করা সমান অন্যায়। আমার ধর্মীয় মতামত প্রকাশ করার অধিকার আমার অবশ্যই আছে। আপনি আগ্রহী হলে সেটা শুনতে পারেন। অপছন্দ হলে, সেটা শুনবেন না। অপর পক্ষে, আপনার মত আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার কোনো অধিকার আপনাকে কেউ দেয়নি— রাষ্ট্র নয়, ধর্মও নয়।

(*যুগান্তর*, ২০০৬)

১৩
ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্য বললেই মনে হয় একজন প্রতাপশালী সম্রাট এবং তাঁর শাসনভুক্ত একটা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের কথা। যেমন, সম্রাট অশোক— যাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিলো হিমালয় থেকে সিংহল পর্যন্ত। যেমন, আলেক্সান্ডার— যাঁর সাম্রাজ্য ছিলো আরও বড়ো— পূর্ব ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষ পর্যন্ত। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ব্রিটেন, স্পেন এবং ফ্রান্সও উপনিবেশ স্থাপন করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলে ছিলো। ইংরেজ সাম্রাজ্য ছিলো এতোই বিস্তীর্ণ যে, সেখানে নাকি সূর্যাস্ত হতো না কখনো। এই সাম্রাজ্য বিস্তারের আদর্শ বা মতবাদকে বলে: সাম্রাজ্যবাদ। সাম্প্রতিক কালে দেশ জয় করে সাম্রাজ্য স্থাপন করা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কারণে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাই বলে সাম্রাজ্যবাদ লোপ পায়নি। বরং তা দেখা দিয়েছে ভিন্ন পোশাকে।

এই নব্য-সাম্রাজ্যবাদের দু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন স্থাপিত হয়। তারপর যে-বিশাল সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়, তাকে বলা যেতে পারে একটি কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেই এই সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা ছড়িয়ে পড়েছিলো সমগ্র পূর্ব ইউরোপে। এমন কি, খানিকটা ভিন্ন চেহারায় চীনেও। অ্যামেরিকার কোনো কোনো অঞ্চলেও। কমিউনিস্ট দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার সম্পর্ক গঠিত হয়। স্থাপিত হয় সামরিক জোটও। কমিউনিস্ট মতাদর্শের নামে অন্য অনেক দেশকেও নিজেদের কোলে টেনে নিতে চেষ্টা করে এই সাম্রাজ্য। তার জন্যে প্রয়োজনবোধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করেনি। এই সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার জন্যেই তৈরি করেছিলো ছোটো-বড়ো হাজার হাজার পারমাণবিক বোমা।

উল্টো দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে বিশাল পুঁজিবাদী সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাহায্য দিয়ে এবং কখনো কখনো তাদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে তাদের নিজেদের দলে রাখে। ইউরোপীয় দেশগুলোর যেসব উপনিবেশ ছিলো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ধীরে ধীরে সেসবকে স্বাধীনতা দিতে তারা বাধ্য হলো ঠিকই, কিন্তু তারপরও নানাভাবে তাদের ওপর নিজেদের প্রভাব বজায় রাখলো। বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ। সামরিক যোগাযোগও। এই যোগাযোগকে জোরদার করার জন্যে তারা গড়ে তোলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা। যেমন কমনওয়েলথ, যেমন নেটো। এই সাম্রাজ্যের কয়েকটি রাষ্ট্রই লক্ষ-কোটি ডলার ব্যয়ে তৈরি করে পারমাণবিক মারণাস্ত্র।

১৯৯০-এর দশকের গোড়ায় কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। অর্থনৈতিক শক্তি হিশেবে রাশিয়ার যে-পরিচয় ছিলো, তাও ঘুচে যায় পুরোপুরি। অবশিষ্ট থাকে কেবল কয়েক হাজার পারমাণবিক বোমা। নতুন পরিপ্রেক্ষিতে পরাশক্তিদের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই টিকে থাকলো একমাত্র পরাশক্তি হিশেবে। এই অবস্থায় জর্জ বুশ (সিনিয়র) নতুন বিশ্ব বিন্যাসের ঘোষণা দেন। এই নতুন ওয়ার্ল্ড অর্ডার আসলে খাঁটি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

এভাবে এ শতাব্দীতে একটি কমিউনিস্ট এবং একটি পুঁজিবাদী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। কিন্তু তার বাইরে নতুন আর-একটি সাম্রাজ্যও জোরালো হয়ে ওঠে যার ভিত্তি অর্থনীতি নয়, এমন কি, আপাতদৃষ্টিতে ইহলৌকিকতাও নয়। এর ভিত্তি হলো ধর্ম। ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ কিছু নতুন নয়। অতীত কাল থেকেই প্রধান ধর্মগুলোকে কেন্দ্র করে তা গড়ে ওঠে, যদিও রেনেসন্স-পরবর্তী কালে, বিশেষ করে শিল্পবিপ্লবের পর তা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায়। যা লক্ষণীয় তা হলো: ইদানীং নতুন করে তার প্রবল প্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র। একে বলতে পারি নব্য ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ। বিশ শতাকের গোড়ার দিক থেকে খৃস্টান এবং ইসলাম ধর্মীয় মৌলবাদী চেতনা পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই দানা বাঁধতে থাকে। তারপর কতোগুলো রাজনৈতিক ঘটনাকে ঘিরে শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে তা রীতিমতো সাম্রাজ্যবাদী চেহারা নেয়।

এসব ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হলো মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিক থেকে পেট্রোলের দাম বাড়তে আরম্ভ করে। বিশেষ করে এর দাম হঠাৎ বৃদ্ধি পায় বহু গুণ ১৯৭৩ সালে ইসরাইলের সঙ্গে আরব দেশগুলোর যুদ্ধের পর। এর ফলে বিশেষ লাভবান হয় সৌদী আরব, ইরান, ইরাক, লিবিয়া, কাতার ইত্যাদি কতোগুলো ইসলামী দেশ। তারা এই পেট্রোলের কাঁচা টাকা দিয়ে নিজেদের দেশে প্রভূত উন্নয়ন কার্য করতে সমর্থ হয়। এসব দেশে দেখা দেয় দ্রুত নগরায়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। সেই সঙ্গে এরা গড়ে তুলতে চেষ্টা করলো আধুনিক ফৌজী বাহিনী। শিক্ষার দিক দিয়ে এরা ছিলো খুবই পিছিয়ে। সেদিকেও নজর দিলো তারা। সবচেয়ে বড়ো কথা, নতুন বিত্ত লাভের ফলে এই দেশগুলো মুরুব্বি সাজার চেষ্টা করলো। যেহেতু এই দেশগুলোর পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ থাকলেও একটা অভিন্ন ধর্মীয় পরিচয় ছিলো সে জন্যে এরা যে-মুরুব্বিয়ানা শুরু করলো, তা শুরু করলো ইসলামের নামে। এভাবে তারা গড়ে তুললো একটা ইসলামী সাম্রাজ্য। এবং তারা এই সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করার সক্রিয় প্রয়াস চালাতে আরম্ভ করলো। এক কথায় এটা হলো: ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ।

পশ্চিমা দেশগুলো প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের দিক দিয়ে উন্নত হলেও, পেট্রোল ছাড়া তারা অচল। সুতরাং তারা মধ্যপ্রাচ্যের এই অনুন্নত দেশগুলোকে হাতে রাখার জন্যে নানা রকমের উপায় অবলম্বন করতে আরম্ভ করলো। তারা বাড়িয়ে দিলো আপাতবন্ধুত্বের হাত। যেমন, সৌদী আরব হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ মিত্র।

তবে লিবিয়া, ইরাক অথবা ইরানের মতো কোনো দেশ অবাধ্য হলে তাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বাগে আনার জন্যেও ব্যবস্থা গ্রহণ করলো পশ্চিমা দেশগুলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এবং বিশেষ করে ব্রিটেনের সহযোগিতায় যে-ইরাক অভিযান চালানো হয়, তার পেছনে কেবল মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্য ছিলো না। ছিলো পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের রাজনীতিও।

কারো হাতে টাকা এলে সে যেমন ধীরে ধীরে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে, তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর আর্থিক অবস্থা রাতারাতি উন্নত হওয়ায় তারাও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে প্রভাবশালী হতে চেষ্টা করলো— শিক্ষা-সহ বহু ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও। তবে জাতিসঙ্ঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণ তারা নিতে পারলো না। অথবা পশ্চিমা দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তারা পারলো না কোনো ছাপ ফেলতে। এই হতাশা থেকেই তখন তারা মুসলমান-প্রধান দেশগুলোর দিকে হাত বাড়ালো। এভাবে একাধিক সংস্থা গড়ে উঠলো ইসলামী দেশগুলোর। আর এসব সংস্থার নেতা হলো তেলের টাকা যেসব দেশের সবচেয়ে বেশি ছিলো, সেই দেশগুলো। তেল ছাড়া, আরও একটা অস্ত্র তাদের হাতে ছিলো, সেটা ইসলাম ধর্মের নাম। তেলের জন্যে পুঁজি লাগে, তেল উত্তোলনের জন্যে লাগে প্রযুক্তি এবং পরিশ্রম। অপর পক্ষে, বিনা পুঁজিতে রবরবা ব্যবসা করা যায় ধর্মের নাম দিয়ে। কারণ, ধার্মিক হলে যে-পুরস্কার পাওয়া যাবে, সেটা অবিলম্বে অথবা নগদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যতের জন্যে ফেলে রাখা যায়। এবং স্বর্গ এবং স্বর্গীয় অপ্সরা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি ঠিক মতো পালন করা হলো কিনা, তাও যাচাই করে দেখার কোনো উপায় থাকে না।

মধ্যপ্রাচ্যে ধর্মের এই এন্তার পুঁজি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করার সুযোগ পেলো সৌদী আরব। কারণ ইসলাম ধর্মের সূত্রপাত সেখান থেকে এবং মুসলমানদের পবিত্র তীর্থ মক্কা-মদিনাও সেখানে। সৌদী আরবকেই গোটা বিশ্বে দেখা হয় ইসলাম ধর্মের রক্ষক হিশেবে। এভাবে নতুন এক সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হলো: যাকে বলতে পারি ইসলামের ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ। এই বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ নেতা সৌদী আরব হলেও, ইরান, ইরাক, কাতার, লিবিয়া ইত্যাদি দেশও দ্বিতীয় সারির নেতা হলো। এদের বিশাল পুঁজি থেকে ছিটে-ফোঁটা দিয়ে এরা দরিদ্র দেশগুলোতে তেল যতোটা পাঠালো, তার থেকে বেশি পাঠালো ধর্ম প্রচারক দল। স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে-মিশে যে-ইসলাম দরিদ্র দেশগুলোতে মধ্যযুগে প্রচলিত হয়েছিলো, তা ধ্বংস করে এরা পুরোনো ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করলো। এভাবে সামান্য মূলধন দিয়েই ইসলামী সাম্রাজ্যবাদ ছড়িয়ে পড়লো ইন্দোনেশিয়া থেকে মরোক্কো পর্যন্ত। এমন কি, তার বাইরে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিও এতে অনুকূল হাওয়া দিয়েছিলো। বিশেষ করে ইসরাইল এবং ফিলিস্তিনীদের সমস্যা এতে ইন্ধন জোগায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতে ইসরাইল যে-দখলদারি এবং ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাতে থাকে তা মুসলমানদের

ঐক্যবদ্ধ করে। আফগানিস্তান এবং ইরাকের সমস্যাও তাতে সহায়তা দেয়। এই মুসলমানী জাতীয়তাবাদ দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ইসলামী ভ্রাতৃত্বের জন্ম দেয়। বস্তুত, এভাবে একটা প্রবল ইসলামী জাতীয়তাবোধ দানা না-বাঁধলে মৌলবাদী ইসলাম অথবা আল কাইদার জঙ্গীবাদ অতো দ্রুত অথবা অমন ব্যাপক সমর্থন লাভ করতো না।

ধর্মের নামে এই যে ভূখণ্ড জয় করা এবং সেখানে ধর্মের বাণী পৌঁছে দেওয়া—এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। প্রাচীন কাল থেকেই ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ গড়ে উঠেছিলো। বেদের বাণী নিয়ে আর্যরা এসেছিলেন ভারতবর্ষে খৃস্টের জন্মেরও অনেক আগে। অনার্যদের কেবল পরাজিত নয়, প্রায় বিনাশ করেছিলেন তাঁরা। গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচারের পর সে ধর্মও ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছিলো নানা দিকে। বিশেষ করে সম্রাট অশোক রক্তস্রোত বইয়ে দিয়ে নিজের আসন পোক্ত করার পর বৌদ্ধধর্ম প্রসারের জন্যে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন উত্তরে, দক্ষিণে, পুবে, পশ্চিমে। ফলে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। আর পশ্চিমে আফগানিস্তান পর্যন্ত এ ধর্মের রীতিমতো শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিলো। এমন কি, তারও পশ্চিমে।

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেও এ কথা বলা যায়। এই ধর্মের প্রবর্তক কেবল শান্তির ধর্ম প্রচার করেননি, সেই সঙ্গে তাঁর ধর্মের বাণী পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন, অনেক সময় তরবারি দিয়ে। তাঁর মৃত্যুর পর তিরিশ বছরের মধ্যে সিরিয়া, লেবানন, পারস্য, জর্দান, মিশর এবং উত্তর আফ্রিকা ইসলামী সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। আরও পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তা ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে স্পেন হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে। এর পর ইসলাম প্রচারিত হয় ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষেরও পুবে। এভাবে যে-ইসলামী বিশ্ব গঠিত হয়, বিস্তৃতির দিক দিয়ে একমাত্র খৃস্টান বিশ্বের সঙ্গেই তার তুলনা চলে।

ইসলাম ধর্মের সঙ্গে তুলনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, খৃস্টধর্ম প্রসার লাভ করে তুলনামূলকভাবে আধুনিক কালে। পীর-দরবেশরা নানা দেশে গিয়ে ধর্মপ্রচার করে পুণ্য লাভ করতে চেষ্টা করেছেন। সেসব দেশে ইসলামী রাজত্ব স্থাপনের জন্যে তাঁরা অপেক্ষা করেননি। অপর পক্ষে, ইউরোপীয় খৃস্টান মিশনারিরা নানা দেশে গেছেন প্রধানত সেসব দেশে সামরিক বিজয়ের পর। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন ইত্যাদি ইউরোপীয় দেশ উপনিবেশন স্থাপনের কাজ শুরু করার পর মিশনারিরা যান এসব দেশে ধর্ম প্রচার করতে। ভারতবর্ষে যেমন পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের পেছনে পেছনে আসেন জেসুইট মিশনারিরা। ইংরেজদের পেছনে আসেন অ্যাংলিকান, ব্যাপটিস্ট, রোম্যান ক্যাথলিক এবং স্কটিশ মিশনারিরা। মিশনারিদের অত্যুৎসাহী প্রচারের মাধ্যমে খৃস্টধর্ম আফ্রিকা, এশিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ অ্যামেরিকায় দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বস্তুত, খৃস্টধর্মের আক্রমণে বহু জায়গায় সেখানকার আদি ধর্ম

পুরোপুরি লোপ পায়। আধুনিক আফ্রিকায় যেমন প্রাচীন ধর্মগুলোর জায়গা দখল করেছে খৃস্ট আর ইসলাম ধর্ম।

পৃথিবীতে খৃস্ট ধর্ম এখন সবচেয়ে বড়ো ধর্ম। সে তুলনায় ইসলাম ধর্ম কেবল দ্বিতীয় নয়, অনেকটা পেছনে থেকে দ্বিতীয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যে-শক্তির যোগাযোগ কল্পনা করা হয়, খৃস্ট ধর্মের তুলনায় ইসলামে তা অনেক বেশি। কারণ, খৃস্টানদের বিশ্বাস ধর্ম এবং রাষ্ট্র আলাদা। অপর পক্ষে, ইসলামের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত আছে ঈশ্বরে। আবুল মাওদুদী পশ্চিমা গণতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের তুলনা করে বলেছেন যে, পশ্চিমা গণতন্ত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে মানুষের হাতে, কিন্তু ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আছে ঈশ্বরের হাতে। মানুষ হলো ঈশ্বরের প্রতিনিধি। পশ্চিমা গণতন্ত্রে আইন প্রণয়ন করে মানুষ, কিন্তু ইসলামে আইন হলো রসুলের মাধ্যমে পাওয়া আল্লাহর বিধান।

বিশ্বের তাবৎ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়ে সবাইকে আল্লাহর আইনের অধীনে আনার কাজকে মনে করা হয় পবিত্র দায়িত্ব হিশেবে এবং সে কারণে জেহাদ ইসলামের একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। ইসলামের লক্ষ্য হলো চূড়ান্ত শান্তি স্থাপন করা— দরকার হলে তার জন্যে রক্তপাতও অবৈধ নয়। কমিউনিজমকে ইসলাম অত্যন্ত ঘৃণা করে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কমিউনিজমের সঙ্গে ইসলামের এখানে একটা মিল রয়েছে। কমিউনিজম এবং ইসলাম উভয়ই বলে যে, পরিশেষে সর্বাঙ্গীণ শান্তি আসবে এবং তার জন্যে অশান্তির অর্থাৎ যুদ্ধের / বিপ্লবের আশ্রয় নিতে হতে পারে।

এই যে-ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের নীতি, মনে করার কারণ নেই যে, এখন তা কেবল মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বস্তুত, কমবেশি সব ধর্মের মধ্যেই তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমন কি, হিন্দুদের মধ্যেও গত দু দশকে একটা জঙ্গীবাদী এবং প্রসারণবাদী মনোভাব দেখা দিয়েছে। ভারতে বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অথবা শিবসেনার শ্রীবৃদ্ধি থেকে এই মনোভাবই প্রতিফলিত হয়। তেমনি পুনরুত্থান লক্ষ্য করা যায় খৃস্টানদের মধ্যে। গত কয়েক দশক ধরে অত্যুৎসাহী মার্কিন খৃস্টানরা রাজনীতিতে ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে আছেন এভ্যানজেলিকাল এবং নব্যরক্ষণশীল গোষ্ঠীগুলো। মার্কিন সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব এভ্যানজেলিকাল অ্যালায়েন্সও গঠিত হয়েছে। এই এভ্যানজেলিকাল খৃস্টানরা ধর্ম প্রচারের ছদ্মবেশে সম্প্রসারণ ও আধিপত্যবাদ প্রচার করছেন। এ ছাড়া, এঁরা দেশপ্রেমকেও ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন। তবে তাঁরা নতুন নতুন পরিভাষার ছদ্মবেশে নিজেদের আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখতে চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন তাঁদের মতবাদের একটা মননশীল এবং গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে।

খৃস্টীয় এবং ইসলামী সাম্রাজ্যবাদ বস্তুত বিশ্বব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে এসেছে গোড়া থেকেই। সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের জন্যে সম্রাটরা যেমন ন্যায়-

অন্যায় সব রকমের পন্থা নেন, ধর্মীয় সাম্রাজ্য বিস্তারেও তেমনি সব রকমের পন্থা নেওয়া হয়। তার জন্যে দরকার হলে রক্তপাতেও আপত্তি নেই। কারণ ধর্মীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে পরিণামে মানুষের কল্যাণ হবে— এই যুক্তিতে ধর্মীয় নেতারা যে-কোনো পন্থাকে ন্যায্য বলে বিবেচনা করেন।

এই ধর্মীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ থেকেই মধ্যযুগে খৃস্টান এবং মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ হয়েছে। এমন কি, ইদানীং কালে দেশের সীমানাকে অতিক্রম করে ধর্মকে আন্তর্জাতিক সীমানায় নিয়ে যাওয়ার বিশ্বাস এবং বাসনা— খৃস্ট এবং ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিজেদের ধর্মের দিকে টানার বাসনাও এদের মধ্যে প্রবল। প্যান ইসলামী চেতনার কথা অনেক আগে থেকেই চালু আছে, কিন্তু প্যান খৃস্টীয় চেতনার কথা চালু না-থাকলেও আসলে প্রবল স্রোতে এ চেতনাও বহমান। বিশেষ করে সপ্তদশ / অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপনিবেশ স্থাপনের সময় থেকে। যেখানে যেখানে ইংরেজ, ফরাসি, স্প্যানিশ এবং জার্মান উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে, খৃস্টান মিশনারিরাও সেসব জায়গায় গেছেন এবং ধর্ম প্রচার করেছেন। এভাবে আফ্রিকায় যেসব ধর্ম প্রচলিত ছিলো ইসলাম এবং খৃস্ট ধর্মের আগ্রাসনের ফলে সেসব ধর্ম প্রায় লোপ পেয়েছে।

ধর্ম প্রচারে খৃস্টান এবং মুসলমানরা সাম্প্রতিক কালে কিছু ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন। খৃস্টানরা পরকালের লোভ দেখানো ছাড়াও, অর্থবল ব্যবহার করেছেন ব্যাপকভাবে। দরিদ্রদের খাদ্য, শিক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করে বিশেষভাবে আফ্রিকা এবং এশিয়ায় তাঁরা ধর্ম প্রচার করতে চেষ্টা করেছেন। অপর পক্ষে, অতি সাম্প্রতিক কালে মুসলমানরা প্রধানত পরকালের ভয় এবং লোভ দেখিয়েই ধর্ম প্রচার করেন। স্বর্গের সুখ এবং নরকের যন্ত্রণা ইসলাম ধর্মে যেমন অতি উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, খৃস্টধর্মে তেমনভাবে করা হয়নি।

ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁদের প্রতিপত্তি বিস্তারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিও ব্যবহার করছেন। এটা তাঁরা করেন প্রধানত দুভাবে— প্রচারে এবং সন্ত্রাসে। প্রচারের ক্ষেত্রে খৃস্টানরাই প্রযুক্তিগত জ্ঞানের কারণে এগিয়ে আছেন। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এভ্যানজেলিক্যাল খৃস্টানরা প্রচারের কাজে অডিও-ভিজুয়াল প্রযুক্তির চূড়ান্ত ব্যবহার করেন। কিন্তু মুসলমানরাও খুব পিছিয়ে নেই। তাঁরা টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং পত্রপত্রিকা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকেন। প্রচার ছাড়া, নিজেদের মতবাদ বিস্তারের জন্যে উগ্রবাদী খৃস্টান এবং জঙ্গী মুসলমানরা ব্যবহার করেন মারণাস্ত্র। উগ্রবাদী খৃস্টানরা কোথাও কোথাও হত্যা এবং সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছেন— যেমন, গর্ভপাতবিরোধী গোষ্ঠী। কিন্তু এ ব্যাপারে জঙ্গী জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা অনেক এগিয়ে আছেন। তাঁরা সন্ত্রাসের কাজে অত্যাধুনিক বিস্ফোরক এবং স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র— সবই ব্যবহার করছেন। উড়ো জাহাজ দিয়ে টুইন

টাওয়ারের মতো বিশাল ভবন ধ্বংস করার দৃষ্টান্তও তাঁরা স্থাপন করেছেন। এমন কি, এই সন্ত্রাসীরা নিম্নশ্রেণীর পারমাণবিক বোমাও জোগাড় করার চেষ্টা করছেন বলে মাঝেমধ্যেই শোনা যায়। তালিবানদের মতো তাঁরা আফিমের টাকা দিয়েও এসব মারণাস্ত্র সংগ্রহে দ্বিধা করেন না। কারণ, তাঁরা মনে করেন যে, তাঁদের মহৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে তাঁরা অন্যায় পন্থা বেছে নিলেও সেটা অন্যায় নয়।

বস্তুত, খারাপ লোকেদের হাতে পড়লে ধর্ম মারাত্মক অস্ত্রের মতো কাজ করতে পারে। কারণ অত্যুৎসাহী ধার্মকরা ধর্মকে ব্যবহার করে ঐশী শক্তির নামে। কিন্তু এর ফলে এ থেকে দেখা দিতে পারে সহিংসতা এবং ধর্মান্ধতা। আজকের অ্যামেরিকায় তাই ঘটছে। বুশের সমর্থন নিয়ে অ্যামেরিকার মুক্ত এবং কল্যাণধর্মী চিন্তাধারা বিপন্ন হচ্ছে। ডানপন্থীরা চেষ্টা করছে ক্ষমতায় এসে বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের। তার জন্যে হাজার-হাজার নিরীহ লোকের প্রাণহানিতেও তাদের অনীহা নেই। এই ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের অধিকারও খর্ব করার চেষ্টা হচ্ছে। যেমন, আয়কর কমিয়ে ধনীদের আরও ধনী করছে বুশ-প্রশাসন। কিন্তু তার ফলে ব্যয় কমাতে হচ্ছে কল্যাণমূলক কাজের। এভাবে দরিদ্রদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মার্কিন গণতন্ত্র এখন বস্তুত ধনীরা আত্মসাৎ করেছে। ন্যায়নীতি এবং সাম্যের বদলে পুঁজিবাদী চিন্তাধারাই পরিপুষ্টি লাভ করছে এবং এতে ধর্মের নাম পুরোপুরি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইসলাম এবং নব্য-হিন্দুত্বের আক্রমণে দক্ষিণ এশিয়ায়ও যুক্তিবাদ, উদারতা এবং মুক্তচিন্তাকে দারুণ বিপন্ন হতে দেখি। বিশেষ করে হতাশ হতে হয় যখন দেখি পেট্রোডলারের ছড়াছড়ি হলেও দরিদ্রদের অবস্থা উন্নতিতে কোনো প্রয়াস নেই; আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের কোনো উদ্যোগ নেই; কিন্তু আছে এন্তার মাদরাসা স্থাপনের কার্যক্রম। এসব মাদরাসা আসলে বিনা পয়সায় প্রাচীনপন্থী শিক্ষা দিয়ে অগ্রযাত্রার পথ চিরতরে রুদ্ধ করার সংগঠিত এবং সুকল্পিত প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। একটা প্রজন্মকে উন্নতির পথ থেকে সরিয়ে রাখার এই প্রযত্নকে প্রশংসা করা যায় না। সেই সঙ্গে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্মীয় প্রতিপত্তির নামে মানুষে মানুষে ঘৃণা এবং অবিশ্বাসকে যেভাবে পদ্ধতিগতভাবে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, তাতে যে-কোনো উদারপন্থী লোক বিচলিত হবেন। মোট কথা, সাম্রাজ্যবাদ— তা সে যে-নামেই প্রসার লাভ করুক না কেন— তাকে মানবতা এবং প্রগতির পরিপন্থী বলেই বিবেচনা করতে হয়।

(*যুগান্তর*, ২০০৬)

১৪
ধর্ম ও আধুনিকতা

সব আইনের মধ্যেই সময়ের একটা ছাপ থাকে। কারণ, একটা আইন তৈরি হয় একটা বিশেষ সময়ে, বিশেষ পরিবেশে, বিশেষ প্রয়োজনের খাতিরে। তারপর সময় এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনের যদি সংশোধন না-হয়, তা হলে সে আইনে সময়ের মড়চে ধরে। জীবন থেকে তা পিছিয়ে পড়ে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা প্রয়োজন মেটায় না এবং তা মেনে চলাও শক্ত হয়। এমন কি, তা মেনে চললে উন্নতির পথে সেটা বাধা হয়ে দেখা দেয়। এক সময়ে দেশ চলতো রাজার ইচ্ছেয়। তিনি ইচ্ছে করলেই কাউকে শূলে চড়াতে পারতেন। কিন্তু এখন দেশ চলে বেশির ভাগ মানুষের ইচ্ছেয়। বিচার চলে আদালতে— বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী। সত্যযুগের আইন দিয়ে এখন আর কলি কালের পৃথিবী চলতে পারে না।

আনুষ্ঠানিক ধর্ম হচ্ছে কতোগুলো আইনের একটা সংগ্রহ। সে আইন বিধাতা প্রণয়ন করেছেন, নাকি মানুষ— এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হতে পারে। সে বিতর্কের কোনো মীমাংসাও না-হতে পারে। কিন্তু সে আইন যে একটা বিশেষ সময়ে প্রণীত— এটা ঐতিহাসিক সত্য এবং এর মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই। আর-একটা সত্য হলো, ধর্মগ্রন্থে যা লেখা থাকে আর যুগে যুগে মানুষ যেভাবে ধর্ম পালন করে, তা হুবহু এক রকম নয়। তত্ত্ব এবং বাস্তবে পার্থক্য তৈরি হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব এবং বাস্তবের এই দূরত্ব বাড়তে থাকে। তখন সমাজ ধর্মের খানিকটা সংস্কার করে নেয়। যেমন, ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী চারটে পর্যন্ত বিয়ে করার বিধান আছে। কিন্তু ১৯৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তানে যে-পারিবারিক আইন প্রণীত হয়, তাতে একাধিক বিয়ে করার ব্যবস্থাটা নিরুৎসাহিত হয়েছে। বিশেষ অবস্থায় প্রথম স্ত্রীর সম্মতি নিয়েই এখন দ্বিতীয় বার বিয়ে করা যায়।

মহাযান, হীনযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ইত্যাদি নানা মতের সৃষ্টি হয়েছে। যে-বুদ্ধ ঈশ্বরকে মানেননি, সেই বুদ্ধ স্বয়ং ভক্তদের চোখে ঈশ্বরে পরিণত হয়েছেন। কেবল তাই নয়, ধর্মগ্রন্থের পরিবর্তন না-হলেও জীবন থেকে ধর্ম অনেকটাই সরে এসেছে। অহিংসা পরম ধর্ম হলেও, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জাপানীরা যুদ্ধ করার আগে বৌদ্ধমন্দিরে গিয়েই অন্য মানুষ খুন করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন ১৯৩৮ সালে। তাই শুনে আমাদের কবি দুঃখ করেছেন।

যিশু খৃস্ট এক গালে চড় দিলে অন্য গাল এগিয়ে দেওয়ার মহান আদর্শ প্রচার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুসারীরা মধ্যযুগে ধর্মযুদ্ধে রক্ত ঝরিয়েছেন। অন্ত্য-মধ্যযুগে রক্ত ঝরিয়ে এশিয়া, আফ্রিকা এবং অ্যামেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। এমন কি, ধ্বংস করেছেন স্থানীয় ধর্মগুলোকে। আর এ যুগে খৃস্ট-অনুসারীরা বজনিয়া, রোয়ান্ডা, ইরাকে অসহায় এবং নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছেন। পুনর্জন্মপ্রাপ্ত খৃস্টান (বর্ন এগেইন) প্রেসিডেন্ট বুশ শান্তির বদলে জঙ্গীবাজ সেজেছেন।

ইসলাম মানে শান্তির ধর্ম। কিন্তু বাংলাদেশের কয়েকজন বড়ো মওলানার হাতে ৭১-এর রক্তের দাগ এখনো লেগে আছে। শায়খ রহমান আর তাঁর জেহাদী বাহিনী নিজেদের হাতে মানুষ জবাই করেছেন বলে স্বীকার করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, ধর্মগ্রন্থে যা আছে, যুগে যুগে তার খানিকটা সংস্কার করে নেন ধর্মের অনুসারীরা। কারণ, এই সংস্কার ছাড়া, ধর্মের অনেক বিধান অচল হয়ে পড়তো।

এর আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে। শায়খ রহমান এবং তাঁর অনুসারীরা বলেন যে, মানুষ আইন প্রণয়ন করতে পারে না। আইন হলো স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার তৈরি। মানুষ তা বাস্তবায়িত করবে। তার ব্যাখ্যা দেবে। সে জন্যেই শায়খ রহমানরা দেশের আইন-ব্যবস্থা ভেঙে দিতে চান। তাঁদের মতে, দেশে কোনো আদালত থাকবে না। আইনের শাসন চলবে মসজিদকে কেন্দ্র করে। এমন কি, ইসলাম ধর্ম অনুসারে নির্বাচনে ভোট দেওয়াও নাকি নিষিদ্ধ। কারণ, ভোট দেওয়ার আইনটা হলো মানুষের তৈরি। গণতান্ত্রিক সরকার হলো মানুষের তৈরি একটা ব্যবস্থা। এই উগ্রবাদী ধর্মগুরুরা তাই এসব ভেঙে ফেলার কথা প্রচার করেন। তাঁরা কেবল বাংলাদেশে নয়, তাবৎ পৃথিবীতে মানুষের তৈরি যে-সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তার বিরোধিতা করেন। তা মুছে ফেলে নতুন বিশ্ব গড়ে তুলতে চান। যে-বিশ্ব চলবে ধর্মগ্রন্থে যেসব বিধান লেখা আছে, সেই বিধান এবং শায়খ রহমানের মতো ধর্মগুরুদের ব্যাখ্যা অনুসারে। ইরান অথবা আফগানিস্তানের মোল্লা বাহিনীর মতো ধর্মীয় বাহিনী সেই আইন বাস্তবায়িত করবেন।

প্রশ্ন হচ্ছে: এটা কি একটা বাস্তবসম্মত প্রস্তাব, নাকি আজগুবি ভাবনা ? জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-প্রযুক্তিতে পৃথিবী এখন যেখানে পৌঁছেছে, এবং যে-দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তাকে থামিয়ে দেওয়া অথবা এই অগ্রগতিকে উল্টো পথে নেওয়া কি সম্ভব ? সম্ভব ঘড়িকে ঘুরিয়ে প্রাচীন এক স্বপ্ন-জগতে ফিরে যাওয়া ? বিশ্বে যে-জ্ঞানের

চর্চা হয়েছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে-দর্শন গড়ে উঠেছে— তাকে কি সীমাবদ্ধ করা যাবে একটি অথবা কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে ?

ধর্ম বলে: চলো নিয়মমতো। ডানে তাকিয়ো নাকো, ঘাড় বাঁকিয়ো নাকো। কেন ডানে তাকাবো না, কেন ঘাড় বাঁকাবো না, ধর্ম তার ব্যাখ্যা দেয় না। ধর্ম চায় অন্ধ আনুগত্য। এভাবে আনুষ্ঠানিক ধর্ম মানুষকে যুক্তি এবং জিজ্ঞাসার পথ থেকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। নিয়ম চলে, মানুষ চলে না। ধর্মের বিধান অনুযায়ী: নিয়মের জন্যে মানুষ, মানুষের জন্যে নিয়ম নয়।

বেশির ভাগ ধর্মই শত শত বছরের পুরোনো। তাদের মধ্যে এমন অনেক কথা আছে, এমন অনেক বিধান আছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মূল্যবোধের সঙ্গে যাদের মেলানো শক্ত। ধর্ম বলেছে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা দেখলেন, এটা ভ্রান্ত। ধর্ম বলেছে, জন্মের আগে পর্যন্ত সন্তানের লিঙ্গ জানা যাবে না। বিজ্ঞানের দৌলতে এখন অনেক আগে থেকেই তা জানা যাচ্ছে। এমন কি, ইচ্ছে করলে সন্তানের লিঙ্গও পিতামাতা আগে থেকে নির্ধারণ করতে পারছেন। নারীপুরুষের সঙ্গম ছাড়াও এখন সন্তান জন্ম দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বস্তুত, ধর্ম মানুষের মঙ্গলের জন্যেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ধর্মগ্রন্থে যেসব কথা আছে, তার সবই আক্ষরিকভাবে সঠিক নয়। আমার ধারণা, ধর্মের স্পিরিট মেনে সৎ মানুষ হয়ে ওঠাই আসল কথা। কিন্তু ধর্মের সব বিধান যুগোপযোগী না-ও হতে পারে।

১৮২০-এর দশকে রামমোহন রায় এক-ঈশ্বরের আদর্শ প্রচার করলেও তাকে ঠিক আনুষ্ঠানিক ধর্মের রূপ দেননি। ব্রাহ্মধর্মকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৪০-এর দশকে। তিনি তখন ভাবলেন যে, এই ধর্মের জন্যে একটি ধর্মগ্রন্থ থাকা দরকার। সেই ধর্মগ্রন্থ তিনি রচনা করতে চান বেদ-উপনিষদের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু যখন দেখলেন, বেদ এবং উপনিষদের অনেক কথাই আধুনিক চিন্তাধারা ও যুক্তিবাদের সঙ্গে মেলে না এবং ঠিক আধুনিক কালের উপযোগী নয়, তখন সেসব শ্লোক তিনি খানিকটা সংশোধন করে নেন। গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে তিনি বেদ-উপনিষদকেই আধুনিক কালের উপযোগী করে তোলেন। ফলে বঙ্গীয় সমাজে তখন চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে ব্রাহ্মরাই সবচেয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। অন্য শিক্ষিত হিন্দুরা তাঁদেরই কমবেশি অনুকরণ করেছিলেন। এভাবে যুগে যুগে বৌদ্ধধর্ম এবং খৃস্টধর্মেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। অনেকে মনে করেন, পরিবর্তনকে গ্রহণ করার ইচ্ছা এবং ক্ষমতাই আধুনিকতা। একজন ফরাসি মনীষী বলেছেন যে, এই আধুনিকতা যে-ধর্ম মেনে নিতে পারে না, সে ধর্ম ধর্মই নয়।

১৫

সাম্প্রদায়িকতা : টিকির, দাড়ির

জন্ম ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিশেবে, কিন্তু শৈশবেই বাংলাদেশ তওবা করে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামগন্ধও মুছে ফেলে। দীক্ষা নেয় ইসলাম ধর্মে। ফলে যে-অমুসলমানরা একাত্তরে মুসলমানদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন, সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন বাঙালিদের একটি দেশ গড়ার জন্যে, এরশাদী সংশোধনীর পর তাঁরা কার্যত পরিণত হন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে। এঁদের মধ্যে হিন্দুরা আবার পরিণত হন প্রায় অবাঞ্ছিত নাগরিকে। কারণ, তাঁদের অভিন্ন করে দেখা হয় প্রতিবেশী— অতএব প্রতিদ্বন্দ্বী— দেশ ভারতের সঙ্গে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্যতানের শিকার হয়ে ব্যাপক হারে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন হিন্দুরা। ফলে অমুসলমান জনগণের অনুপাত দ্রুত হ্রাস পায়। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী যে-হিন্দুরা ছিলেন জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ, ২০০১ সালে তা কমে দাঁড়ায় শতকরা দশেরও কম। চাকরি-বাকরি পাওয়াও তাঁদের জন্যে ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে। এমন কি, এখন স্বাধীন নাগরিক হিশেবে অমুসলমানদের ধর্মকর্ম পালন করা এবং বেঁচে থাকারও অধিকার কতোটা আছে, তা নিয়েও প্রশ্ন করছেন অনেকে। গত বছর দশেকে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিষয়ে। সাম্প্রদায়িকতা পাকিস্তানী আমলেও ছিলো— প্রবলভাবেই ছিলো, কিন্তু মনে হয় এখন সব পূর্বনজির ম্লান হয়ে গেছে। যদিও, স্বীকার করতে হবে, সাম্প্রদায়িকতার চেহারা এবং লক্ষ্য এখন বদলে গেছে খানিকটা।

আর পশ্চিম বাংলায় ? ১৯৯০-এর দশকের গোড়া অবধি পশ্চিমবাংলায় অহিন্দুদের প্রতি সহনশীলতা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছিলো। কিন্তু বিজেপির উত্থান এবং বাবরি মসজিদ ভাঙার পর থেকে পশ্চিম বঙ্গেও অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে বলে অনেকেই বলছেন— যেমন শিবনারায়ণ রায়, যেমন তপন রায়চৌধুরী। তাঁদের মতে, পশ্চিম বাংলায় এখন গৈরিক পতাকা উড়ছে পতপত করে। তপন রায়চৌধুরী বলেছেন যে, যাঁদের মুখে তিনি কোনোদিন সাম্প্রদায়িক মন্তব্য শোনেননি, ইদানীং তাঁদের কথা শুনে তিনি থ হয়ে গেছেন। মোট কথা, পশ্চিমবঙ্গেও সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক শক্তি সেখানে কতোটা প্রবল হয়ে উঠেছে, নির্বাচনী পরিসংখ্যান থেকেই তা পরিষ্কার দেখা যায়। উদারনৈতিক ব্যক্তিদের কাছে এটা দারুণ হতাশার খবর। কারণ, ১৯৮০-র দশকেও মনে হয়নি যে, পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার হাওয়া আবার নতুন করে বইতে পারে।

অনেকে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার এই সশব্দ পতনের জন্যে দায়ী করেছেন উপমহাদেশে ডানপন্থী রাজনীতির প্রবল উত্থানকে। দায়ী করেছেন,

বিশ্বব্যাপী ইসলামী জঙ্গীবাদী জোয়ারকে। সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে নরাধম মোদী অথবা বিন লাদেনদের কট্টর জাতীয়তাবাদী রাজনীতি যে দারুণ সাহায্য করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজনীতিই কি এর এক মাত্র কারণ ? আমার ধারণা, হিন্দু এবং মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার শেকড়টা তার চেয়েও গভীরে প্রোথিত। সাম্প্রতিক রাজনীতির চেয়ে এঁদের পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং ঘৃণা অনেক পুরোনো। জাতীয়তাবাদী রাজনীতি এখন কেবল সেই বিষবৃক্ষের গোড়ায় নতুন করে পানি ঢেলে দিয়েছে। আসলে এ বৃক্ষ অক্ষয় বটের মতো।

অল্পকিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে এক কথায় বলা যায়, বাঙালি মুসলমানরা বিদেশ থেকে আসেননি, তাঁদের চোদ্দো পুরুষ (কথার কথা— আসলে আরও বেশি) বাংলারই সন্তান। নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধ অথবা নিম্নবর্ণের হিন্দু ছিলেন এঁদের বেশির ভাগ পূর্বপুরুষ। বর্ণহিন্দুও ছিলেন। ধর্মান্তরিত মুসলমানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশাপাশি বাস করেছেন হিন্দুদের সঙ্গে, বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে। এই সান্নিধ্যবশত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক বন্ধন এখন যেটুকু আছে, তার চেয়ে আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারতো। তাঁদের মধ্যে এক সঙ্গে চলাফেরা; উৎসবে, পার্বণে তাঁদের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা; পারস্পরিক আদানপ্রদান ইত্যাদিও আরো বেশি মাত্রায় হতে পারতো। হলে সেটাই স্বাভাবিক হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে এক সম্প্রদায় আর-এক সম্প্রদায়ের ছায়াও মাড়ায়নি। এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার প্রশ্নও ওঠেনি, কারণ মুসলমানদের খেতে দেখলেও হিন্দুদের জাত যেতো— অন্তত রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের গিয়েছিলো। জাত যেতো কারণ খাওয়ার গন্ধও নাকি অর্ধভোজনের সমান। ভোজন দূরে থাক, কোনো মুসলমান ঘরে উপস্থিত থাকলে হিন্দুর পক্ষে সে ঘরে বসে জল খাওয়াও নিষিদ্ধ ছিলো।

খানাপিনা ছাড়া, সামাজিক বন্ধনের আর-একটা উপায় হলো বিবাহ। কিন্তু যেখানে ছায়া মাড়ালেও জাত যেতো, সেখানে আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহের প্রশ্নই অবান্তর। এভাবেই হিন্দু আর মুসলমান বহু শতাব্দী ধরে প্রতিবেশীর মতো বাস করলেও দুজনই দুজনকে দেখেছেন সন্দেহের চোখে, কেউ বা দেখেছেন ঘৃণার দৃষ্টিতে। হিন্দুদের চোখে মুসলমানরা পাত নেড়ে / যবন; মুসলমানদের চোখে হিন্দুরা মালাউন / কাফের। এসব শব্দের অর্থ কী, সেটা অতো গুরুতর নয়, কারণ আক্ষরিকভাবে সেই অর্থে এসব গাল দেওয়া হয় না; এসব কথা দিয়ে প্রকাশ করা হয় মনের অবিমিশ্র ঘৃণা এবং তা প্রকাশ করা হয় আক্রোশের সঙ্গে, তুচ্ছ করার মনোভাব নিয়ে।

সাধারণ বাঙালি মুসলমানরা যেমনই হন না কেন, সুলতান এবং আমীর-ওমরাহরা এসেছিলেন বঙ্গদেশের বাইরে থেকে। সরাসরি আরব-ইরান থেকে অতোটা না-হলেও, উত্তর ভারত থেকে। সেই মুসলমানদের সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বিরোধ হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ ভিন ভাষাভাষী ভিন ধর্মে বিশ্বাসী

মুসলমানরা এসেছিলেন শাসকের বেশে, হিন্দুরা ছিলেন শাসিত। তাঁদের সবচেয়ে বড়ো বিরোধ স্বার্থের, প্রতিপত্তির। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো: অভিজাত মুসলমানদের সঙ্গে স্বার্থের কারণেই অভিজাত হিন্দুদের এক ধরনের আপোশ হয়ে যায়। দেশ শাসনের জন্যে মুসলমানদের নির্ভর করতে হয় উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের ওপর। হিন্দুরা সুলতানের জায়গায় বসতে পারলেন না ঠিকই, কিন্তু শাসন-কাঠামোর বেশির ভাগটাই জুড়ে থাকলেন তাঁরা। এভাবে অভিজাতদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া এবং পারস্পরিক লেনদেনের সম্পর্ক রচিত হয়েছিলো। একত্রে পানভোজন হতো না বটে, সামাজিকভাবে মেলামেশাও ছিলো খুব সীমিত, কিন্তু অভিজাতদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো। এমন কি, তার ফলে দু-একটি বিবাহ সম্পর্কও হতো, তার খবর ইতিহাস থেকে জানা যায়। যেমন, কালাপাহাড় ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু বিয়ে করেছিলেন এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে। যেমন, ঈসা খানের পিতা ছিলেন হিন্দু। তিনিও বিয়ে করেছিলেন এক মুসলমান কন্যাকে। আর শাসক সম্প্রদায়ের সদস্য হিশেবে মুসলমানরা কন্যাপক্ষের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়ও অসংখ্য হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। এসব বিয়ে থেকে হিন্দু-মুসলমানের এক ধরনের সমন্বয় হতে পারতো, কিন্তু তা না-হয়ে এসব বিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্ক আরও খারাপ করেছিলো। যেসব হিন্দু পরিবারের কন্যাকে মুসলমানরা বিয়ে করেছিলেন, সেসব পরিবার হিন্দু সমাজে পতিত হয়েছিলো অথবা পুরোপুরি সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলো।

অভিজাতদের মধ্যে কিছু যোগাযোগের সূত্র থাকলেও, মুসলিম শাসকদের সঙ্গে সাধারণ হিন্দুদের সমন্বয় হওয়া ছিলো তার চেয়ে অনেক কঠিন। কারণ, এই দুই সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ মেলামেশা অথবা আদানপ্রদানের বিশেষ কোনো রাস্তা খোলা ছিলো না। সাধারণ হিন্দুদের সঙ্গে শাসকদের নয়, যোগাযোগ যেটুকু হতো, তা হতো সুলতানের হিন্দু কর্মচারীদের। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গেও নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের কোনো সামাজিক সম্পর্ক ছিলো না; সম্পর্ক থাকার কোনো কারণও ঘটেনি। বরং হিন্দুরা তাঁদের জাত বাঁচানোর জন্যে যেমন শূদ্রদের এড়িয়ে চলতেন, তেমনি এড়িয়ে চলতেন মুসলমানদের।

সামাজিক সোপানের বিচারে শূদ্র আর মুসলমানরা ছিলেন একই ধাপে। সেদিক দিয়ে শূদ্র এবং মুসলমানদের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটতে পারতো। কিন্তু তাও ঘটেনি। তার পেছনে একটি মাত্র কারণের কথা ভাবা যায়— সে হলো জাতিভেদ প্রথা। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিচু জাত বলে মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু— উভয়কেই ছোটো করে দেখতেন। পরিহাসের বিষয় হলো: শূদ্রের পক্ষেও সেই জাতিভেদের নিয়ম ভঙ্গ করা সম্ভব ছিলো না। তাই সমাজের একেবারে নিচের ধাপে অবস্থিত যে-বিপুল জনসাধারণ— মুসলমান এবং নমশূদ্ররা— তাঁরাও কাছাকাছি আসতে পারলেন না।

রবীন্দ্রনাথ সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি ঠিকই ধরেছিলেন যে, হিন্দুর ধর্মীয় বিধিবিধান খুব আলগা— তাতে সবই চলে। সবাইকে হিন্দু বলে গ্রহণ করা যায়। সে ধর্মের আওতায় বুদ্ধও অবতারে পরিণত হন। খৃস্টান এবং মুসলমানদেরও হিন্দু বলে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এই ধর্মীয় উদারতা সত্ত্বেও হিন্দু ধর্মের আচার খুব কঠোর। আর মুসলমানদের অবস্থান তার ঠিক উল্টো। ধর্মের অনুশাসন খুবই মজবুত। চুন থেকে পান খসারও উপায় নেই তাতে। কিন্তু আচার নিতান্তই শিথিল। ফলে খাওয়া-দাওয়ায়, চলাফেরায় মুসলমানরা অন্যদের সঙ্গে অবাধে মিলিত হতে পারলেও, হিন্দুরা তাঁদের গ্রহণ করতে পারেননি। আবার হিন্দুরা ধর্মের আওতায় মুসলমানদের সমন্বিত করতে চাইলেও মুসলমানরা সেখানে মিলিত হতে পারেননি। ফলে বহু কাল ধরে একত্রে বাস করেও হিন্দু-মুসলমানরা ভাই-ভাই তো হতেই পারেননি, এমন কি সৎ প্রতিবেশীও না।

তবে ঘনিষ্ঠতা অথবা আত্মীয়তা তৈরি না-হলেও, ধর্মীয় কারণে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে রোজ মাথা ফাটাফাটি হতো না। বিবাদ-বিসংবাদ যা হতো, তা হতো প্রধানত অবস্থাপন্নদের মধ্যে। যেমন, কাজীর সঙ্গে কাজিয়া হওয়ার কথা অথবা হিন্দু জমিদার আর মুসলমান জমিদারের লড়াইয়ের কথা মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে জানা যায়। কিন্তু সেটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিলো না। বরং সেকালের সাহিত্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে-খবর জানা যায়, তা হলো: গ্রাম সম্পর্কে চাচা অথবা মামা হওয়ার কথা। অর্থাৎ ভেদাভেদ সত্ত্বেও এক ধরনের সদ্ভাব সমাজের নিচের তলার মানুষের মধ্যে ছিলো। এমন কি, গ্রাম বাংলার কবিরা কৃষ্ণ আর মোহাম্মদের সমন্বয়ও ঘটাতে পেরেছিলেন। মুসলমানরা হিন্দু দেবীকে শ্রদ্ধা দেখাতেন, হিন্দুরা পীরের মাজারে ধর্না দিতেন। একই ব্যক্তিকে হিন্দুরা বলতেন সত্যনারায়ণ, মুসলমানরা বলতেন সত্যপীর।

সেই অবস্থা বদলাতে আরম্ভ করে ইংরেজ শাসন-আমলে। যতো দিন মুসলমানরা দেশ শাসন করেছিলেন, ততোদিন যবন-বিদ্বেষ ছিলো না, তা নয়। কিন্তু ইংরেজদের আমলে তা বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। এর পেছনে ইংরেজদের অবদান ছিলো যথেষ্ট। এই অবদান দু রকমের। একটা অপরিকল্পিত, একটা পরিকল্পিত।

প্রথমে নজর দেওয়া যাক অপরিকল্পিত অবদানের দিকে। আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে উইলিয়াম জোনসের নেতৃত্বে প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদরা ভারতবর্ষ নিয়ে যে-গবেষণা আরম্ভ করেন, তার ফলে ভারতবর্ষের ভুলে-যাওয়া অতীত গৌরবের ইতিহাস অনেকটাই আলোতে আসে। মোটামুটি ১৮৩০ সালের পর থেকে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুরা এ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন। এই সচেতনতা থেকে তাঁদের মধ্যে এক ধরনের স্বাজাত্যবোধ জেগে ওঠে। অতীত গৌরবকে ম্লান, এমন কি, ধ্বংস করার জন্যে তাঁরা দায়ী করেন যবনদের। যবন শব্দটাও ১৮৩০-এর দশক থেকেই নতুন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই স্বাজাত্যবোধ থেকেই ১৮৬০-এর দশকে জন্ম নেয়

একটা জাতীয়তাবোধের, রাজনীতি সচেতনতার। এই জাতীয়তাবোধের পরিধিতে মুসলমানদের কোনো জায়গা ছিলো না। ১৮৬০-এর দশকের হিন্দু মেলার কার্যক্রম এবং ১৮৭০-এর দশকের নাট্যরচনা থেকে এই যবনবিরোধী জাতীয়তাবোধের স্বরূপ পরিষ্কার বোঝা যায়। এর পর ১৮৮০-র দশকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে-সক্রিয় রাজনীতির উদ্ভব, তাও হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করেনি।

ইংরেজদের সচেতন প্রয়াস ছাড়াই আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ঘটনা ঘটেছিলো কলকাতাকে কেন্দ্র করে। এর প্রত্যক্ষ কারণ নগরায়ন এবং ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা এবং চাকরি-বাকরির মাধ্যমে সেখানে যে-হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে, তা ছিলো মুসলমান এবং শূদ্রবর্জিত হিন্দুদের। এই হিন্দুরা উনিশ শতকের কলকাতায় একটা নব্য সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিলেন। ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদিতে সৃজনশীলতার যে-অভূতপূর্ব স্ফূরণ ঘটে, তাতে মুসলমান এবং শূদ্রদের যেমন কোনো অবদান ছিলো না, তেমনি তা থেকে তাঁদের লাভবান হওয়ারও বিশেষ কোনো সুযোগ ছিলো না।

বঙ্গীয় পুনর্জাগণের রাজপথ ধরে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বহু দূর এগিয়ে যান। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ— মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুরা— পড়ে থাকেন যে-তিমিরে তাঁরা ছিলেন, সেই তিমিরে। ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমান এবং নমশূদ্রদের ব্যবধান বাড়তে থাকে। এই পরিবেশে বাঙালির স্বরূপের ক্ষেত্রেও একটা পরিবর্তন সূচিত হয়। উনিশ শতকের বেশির ভাগ সময় কলকাতায় মুসলমানদের সংখ্যা যথেষ্টই ছিলো— হিন্দুদের প্রায় অর্ধেক। কিন্তু তাঁরা ছিলেন অবাঙালি। তাই কলকাতায় বাংলাভাষীদের নিয়ে শিক্ষা, ভাষা-সাহিত্য, চিন্তাভাবনা, উৎসব-আনন্দ, সামাজিক আদানপ্রদানের যে-নতুন পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে তা ছিলো একান্তভাবেই বাঙালি হিন্দুদের। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের। সেই পরিবেশে যাঁরা বাঙালি বলে পরিচিত হন, তাঁরা সবাই হিন্দু। সত্যিকার অর্থে সেই হিন্দুদের মধ্যে শূদ্ররাও ছিলেন না, তবে শূদ্ররা হিন্দু বলে বাঙালিদের তালিকা থেকে বাদ পড়লেন না, কিন্তু বাদ পড়লেন মুসলমানরা। বাদ পড়লেন কারণ তাঁরা বাংলায় কথা বলতেন না। বাঙালি বলে নিজেদের পরিচিতও করতেন না। সেই যে বাঙালি আর মুসলমানের অবিশ্বাস্য অভিধা তৈরি হয়েছিলো, এখনো অবধি কলকাতায় তা পুরোপুরি লোপ পেয়েছে বলে মনে হয় না।

এবারে দেখা যাক, সম্প্রদায়িকতার প্রসারে ইংরেজরা পরিকল্পিত অবদান রেখেছিলেন কিভাবে এবং কেন। রাজত্ব স্থাপনের পর থেকেই মুসলমানদের কোণঠাসা করার নীতি ইংরেজ শাসকরা গ্রহণ করেছিলেন। রাজভাষা হিশেবে ফারসিকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে ইংরেজির প্রবর্তন থেকে তার সূচনা। অবশ্য তার ফলে হিন্দুরা বাড়তি সুযোগ পেলেও এবং অভিজাত মুসলমানরা বেকায়দায় পড়লেও, সরাসরি সাম্প্রদায়িকতা জন্ম নেয়নি। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয় উনিশ শতকের

দ্বিতীয়ার্ধে। সিপাহী বিপ্লব ইংরেজ রাজত্বের ওপর প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়েছিলো। তখন শাসকরা অনুভব করেন যে, দেশ শাসনের কৌশল বদালানো দরকার। অতঃপর যে-কূট কৌশল তাঁরা অবলম্বন করেন— সবারই তা জানা আছে— হিন্দু আর মুসলমানদের দু ভাগ করে— এক ভাগকে অন্য ভাগের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো। কিন্তু লেখাপড়া থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি বিষয়ে মুসলমানরা তখন এতোই পিছিয়ে ছিলেন যে, চেষ্টা করলেও তাঁদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো বড়ো একটা সম্ভব ছিলো না। সেটা সম্ভব হয় উনিশ শতকের একেবারে শেষ দিকে। আর, সে সুযোগ আরও বৃদ্ধি পায় বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে।

হিন্দুদের প্রবল আন্দোলনের মুখে ভঙ্গ বঙ্গ জোড়া লাগলেও হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্ক কখনো জোড়া লাগেনি। বরং ইংরেজদের সুনিপুণ পরিকল্পনায় তাঁদের অনৈক্য ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁদের পৃষ্ঠপোষণার মুসলিম লীগ গঠিত হয়। হিন্দুরা হিন্দু মহাসভা গঠনে করেন। তারপর ১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ সালের আইন সংস্কারের মাধ্যমে ইংরেজরা ভদ্রলোকদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বলতে গেলে সোনার থালায় সাজিয়ে বেশির ভাগটাই মুসলমানদের এবং খানিকটা নমশূদ্রদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তার আগে পর্যন্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুরাই রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নমশূদ্র এবং বাঙালি মুসলমানরা নেতৃত্ব দেওয়া দূরে থাক, রাজনীতিতে যোগই দেননি। বরং অবাঙালি মুসলমানদের কেউ কেউ রাজ-অনুগ্রহে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পরে যখন ইংরেজরা সুপরিকল্পিতভাবে ভদ্রলোকদের অর্থাৎ হিন্দু মধ্যবিত্তদের ক্ষমতা খর্ব করার পরিকল্পনা করেন, তখন বাঙালি মুসলমান এবং নমশূদ্ররা প্রথমবারের মতো খানিকটা সত্যিকার ক্ষমতার স্বাদ লাভ করেন।

একে-একে কলকাতা কর্পোরেশান, জেলা বোর্ড এবং বিধান সভার এককালের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভদ্রলোকদের হাত থেকে যতোটা মুসলমানদের হাতে চলে যায় এবং মুসলমানদের জন্যে চাকরির কোটা যতো বেশি বরাদ্দ হতে থাকে, হিন্দুদের প্রত্যক্ষ রোষ ততোটাই বর্ষিত হয় তাঁদের ওপর। তাঁরা অবশ্য হিন্দুদের রোষ অগ্রাহ্য করে ইংরেজদের কৃপা বর্ষণকে স্বভাবতই দু হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ১৯২০-এর দশকে ভদ্রলোকরা যেখানে ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতার মাধ্যমে স্বরাজের আন্দোলন করছিলেন এবং তাতে খানিকটা সাফল্যও লাভ করেছিলেন, মুসলমানরা সেখানে করছিলেন ইংরেজদের দালালি। ফলে স্বরাজের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিলো। মুসলমানদের এই কৌশল হিন্দুদের হতাশ এবং ক্রুদ্ধ করেছিলো। এভাবে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের ঘৃণা ধূমায়িত হতে থাকে সেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে— যাঁরা শিক্ষা নয়, বিত্ত নয়, কেবল সংখ্যার কারণে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষণা নিয়ে রাজনৈতিক প্রধান্য লাভ করছিলেন। এ সত্ত্বেও মোটামুটি ১৯৩০ সাল পর্যন্ত নমশূদ্ররা বর্ণহিন্দুদের থেকে খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখেন; আবার মুসলমানদের মধ্যেও বাঙালি-অবাঙালি ভেদে

বাঁধন খানিকটা আলগা ছিলো। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিক থেকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি যখন প্রবল হয়ে দেখা দিলো, তখন গোটা জনসাধারণ হিন্দু এবং মুসলমান— এই দুই শিবিরে বিভক্ত হলো। উচ্চ ও নিম্নবর্ণ ভেদে হিন্দুরা সবাই ভাই-ভাই হয়ে গেলেন, আর বাঙালি-অবাঙালি ভেদে মুসলমানরাও ভাই-ভাই হলেন। এভাবে ১৯৪০-এর দশকে এসে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তৈরি হলো চীনের প্রাচীরের মতো দুর্ভেদ্য দেয়াল। মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছে হিন্দুদের এই পরাজয় চিরস্থায়ী হয় ১৯৪৭ সালে। ভাগ্যের পরিহাস: যে-হিন্দুরা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন, সেই হিন্দুরাই ১৯৪৭ সালে মুসলমানদের প্রাধান্য থেকে বাঁচার জন্যে যুক্তবঙ্গের বিরোধিতা করেন।

বাংলাদেশের মুসলমানরা এখন অর্থে, বিত্তে, প্রতিপত্তিতে বাংলাদেশের হিন্দুদের যোজন যোজন ছাড়িয়ে গেছেন, তাই প্রতিবেশী হিন্দুদের প্রতি তাঁরা আর ঈর্ষা বোধ করেন না। যাঁরা বিবেকবান, তাঁরা বরং হিন্দুদের অনুকম্পা করেন; আর যাঁরা বিবেকহীন (এঁদের সংখ্যাই শতকরা ৯০ ভাগ) তাঁরা হিন্দুদের প্রায় পরগাছার মতো ঘৃণা করেন। এই ঘৃণার সঙ্গে নাৎসি জার্মেনির খানিকটা তুলনা চলে। নাৎসিরা ইহুদীদের মানুষেতর প্রাণীর মতো ঘৃণা করতেন। তাঁদের খেদিয়ে দেশটাকে শুদ্ধ আর্যদের দেশে পরিণত করার জন্যে তাঁরা তাই তৎপর হয়েছিলেন। একুশ শতকের গোড়ায় হিন্দুদের প্রতি বাংলাদেশের বেশির ভাগ মুসলমানের মনোভাব সেই রকম বলেই আমার ধারণা। বাড়িতে আগুন লাগিয়ে এবং মেয়েদের ধর্ষণ করে তাঁদের তাড়িয়ে দিয়ে দেশটাকে কলঙ্কমুক্ত এবং পাক-সাফ করতে পারলে এই মুসলমানরা স্বস্তি পেতেন। এবং যেভাবে দেশ চলছে তাতে তাঁদের বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের মতো এই মুসলমানরা পাখাওয়ালা ক্ষুদ্র একটি প্রাণী মেরে হাত নোংরা করার মতো হিন্দু মেরে হাত নোংরা করার প্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত হিন্দুরা চাকরি-বাকরিতে ১৯৩০ এবং ৪০-এর দশকে মুসলমানদের সঙ্গে যে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, এখন আর তা নেই। মিউনিসিপালিটি, প্রাদেশিক সরকারেও মুসলমানদের আপদ বিদেয় হয়েছে, ক্ষমতা এখন একেবারে নিরঙ্কুশ। এই অবস্থায় মুসলমানদের প্রতি মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মনোভাব খানিকটা উদার হয়েছে। এঁদের মধ্যে যাঁরা সত্যিকার উদার তাঁরা মুসলমানদের সম্পর্কে কৌতূহলও দেখান— যেমন শিবনারায়ণ রায়, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, অম্লান দত্ত, সুনীল গাঙ্গুলি প্রমুখ। কিন্তু শিক্ষিত হিন্দুদের সিংহ ভাগের মনোভাব ঠিক তেমন নয়। দেখাসাক্ষাৎ হয় না বলে মুসলমানদের যবন বলে দুই বেলা গাল দেওয়ার দরকার করে না; কিন্তু মুসলমান কেটা তা জানারও কোনো আবশ্যক তাঁরা বোধ করেন না। মুসলমানদের দিকে তাঁরা আগের মতোই পিঠ ফিরিয়ে আছেন। তাই তাঁদের ধরতব্যের মধ্যে জ্ঞান করেন না। চাকরি-বাকরিতে

এঁদের ভাগ্নে প্রার্থী হলে মুসলমান প্রার্থী নিতান্তই অবাঞ্ছিত গণ্য হন। বিপুল জনগোষ্ঠীর মনোভাব কেমন তার একটা প্রতিফলন দেখা যায় রাজনৈতিক হাওয়া কোন দিক দিয়ে বইছে— তা থেকে। ৯০-এর দশক থেকে তা যে-খুবই বদলে গেছে, তা বোঝা যায় ক্ষমতার লোভে উদারপন্থীরা যেভাবে বিজেপির সঙ্গে কাঁধ মেলান, তা থেকে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত হিন্দুরা বাংলাদেশের মুসলমানদের বরং খানিকটা খাতির করেন, কারণ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে এই মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষায় অনেকটা তাঁদের সমকক্ষ হয়ে উঠেছেন। অপর পক্ষে, প্রতিবেশী মুসলমানদের প্রতি তাঁরা অমন প্রেমের দৃষ্টিতে তাকান না। দু-একজন হোসেনুর রহমানকে এর অন্তর্ভুক্ত করছিনে। বাংলাদেশের মুসলমানদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে ক্ষতি নেই, লাভও হতে পারে। তবে প্রতিবেশী মুসলমানরা প্রতিযোগিতায় নামতে পারেন, তাঁদের সম্পর্কে সতর্ক থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের সঙ্গে বাংলাদেশের হিন্দুদের আর-একটা পার্থক্য রয়েছে— রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চবিত্তের মুসলমানদের এখনো খানিকটা রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে, খুব সম্ভব সেখানে গণতন্ত্র আছে বলেই। কিন্তু বাংলাদেশে সত্যিকার গণতন্ত্র নেই বলে সেখানকার হিন্দুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা একেবারে লোপ পেয়েছে। গয়েশ্বর রায়ের মতো এক-আধজন কর্তাভজা মন্ত্রীর নাম মাঝেমধ্যে শোনা যায় বটে, কিন্তু সে কেবল অন্তত একটা হিন্দুর নাম রাখতে হয়, না-হলে দেখতে খারাপ দেখায়— সেই চক্ষুলজ্জার কারণে। মন্ত্রী হলেও এঁরা পুতুলেরও অধম। এ রকম লোকের মন্ত্রণা সহকর্মীরা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনাও করেন না।

মোট কথা, কি পশ্চিমবঙ্গে, কি বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বাঙালি হিন্দু এবং মুসলমানদের মজ্জাগত। দু জায়গায় তার প্রকাশ সামান্য ভিন্নরূপে, কিন্তু তার তেজ কোথাও কম নয়। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা মুসলমানদের তুচ্ছ করে দেখেন, প্রতিপক্ষ বলে গণ্য করেন না। যাঁরা এখনো জাতপাতে বিশ্বাসী তাঁরা মুসলমানদের ইতর প্রাণীর মতো ঘৃণাও করেন। অপর পক্ষে, বাংলাদেশের মুসলমানরা হিন্দুদের আদৌ প্রতিপক্ষ বলে গণ্য করেন না, বরং তাঁদের বিবেচনা করেন অবাঞ্ছিত প্রতিবেশী হিশেবে। আমার ধারণা, তাঁদের হাতে আলাদীনের প্রদীপ থাকলে এক মুহূর্তে এই হিন্দুদের হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দেশকে কলঙ্কমুক্ত করতেন (এবং তাঁদের ভিটেমাটি দখল করতেন)।

এক কথায় বলতে পারি, টিকি এবং দাড়ির সাম্প্রদায়িকতা— উভয়ই নিখাদ; উভয়ই অতিপ্রাচীন, উভয়ই জগদ্দল পাথরের মতো। কেবল রাজনীতির পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার ঢেউ কখনো আকাশ ছুঁয়ে আসে, কখনো তার উচ্চতা একটু হ্রাস পায়। একান্নবর্তিতা ভেঙে গেলে অনেক সময় ভাই-ভাইয়ে সম্পর্ক ভালো হয়।

দেশবিভাগ সে ভূমিকা খানিকটা পালন করলেও, পুরোপুরি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তার পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর-একবার সেই সোনালি সুযোগ এনে দিয়েছিলো, কিন্তু স্বভাব যায় না মলে, সে সুযোগও করুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক কট্টর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে সাম্প্রদায়িকতার বন্যা বরং সব কিছু সয়লাব করে দিয়েছে। এখন মানুষের চেয়ে ক্ষমতা বড়ো। মানুষের চেয়েও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষা করার প্রয়োজন অনেক বেশি। আদিভৌতিক শক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি, নয়তো বলতাম:

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য / করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

(*দৈনিক স্টেটসম্যান*, পূজা সংখ্যা, ২০০৬)

১৬
লক্ষ্য ও পন্থা

আপনার একমাত্র লক্ষ্য যদি হয়: মাথা ধরা ভালো করা, তা হলে তার মোক্ষম ওষুধ বলে দিতে পারি আপনাকে! প্যারাসিটামল অথবা অ্যাসপিরিন নয়— তার থেকে অনেক কার্যকর। মাথাটা কেটে ফেলুন, ব্যস, মাথা ধরা সেরে যাবে। গ্যারিন্টি দিতে পারি! তবে আপনি একে গ্রহণযোগ্য সমাধান বলে মেনে নেবেন কিনা, সে আপনিই জানেন। অন্য পন্থাও আছে। ওষুধ খেয়ে ভালো হতে পারে। কিছুক্ষণ শান্ত থাকলে অথবা বিশ্রাম করলে ভালো হতে পারে। এমন কি, এমনিতেও ভালো হতে পারে। অর্থাৎ লক্ষ্য নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। বিতর্কটা পন্থা নিয়ে। আমার বিবেচনায় মাথা ধরা ভালো করার জন্যে মাথা কেটে ফেলাটা মোটেই সন্তোষজনক পন্থা নয়। তার অর্থ লক্ষ্য অর্জনই একমাত্র কাম্য হতে পারে না। কিভাবে সেই লক্ষ্য অর্জন করছেন, সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

খৃস্টের জন্মের আগেই গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লিস বলেছিলেন যে, ভালো লক্ষ্য হাসিল করতে গিয়ে অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়া অন্যায় নয়। রোম্যান কবি ওভিদও বলেছিলেন কমবেশি একই কথা। এ রকমের দুজন বিখ্যাত লোক বলা সত্ত্বেও, লক্ষ্য লাভের জন্যে যে-কোনো পন্থার আশ্রয় নেওয়া যুক্তিযুক্ত অথবা নৈতিক— এ কথা অনেকেই মানতে পারেননি। বস্তুত, এ নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে। কোন জিনিশটা ভালো, কোন জিনিশটা মন্দ, তার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। যা চোরের কাছে ভালো, সেটা গৃহস্থের কাছে খারাপ। গরু মরলে শকুনের জন্যে সেটা ভালো হয় বটে, তবে গরু অথবা গরুর মালিকের জন্যে সেটা আদৌ সুখবর নয়। কাজেই কোনটা ভালো, কোনটা ভালো নয়, সেই কূটতর্কের মধ্যে না-গিয়েও কেবল লক্ষ্য এবং পন্থা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

বেশির ভাগ ধর্ম এবং নৈতিকতা অনুযায়ী লক্ষ্য ভালো হলেও অন্যায্য পন্থা গ্রহণের নীতিকে সমর্থন করা হয় না। মহাভারতের গল্প দিয়ে এর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। দ্রোণাচার্যকে সরাতে না-পারলে পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ জয়ের কোনো উপায় ছিলো না। কৃষ্ণ জানতেন, দ্রোণাচার্যকে যদি বলা হয় যে, তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা নিহত হয়েছেন, তা হলে তিনি যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াবেন। কৃষ্ণের বুদ্ধিতে পাণ্ডবরা তাই মিথ্যের আশ্রয় নিয়েই চীৎকার করে বললেন "অশ্বত্থামা হত"। দ্রোণাচার্য বললেন যে, এ কথা তিনি বিশ্বাস করবেন যুধিষ্ঠির বললে। কিন্তু সত্যবাদী যুধিষ্ঠির এই মিথ্যে বলতে রাজি ছিলেন না। তাই অশ্বত্থামা নামে ইন্দ্রবর্মার যে-হাতিটি ছিলো, সেটি মেরে ফেলা হয়। তখন যুধিষ্ঠির চীৎকার করে বললেন, "অশ্বত্থামা হত।" তারপর গলা নামিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, "... ইতি গজ।"— পুরো

বাক্যটা দাঁড়ালো— অশ্বত্থামা হত ইতি গজ— অশ্বত্থামা নামে হাতি নিহত হয়েছে। দ্রোণাচার্য "ইতি গজ" শুনতে পাননি। যাতে শুনতে না-পান, তার জন্যেই যুধিষ্ঠির নিম্নকণ্ঠে ইতি গজ বলেছিলেন। অর্থাৎ তিনি যা বলেছিলেন, তা সত্য; কিন্তু পুরো সত্য নয়। এবং সেই অর্ধসত্য দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর কারণ হয়। যুদ্ধ জয়ের লক্ষ্য সফল করার জন্যেই যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে এই অর্ধসত্য বলানো হয়েছিলো। আর, এই অর্ধসত্য বলার জন্যে তাঁকে নরকে থাকতে না-হলেও মৃত্যুর পর নরক দর্শন করতে হয়েছিলো।

এ গল্প থেকে যা বোঝানো হচ্ছে, তা হলো ভালো কাজে সাফল্য লাভ করার জন্যেও খারাপ কাজ করা যাবে না। করলে তার জন্যে শাস্তি হবে। সুতরাং লক্ষ্য যতোই মহৎ হোক না কেন, সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে অন্যায়কে সমর্থন করা যায় না— অন্তত নৈতিকতার বিচারে।

কিন্তু নীতিবাদ যা-ই বলুক না কেন, মতবাদ এবং আদর্শবাদে বিশ্বাসী লোকেরা নীতির কথা মানেন না। তাঁদের কাছে নীতি অথবা মানুষের চেয়ে মত এবং সে মতের বাস্তবায়ন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের কথা হলো: মারি অরি পারি যে কৌশলে! দরকার হলে ছলে, বলে, কলে, কৌশলে, ন্যায্য, অন্যায্য যে-কোনো উপায়ে তাঁরা চান তাঁদের মতবাদকে বাস্তবায়িত করতে। অনেক দার্শনিকই তাই ভালো উদ্দেশ্যের জন্যে যেটা কম খারাপ সেটাকে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। ধরা যাক, সন্ত্রাসবাদীরা একটি যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে একটা নগরীর আকাশে এসেছে। তারা এই বিমানের ধাক্কায় একটা উঁচু ভবন ধ্বংস করতে চাইছে। বিমানে আছেন শতাধিক যাত্রী। আর উঁচু ভবনটি ধ্বংস করলে মারা যাবেন হাজার হাজার লোক এবং প্রভূত ক্ষতি হবে ঐ নগরীর। এটা ঠেকানোর একটা উপায় হলো ভবনের ওপর ধাক্কা দেওয়ার আগেই ঐ বিমানটিকে ধ্বংস করা। অনেক দার্শনিকের কাছে এই বিমানটি ধ্বংস করা যুক্তিযুক্ত। কারণ, তার ফলে কম লোকের জীবন হানি হবে। কিন্তু নৈতিকতার দিক দিয়ে এটা কি সমর্থন যোগ্য? নীতিবাগীশদের মতে, এটা অনৈতিক কারণ ঐ শতাধিক নিরপরাধ যাত্রীরও বাঁচার অধিকার আছে। ছিনতাইকারীদের হাতে তাঁরা মারা যেতে পারেন— মারা যাবেন এটা প্রায় নিশ্চিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছিনতাইকারীরা ভবনে আঘাত করবে কিনা অথবা আঘাত করতে পারবে কিনা, তার নিশ্চয়তা নেই। এমন কি, আঘাত করলেও কোনো অলৌকিক কারণে কোনো কোনো যাত্রী হয়তো বেঁচেও যেতে পারেন। সুতরাং বাস্তবের যুক্তিতে যাই হোক, অন্তত তত্ত্বের যুক্তিতে বিমানটি ধ্বংস করা অনৈতিক ব্যাপার।

অপর পক্ষে, উপযোগিতাবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকরা এই নৈতিকতাকে অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তিকে বিসর্জন দেওয়া অন্যায় নয়। বেশি মানুষের কল্যাণের জন্যে অল্প সংখ্যক মানুষের অমঙ্গল হলেও তাঁদের কাছে সেটা

গ্রহণযোগ্য। ফরাসি বিপ্লবের দার্শনিকরা মনে করেছিলেন যে, বৃহত্তর জনগণের উপকারের জন্যে কিছু লোকের রক্তপাত ঘটানো কিছু অন্যায় নয়। ফরাসি বিপ্লব কেন, সব বিপ্লবের পেছনেই কাজ করে এই আদর্শ, এই যুক্তি। এমন কি, ধর্মযুদ্ধ অথবা ধর্মীয় বিপ্লবের পেছনেও।

কার্ল মার্কস ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। কেবল ব্যাখ্যা নয়, তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ তৈরি হবে। তাঁর বিশ্লেষণ মেনে নিয়ে বামপন্থী রাজনীতির সূত্রপাত। সেই রাজনীতিতে প্রথম সফলতা আসে রাশিয়ায়। বলশেভিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট শাসন-ব্যবস্থা। তারপর সেই শাসন-ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে এবং তাকে সম্প্রসারিত করে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে চলতে থাকে এই নীতির প্রয়োগ। সে নীতির সামনে ব্যক্তি অথবা ব্যক্তির স্বার্থ বিবেচনার যোগ্য নয়। সমষ্টিই একমাত্র বিবেচ্য। তা ছাড়া, সব ক্ষমতারই ভেতরেই থাকে বিকৃতির বীজ। যে-ক্ষমতা যতো নিরঙ্কুশ সেই ক্ষমতা ততো প্রবলভাবে বিকার লাভ করে। সেই বিকৃতি ক্যান্সারের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ক্ষমতার প্রতিটি কোষে। স্তালিন অংশত নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার লোভে, অংশত দল ও কমিউনিজমের শ্রীবৃদ্ধির দোহাই দিয়ে লাখ লাখ লোকের প্রাণ নিয়েছিলেন। একমাত্র ইউক্রেনেই ১৯২৯-৩০ সালে পনেরো লাখ লোককে না-খাইয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। সাইবেরিয়ার শ্রম-শিবিরে পাঠিয়ে ছিলেন লাখ লাখ লোক। কিন্তু তাতে স্তালিন অথবা কমিউনিস্ট কর্মীরা কিছুমাত্র বিবেকের দংশন অনুভব করেননি। কারণ, কোটি কোটি প্লোলেটারিয়েটের রাজত্ব স্থাপনই তাঁদের লক্ষ্য ছিলো। তাঁদের মতে, তার জন্যে লাখ লাখ লোকের প্রাণহানিও যুক্তিযুক্ত।

মাও সে তুংও ছিলেন একই নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁর চেয়ে অনেক উৎসাহী এবং কট্টর বিশ্বাসী ছিলেন পল পট। তিনি যতো কম সময়ের মধ্যে যতো বেশি লোক মেরেছিলেন তাতে মানুষ মারার দৌড়ে তিনি স্তালিন এবং মাওকে অনায়াসে হারিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ির কাছের এবং সাম্প্রতিক কালের কমিউনিস্টরাও ছোটো ছোটো স্তালিন, মাও, পল পট। এঁরা কেউ কেউ বেশি সাফল্য লাভ করেছেন। বেশি সাফল্য লাভ করে ইতিহাসে কারো চোখে খ্যাত, কারো চোখে কুখ্যাত হয়েছেন। তার অর্থ বেশি সংখ্যক মানুষের ভালো করতে গিয়ে মার্কসপন্থীরা অনেক লোকের ক্ষতি, এমন কি, প্রাণহানি করছেন। নীতিবাদীদের চোখে এটা গ্রহণযোগ্য না-হলেও উপযোগিতাবাদীদের চোখে এটাই করণীয়।

মার্কসবাদীদের মতো হিটলারও এক ধরনের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিও তাঁর জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে ষাট লাখ ইহুদী আর জিপসিকে মেরেছিলেন। তুর্কীরা তাঁদের জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে না-খাইয়ে মেরেছিলেন

আর্মেনিয়ানদের। নিজেদের জাতীয় স্বার্থে জাপানীরা লাখ লাখ লোককে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন কোরিয়ায়, চীনে, মাঞ্চুরিয়ায়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। জাপানীরা এখন প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন ক্ষমতায় সমগ্র বিশ্বে প্রথম সারিতে আছেন। গণহত্যা এবং নির্যাতনেও তাঁরা নানা বৈচিত্র্য এবং উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে প্রথম সারিতে ছিলেন।

পশ্চিমা বিশ্বে ব্যক্তির স্বার্থকে সবচেয়ে মূল্যবান মনে করা হয়। তা সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের ওপর আণবিক বোমা ফেলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। আণবিক বোমার ফলাফল সম্পর্কে ভালো করেই জানতো যুক্তরাষ্ট্র, তবু দ্বিধা করেনি। এমন কি, তিন দশক ধরে নিজেদের মতবাদ এবং স্বার্থের খাতিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে লাখ লাখ লোক মারতে এবং অথবা তাঁদের ওপর নির্যাতন করতেও কিছুমাত্র পিছুপা হয়নি।

সম্প্রতি গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার রক্ষার নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা দেশগুলো, ধরা যাক, ইরাকে যে-অভিযান চালিয়েছে তার ফলে হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছেন এবং নারী ও শিশুসহ হাজার হাজার লোকের ওপর অমানবিক অত্যাচার চালানো হয়েছে। যে-অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হওয়ায় বুশের মতো সাম্রাজ্যবাদী মতবাদে বিশ্বাসী লোকও লজ্জিত হয়েছেন। সাদ্দাম হোসেনের একনায়কত্ব থেকে রক্ষা করে ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে যে-পন্থা বেছে নেওয়া হয়েছে, তাকে কি সমর্থন করা যায়?

এমনি, আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। পশ্চিমা দেশে সাম্প্রতিক কালে পশুদের অধিকার নিয়ে অনেক লোক আন্দোলন করছেন। গবেষণাগারে পশুদের ওপর ওষুধ পরীক্ষা করার ফলে পশুদের কষ্ট হয় এবং অনেক পশুর প্রাণ যায়। আন্দোলনকারীরা এই অসহায় পশুদের হয়ে লড়াই করছেন। আপাতদৃষ্টিতে এটা নৈতিকতার কথা ঠিকই। কিন্তু এর জন্যে তাঁরা অনেক সহিংসতার আশ্রয় নিচ্ছেন। এমন কি, মানুষের প্রাণও নিয়েছেন। পশুদের ক্লেশ নিবারণ করার লক্ষ্য অর্জনের জন্যে তাঁরা যে-সহিংসতার পন্থা বেছে নিয়েছেন, তাকে সমর্থন করা যায় কি?

উপযোগিতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, মার্কসবাদ— সব "বাদের"ই মূল কথা তার লক্ষ্য হাসিল করা, ব্যক্তি অথবা মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা নয়। কেবল তাই নয়, সেই লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে যে-কোনো পন্থা অবলম্বনকে এই মতবাদীরা অন্যায় বা অনৈতিক বলে মনে করেন না। কিন্তু এই পন্থার শিকার হন যাঁরা, বলা বাহুল্য, তাঁরা একে মেনে নিতে পারেন না। বরং এর সমালোচনা করেন তাঁরা। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সব তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধ চলে, তা এক পক্ষের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ, বিরোধীদের দৃষ্টিতে তা দুষ্কৃতি। ফিলিস্তিনীরা ইসরাইলের দখলদারি এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে-বোমাবাজি অথবা হত্যা এবং সন্ত্রাস চালাচ্ছেন,

তাকে তাঁরা অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধ বলে বিবেচনা করেন। এমন কি, অনেকে তাকে ধর্মযুদ্ধ বলেও বিশ্বাস করেন। অনেকে সেই যুদ্ধে স্বেচ্ছায় জীবন দিয়ে ধন্য হতে চান এবং তার মাধ্যমে পুণ্য অর্জন করতে চান। কিন্তু তাঁরা যখন ইসরাইলী সামরিক লক্ষ্যবস্তু ছাড়া অন্য কিছুর ওপর আক্রমণ করেন অথবা নিরপরাধ লোককে হত্যা করেন, তখন তাকে নীতিবাগীশ বা মানবাধিকারবাদীরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারেন না।

এমন কি, প্রায় সব লোকই যাকে মনে করেন ঐশ্বরিক, পবিত্র এবং অবশ্য পালনীয়, সেই ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা ধর্মের নামে উৎসাহী ধার্মিক কর্মীরা অধর্ম করতে বিবেকের দংশন অনুভব করেন না। যেমন, ধরা যাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খৃস্টান মৌলবাদীদের একাংশ ধর্মীয় কারণে গর্ভপাতকে এতো অন্যায় বলে মনে করেন যে, গর্ভপাত করান যে-ডাক্তাররা, তাঁদের কয়েকজনকে তাঁরা খুন করেছেন। বা ধরা যাক, ভারতে রামমন্দির নির্মাণ করার নামে শত শত মুসলমান হত্যা করতে দ্বিধা করেননি হিন্দু ধর্মের উৎসাহী কর্মীরা। সেই রামমন্দিরের শতশত মাইল দূরের বাংলাদেশেও হিন্দুদের মারতে অথবা তাঁদের নারীদের ধর্ষণ করতে দ্বিধা করেননি কিছু মুসলমান। এ রকমের আর-একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হলো: ইসলামী জাতীয়তাবাদের নামে উড়োজাহাজ দিয়ে নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংস করার ঘটনা। নিরপরাধ ও অসহায় যাত্রীদের নিয়ে নিজেরা মরতে অথবা টুইন টাওয়ারের নিরপরাধ হাজার হাজার লোককে মারতে দ্বিধা করেননি আল-কাইদার ইসলামী সন্ত্রাসীরা। কেবল দ্বিধা করেননি বললে মিথ্যে বলা হয়। এঁরা মনে করেন, এটা ধর্মের নামে যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধে নিহত হলে তা অতীব পুণ্যের ব্যাপার। এমন পুণ্য যে, মরার পরই সশরীরে স্বর্গ এবং স্বর্গের অপ্সরা লাভ করবেন তাঁরা।

একাত্তর সালে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী বাংলাদেশের জনগণের ওপর যে-পাশবিক অত্যাচার করেছিলো, তার পেছনে কেবল জাতীয়তাবাদ কাজ করেনি। ধর্মীয় উৎসাহও সেই জাতীয়তাবাদী ধারণাকে উস্কে দিয়েছিলো। সেই ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ছিলো বলেই পাকিস্তানের বর্বর সৈন্যরা বিনা দ্বিধায় লাখ লাখ নারীর সতীত্ব হানি করতে পেরেছিলো। অমন লুটপাট করতে পেরেছিলো। এই সৈন্যদের স্থানীয় দালালরাও এই ধর্মীয় জোশে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো। সৈন্য এবং তাদের দোসররা যে বাড়াবাড়ি করেছিলো, তার অনেকটাই করেছিলো ধর্ম রক্ষা এবং বিধর্মী বিনাশের মাধ্যমে পুণ্য লাভের প্রেরণা থেকে। সেই মিথ্যে পুণ্যের ধারণা তাদের বিবেক এবং বিবেচনাকে সাময়িকভাবে অন্ধ করে দিয়েছিলো।

বস্তুত, ধর্মের নামে ধর্মান্ধরা যা করে, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তা সত্যি সত্যি ধর্মের জন্যে নয়; বরং করে ধর্মের নামে ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশে। মার্কিন, জার্মান, ব্রিটিশ, ফরাসি অথবা জাপানী সাম্রাজ্যবাদ যেমন মানুষের মৌল অধিকার হরণ করেছে অথবা এখনো করছে, তেমনি ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদও একই

রকমে মনুষ্যত্ব এবং মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের মতো যুগে যুগে বৌদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ, হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ, খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদ এবং ইসলামী সাম্রাজ্যবাদও অসংখ্য মানুষের রক্তে রাঙা হয়েছে। তবে বৌদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ এবং হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ ইতিহাসে পরিণত হলেও খৃস্ট এবং ইসলামী সাম্রাজ্যবাদ এখনো প্রবল স্রোতে বহমান। বিশেষ করে পেট্রোডলারের জোরে এবং মধ্যপ্রাচ্যে হতাশাজনক ইহুদী আধিপত্য থাকার প্রতিক্রিয়ায় ইসলামী সাম্রাজ্যবাদের নামে সহিংসতার একটা প্রবল ধারা গোটা মানবতাকেই হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।

ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদের সমান্তরালভাবে আর-একটি স্রোতও বহমান বিভিন্ন জায়গায়। সেটি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদী চেতনা দেশের সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে না; বরং সক্রিয় থাকে দেশের মধ্যেই। কিন্তু এই মতবাদও মানবাধিকার খর্ব করে। মানুষের মুক্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে। এমন কি, এর নামে সংখ্যালঘু জনগণ এবং মুক্তবুদ্ধিতে বিশ্বাসী উদারনৈতিক লোকেদের ওপরও অবাধে অত্যাচার চালানো হয়। এর সঙ্গে নীতিবোধের কোনো যোগ থাকে না। বরং ধর্মের নাম ব্যবহার করে এই মতবাদে বিশ্বাসীরা লাভবান হতে চান। এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে অধর্মের পন্থা অনুসরণ করতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না। ইহুদী র‍্যাবাইরা, এভানজ্যালিক্যাল খৃস্টানরা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা, আল কাইদা এবং তালেবান সদস্য— সব শিয়ালের একই রাঁ। সবাই মনে করেন, ধর্মের লক্ষ্য হাসিল করতে অধর্মের পন্থা অবলম্বন করলে সেটা অন্যায় নয়। এই বিবেকবর্জিত ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ফলে গোটা মানবতাই আজ হুমকির সম্মুখীন। আজ তাই নতুন করে ভাবা দরকার লক্ষ্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ, না পন্থা।

(*যুগান্তর*, ডিসেম্বর ২০০৬)

১৭
আধুনিকতা

চল্লিশোত্তীর্ণ খালাম্মাকে দেখলেন হাল ফ্যাশানের শাড়ি-ব্লাউজ পরা / চোখে সান-গ্লাস / শরীরের কোনো কোনো অংশ একটু বেশি বের-করা / উঁচু হিল-ওয়ালা জুতো পরে খট খট করে করিডোর দিয়ে হেঁটে গেলেন। আপনার বন্ধুরা তাঁকে বলতে পারেন— "আধুনিকা।" বলতে পারেন তাঁর সহকর্মীরাও। এমন কি, আড়ালে আপনিও তাঁদের দলে যোগ দিতে পারেন। খালাম্মার চেয়ে কম বয়সী, ধরা যাক, মধ্য-তিরিশের কোনো মহিলাকেও একটু সাহসী পোশাক পরলে আধুনিকা বলে আপনি হয়তো টিটকারি দিতে পারেন। মোট কথা, নতুন ঢঙের পোশাক পরতে দেখলে, অথবা সবাই সাধারণত যা করে না, তেমন কিছু করতে দেখলে আমরা তাকে অনেক সময় বলি "অমুক আধুনিক, মডার্ন।" বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে এ বিশেষণটা বোধ হয় আরও বেশি প্রযোজ্য। কিন্তু এ হলো আধুনিক কথাটার অপব্যবহার।

তা হলে আধুনিক মানে কী ? আধুনিক মানে কি কেবল সাম্প্রতিক ? বর্তমানে যা ঘটছে, সেটাই কি আধুনিক ? ধরা যাক, হাল ফ্যাশানের বোরকা পরলে, অথবা নতুন ডিজাইনের পাগড়ি কিংবা রামাবলী পরলে তাঁকে কি আপনি বলবেন আধুনিক ? ধরে নিচ্ছি, বলবেন না। কারণ, নতুন ফ্যাশানের পোশাক পরলেও এই ব্যক্তির যে-মনটি প্রকাশ পাচ্ছে, সে মনটি রীতিমতো প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল। বস্তুত, বাজারে এক-একটা সময়ে নতুন ফ্যাশানের হুজুগ দেখা দেয়। মার্কেট ফোর্স কাজ করে তার পেছনে। কিন্তু সেটা আধুনিকতা নয়। কোনো উপকরণ ব্যবহার করে কেউ আধুনিক হতে পারে না। অথবা আধুনিক কালে কারো জন্ম হলেও সে আধুনিক মানুষ, তা প্রমাণিত হয় না।

জসীমউদ্দীনের জন্ম জীবনানন্দের চেয়ে কয়েক বছর পরে। অর্থাৎ জন্ম-তারিখের নিরিখে জীবনানন্দের তুলনায় জসীমউদ্দীন আধুনিক। কিন্তু এটা কেউ স্বীকার করে না। জীবনানন্দ কেবল তাঁর জীবদ্দশায় আধুনিক বলে বিবেচিত হননি। আজও তিনি আধুনিক। অপর পক্ষে, জসীমউদ্দীন সেই যে খেতাব পেলেন পল্লীকবির, এখনো তা ঘুচে যায়নি। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু, ভাষা-ছন্দ-চিত্রকল্পসহ তাঁর কবিতার আঙ্গিক, সর্বোপরি, তাঁর রস ও রুচি তিনি নিয়েছিলেন পল্লীবাংলা থেকে। সে কারণে আধুনিক কবি জীবনানন্দের তুলনায় পাঁচ বছর পরে জন্ম নিলেও তিনি আধুনিক উপাধি পেলেন না।

সাম্প্রতিক কালে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করছেন কমবেশি সবাই। প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ। এমন কি, ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়ে মধ্যযুগে ফিরে যাওয়ার লড়াই করছে যারা, তারাও ব্যবহার করছে একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি।

একেবারে হাল আমলের বিস্ফোরক, ডিটোনেটর, অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় বন্দুক, মোবাইল ফোন এবং কম্পিউটার না-হলে তাদের চলে না। কিন্তু তাদের সমস্ত চিন্তাধারা আচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ দিয়ে। সে জন্যেই বলতে হয়: পঞ্জিকার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই আধুনিকতা নয়। একবিংশ শতাব্দীতেও একই নগরীতে পাশাপাশি বাস করতে পারে— পারে বলছি কেন, বাস করছে— আধুনিকতা এবং মধ্যযুগীয়তা। একই ঘরের মধ্যেও একজন হতে পারেন আধুনিক, একজন হতে পারেন মধ্যযুগীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী।

সমাজতত্ত্বে আধুনিকতার মানে হলো: পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেওয়ার মনোভাব। এতোকাল ধরে যা চলে এসেছে, তার বদলে ভিন্ন কিছু স্বীকার করে নেওয়ার মানসিকতাকেই বলে আধুনিকতা। সে জন্যে একবিংশ শতাব্দীতে এসে যাঁরা পুরোনো মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে রাখতে চান, তাঁরা তারিখের হিশেবে একেবারে হাল আমলের হলেও, মানসিকতার দিক দিয়ে রক্ষণশীল। বস্তুত, এই ২০০৬ সালে এসেও চারদিকে আমরা যা যা দেখতে পাচ্ছি, সবই আধুনিক নয়। বরং অনেক কিছুই সেকেলে। জীর্ণ পুরাতন।

যেসব সামাজিক মূল্যবোধ দিয়ে পরিচালিত হয় আমাদের জীবন, তার বেশির ভাগই গড়ে উঠেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে— লোকবিশ্বাস, লোকাচার, দেশাচার, রীতিনীতি, কুসংস্কার, ধর্মীয় বিধান, আচার-অনুষ্ঠান, শিক্ষা ইত্যাদির প্রশস্ত ভিত্তির ওপর। অনেকেই বাপ-দাদা চোদ্দো পুরুষ যা করে এসেছে, তাকেই আগলে রাখতে চায়। কুণ্ঠিত বোধ করে সহজে কোনো পরিবর্তন স্বীকার করে নিতে। ভয় পায় নতুন কিছু আলিঙ্গন করতে। এই ভয়ের প্রধান কারণ, পাছে লোকে কিছু বলে, পাছে সমাজে নিন্দা হয়। সমাজও নতুন কিছুকে স্বাগত জানায় না। ব্যক্তিকে সে আর পাঁচজনের সঙ্গে এক কাতারে বেঁধে রাখতে চায়। কেউ সামনের দিকে একটু বেশি এগিয়ে গেলে তাকে বাধা দেয়। অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে: সমাজ মূলত রক্ষণশীল। পুরোনোকে সযত্নে ধরে রাখাই তার স্বভাব। সামনের দিকে এগুতে চায় না সে।

তা সত্ত্বেও সমাজের মূল্যবোধ একেবারে অনড় নয়, এক জায়গায় তা দাঁড়িয়েও থাকে না। একজন-দুজন নতুন কিছু করলে তার সমালোচনা করে বটে, কিন্তু যখন অনেকেই তা করতে শুরু করে, তখন সেটাকে স্বীকার করে নেয়। সেটাই তখন সমাজ-স্বীকৃত রীতি বলে গৃহীত হয়। ফলে রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও সমাজের রীতিনীতি এবং মূল্যবোধ ধীরে ধীরে বদলে যায়।

এক-এক সময়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, তাও সমাজের মূল্যবোধকে বিচলিত করে। তা ছাড়া, যুগে যুগে এমন এক-একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি আবির্ভূত হন, যিনি তাঁর চিন্তা দিয়ে সমসাময়িক এবং পরবর্তী প্রজন্মের মূল্যবোধকে নাড়া

দেন। দার্শনিকরা যেমন। ধর্মপ্রবর্তকরা যেমন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিরও এমন পরিবর্তন দেখা দেয় ধীরে ধীরে, যা মানুষের চিরাচরিত মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে। এক সময়ে মানুষ বিশ্বাস করতো: পৃথিবীটা চ্যাপ্টা। অথবা সূর্য ঘুরছে পৃথিবীর চার দিকে। ধর্মগুরুরা এই বিশ্বাসকেই সমর্থন করতেন। কিন্তু কোপার্নিকাস আর গেলিলিও ধর্মীয় বিশ্বাসের গোড়ায় আঘাত করলেন। তার জন্যে চার্চের ফতোয়ায় গেলিলিওকে অনেক মূল্যও দিতে হয়েছে। চাঁদে মানুষ পা রাখলো। ধর্মীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের গোড়ায় অমনি আঘাত লাগলো। কোনো কোনো ধর্মে বলা হয়েছে গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ আগে থেকে জানার উপায় নেই। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে। পছন্দ-মতো লিঙ্গ বেছে নেওয়া যাচ্ছে। এমন কি, যৌনমিলন ছাড়াই সন্তানের জন্ম দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে প্রচলিত বিশ্বাসে টোল খাচ্ছে বই কি! ধর্মে যা কিছু বলা হয়েছে, তার সবই যে আক্ষরিকভাবে সঠিক নয়, গোঁড়ামি সত্ত্বেও তা অনেকে অনুভব করতে পারছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের মতো নগরায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রণ, ভিন্ন সভ্যতার অভিঘাত— এসবও চিরদিনের চিন্তাচেতনাকে প্রভাবিত করে। ফলে পরিবর্তন অর্থাৎ আধুনিকতা আসে।

মানুষের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হওয়ার আর-একটা মস্ত কারণ হলো: ভিন্ন সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং সমন্বয়। যেমন, আর্যরা ভারতবর্ষে এসে অনার্যদের চিন্তাধারাকে বদলে দিয়েছিলো। মুসলমানরা ভারতবর্ষের আর্য-অনার্য এবং উত্তর আফ্রিকার জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ এবং জীবনযাত্রা বদলে দিয়েছিলো। বৌদ্ধদের প্রভাবে দূর প্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চিন্তা-চেতনায় গভীর পরিবর্তন এসেছিলো। ইংরেজরাও একেবারে নতুন সভ্যতার হাওয়া দিয়ে বিপ্লব এনেছিলো ভারতীয় চিন্তাধারায়। ফলে বহু শতাব্দীর মন-মানসিকতা, শিক্ষাদীক্ষা, রীতিনীতি এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা পাল্টে গিয়েছিলো। অতি সাম্প্রতিক এ রকমের আর-একটা বিরাট পরিবর্তন এনেছে কমিউনিজম এবং ইসলাম। এর অভিঘাতে একটা বড়ো জনগোষ্ঠীর পুরোনো বহু মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস রাতারাতি বদলে গেছে।

এ ধরনের নতুন সভ্যতা অথবা আদর্শবাদের অভিঘাতে এক দিকে মানুষ যেমন আধুনিক হতে পারে, তেমনি সব আদর্শবাদের মধ্যে এক ধরনের গোঁড়ামিও লুকিয়ে থাকে। আজকের আধুনিকতা কাল প্রাচীন হয়ে যায়। নবায়ন ছাড়া আদর্শবাদ আসলে কঠিন রক্ষণশীলতার বেদীতে পরিণত হয়। ধর্ম এমনি একটা আদর্শবাদ। কমিউনিজম অথবা অন্ধ জাতীয়বাবাদ এমনি আদর্শবাদ। এগুলো গোড়াতে মানুষকে নতুন পথ দেখায়, নতুন মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সেই আদর্শবাদই যখন আবার সংস্কার-রোধক ডগমায় পরিণত হয়, তখন তা সামনের দিকে যাওয়ার পথকে রুদ্ধ করে, মানুষকে পেছনের দিকে টেনে রাখে।

বামপন্থা গত আশি বছরেরও বেশি সময় ধরে পৃথিবীর একটা বিরাট জনগোষ্ঠীকে উন্নতির পথে যেতে সহায়তা করেছিলো। কিন্তু উনিশ শতকের মার্কসীয় দর্শন দিয়ে বিশ শতকের সমস্যার সমাধান করা গেলো না বলে, বিশ শতক শেষ হবার আগেই কমিউনিস্ট অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক দর্শন ব্যর্থ বলে স্বীকৃত হলো। এখন নানা দেশেই ধর্মীয় উন্মাদনা এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ মানুষকে যে-পথে নিয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে আধুনিক মূল্যবোধের কোনো মিল নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, রেনেসন্স, সংস্কারবাদ, যুক্তিবাদ, উদারনৈতিকতা, শিল্প বিপ্লব, শিক্ষা প্রসার, মুদ্রণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অসাধারণ উন্নতি— সবই ধর্মীয় উগ্রবাদের মুখে হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। বর্ন এগেইন ক্রিশ্চিয়ান হোক, জিহোবাস উইটনেস হোক, মর্মন হোক, ইভ্যানজেলিকাল হোক, উগ্রবাদী হিন্দুত্ব হোক, অথবা জঙ্গী ইসলামী জাতীয়তাবাদ হোক— সবই আধুনিক কালের প্রাচীনপন্থী আন্দোলন। সভ্যতার অর্জনকে অস্বীকার করার আন্দোলন। বস্তুত, এসব দেখে ফরাসী দার্শনিকের সেই কথাই মনে হচ্ছে। যে-ধর্ম আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না, সে ধর্ম ধর্মই নয়। সত্যি সত্যি আধুনিকতার জন্যে চাই নতুন ধর্ম, নতুন দর্শন, নতুন বিপ্লব। সর্বোপরি চাই, নতুনকে দু বাহু বাড়িয়ে স্বাগত জানানোর মুক্ত মানসিকতা।

(*যুগান্তর*, ২০০৬)

১৮

রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজ

বিশ্বজয় করে নোবেল পুরস্কার পেলেও, পড়শি মুসলমানদের জয় করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। মুসলিম সমাজে জীবিত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কার্যত মৃত। তবে তিনি যে মুসলমানদের জয় করতে পারেননি, সেই অক্ষমতা তাঁর নয়, সম্ভবত মুসলমানদেরও নয়। এর সত্যিকার কারণ নিহিত ছিলো তখনকার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে। আবার, দেশবিভাগের পর মৃত রবীন্দ্রনাথ যে পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজের কাছে হঠাৎ জীবন্ত হয়ে দেখা দিলেন, তারও কারণ খুঁজতে হবে তখনকার সমাজ এবং রাজনীতিতে। কিন্তু যে-কারণেই হোক, বিভাগোত্তর পূর্ববাংলায় মৃত রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন জীবিত রবীন্দ্রনাথের চেয়ে।

বিশ শতকের গোড়ায় মুসলমানদের মধ্যে কেবল উচ্চশিক্ষা নয়, সাধারণ শিক্ষার বিকাশও ঘটেছিলো খুবই সামান্য। তাঁরা ছিলেন প্রধানত গরিব কৃষিজীবী। সমাজের ওপর তলার দিকে তাকিয়ে তাঁরা সর্বত্রই দেখতে পেয়েছেন হিন্দু জমিদার, হিন্দু মহাজন, হিন্দু সরকারী কর্মকর্তা, এমন কি, হিন্দু রাজনীতিক। এই হিন্দুরা যে মুসলমানদের ভাই বলে সোহাগ করতেন, তা নয়। বরং এঁদের হাতে নিচের তলার মুসলমানরা অনেক সময়েই শোষিত এবং নিগৃহীত হয়েছেন। তার চেয়েও গুরুতর— মুসলমানরা মাঝেমধ্যে অপমানিতও বোধ করেছেন ছোঁয়াছুঁয়ির কারণে। কাজেই শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশাপাশি বাস করলেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো, তাকে ভ্রাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা বলে বিবেচনা করা যায় না।

তদুপরি, শিক্ষার অত্যন্ত সীমিত বিকাশের ফলে মুসলমানরা যে নিজেদের বাঙালি বলে চিহ্নিত করবেন, সে রকম মানসিকতাও তাঁদের গড়ে ওঠেনি। সত্যি বলতে কি, তাঁদের পরিচয় কী, এটা নিয়ে ভাববার মতো সচেতনতাও তাঁদের মধ্যে দানা বেঁধেছিলো কিনা, সন্দেহ হয়। লিখিত যেসব প্রমাণ মেলে তাতে মনে হয়, আঠারো শতকের কবি আবদুল হাকিমের পর আধুনিক যুগে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেনই সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজের স্বরূপ সম্পর্কে নিজের কাছে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু তাঁর মতো মুসলমান সেকালে কমই ছিলেন। উল্টো, তাঁরা এবং তাঁদের চোদ্দ পুরুষ বাংলায় কথা বললেও তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা কিনা, তা নিয়ে বিশ শতকের গোড়ায়ও তাঁরা রীতিমতো বিতর্ক করেছেন। এই পরিবেশে 'রবীন্দ্রনাথ' নামধারী একজন কবিকে অর্থাৎ একজন হিন্দু কবিকে ভালোবাসা দূরে থাক, চিনতে পারাও তাঁদের পক্ষে সহজ ছিলো না। সে জন্যেই, তাঁদের হাতে রাখী পরানো সত্ত্বেও তার তাৎপর্য যদি তাঁরা বুঝতে না-পারেন, তা হলে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। আশ্চর্য হবার কারণ নেই, হিন্দু-মুসলমান এক হোক বলে গান গাওয়া সত্ত্বেও, তার মর্ম উপলব্ধি করতে না-পারা।

রবীন্দ্রনাথেরও সীমাবদ্ধতা ছিলো বৈকি! মুসলমান প্রজাদের মধ্যে থেকেছেন দীর্ঘকাল, ঘুরে বেরিয়েছেন মুসলমান-প্রধান পূর্ববাংলার গ্রামের পথে, হোক না বোটে চড়ে। কিন্তু সমাজের উচ্চমঞ্চে সংকীর্ণ বাতায়নে বসে তিনি তাঁদের ঠিক ঠাহর করতে পারেননি। মাঝেমাঝে তিনি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে গেলেও, ভেতরে প্রবেশ করার সাধ্য তাঁর ছিলো না। অন্তর মিশিয়ে নিচতলার মানুষদের অন্তরের পরিচয় তিনি যথার্থভাবে পাননি। সে জন্যেই তাঁর কবিতা সর্বত্রগামী হতে পারেনি। কিন্তু জীবিত রবীন্দ্রনাথ যা পারেননি, মৃত রবীন্দ্রনাথ সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তবে তার জন্যে অকৃপণভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলো সাতচল্লিশের দেশবিভাগ।

দেড় হাজার মাইল দূরের বিভাষী এক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কেবল ধর্মের নামে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন পূর্ববাংলার মুসলমানরা। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, পাকিস্তান হবে তাঁদের সব-পেয়েছির দেশ। কিন্তু তাঁদের মোহমুক্তি ঘটতে দেরি হয়নি। দেশের রাজনীতি, প্রশাসন এবং অর্থনীতিতে তাঁদের ন্যায্য হিস্যা তাঁরা পাননি। বরং দেশবিভাগের পর রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রতি তাঁদের আনুগত্যকেই বিপুলভাবে বিচলিত করেছিলো। মাতৃভাষা নিয়ে বিতর্ক শেষে মোটামুটি ১৯৩০ সাল নাগাদ যে-ভাষাকে তাঁরা নিজেদের ভাষা বলে গ্রহণ করেছিলেন, সেই ভাষা ভুলিয়ে দিয়ে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার হুকুম যখন এলো পাকিস্তানের নেতাদের তরফ থেকে, সেটাকে তাঁরা মেনে নিতে পারলেন না; এমন কি, দেশের ঐক্যের নামেও নয়। আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব, বাংলা ভাষায় যথেচ্ছভাবে অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের আমদানি— এর কোনোটাই তাঁদের খুশি করেনি। কিছু সময় লেগেছিলো তাঁদের অসন্তোষ ধূমায়িত হতে, কিন্তু বিশাল এক বিস্ফোরণের সঙ্গে তা ছাড়া পেয়েছিলো ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি।

ভাষা আন্দোলন পূর্ববঙ্গের রাজনীতির ভিত্তি ধরে নাড়া দিয়েছিলো। সেই প্রচণ্ড ঝাঁকুনির ফলে কেবল যে মুসলিম লীগ কার্যত লুপ্ত হলো বাংলার মাটি থেকে, তাই নয়, ধর্মীয় পরিচয় ম্লান হয়ে পূর্ববাংলার মুসলমানদের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিলো তাঁদের ভাষিক এবং আঞ্চলিক পরিচয়। এতো দিন তাঁরা আরব-ইরানের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকলেও, হঠাৎ নিজেদের বাঙালি পরিচয় নিয়ে তাঁরা গর্ব প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। বিশেষ করে বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সঙ্গীত তাঁদের এই গর্বের একটা প্রধান উপাদান বলে বিবেচিত হলো। এই সূত্রে কেবল রবীন্দ্রনাথই তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেন না, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, শরৎচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ অমুসলিম নামও তাঁদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলো। ১৯৪০-এর দশকে এক সময়ের "কাফের" কথিত নজরুল ইসলামকে মুসলমানী লেবাস পরিয়ে গ্রহণ করার প্রয়াস চলেছিলো। কিন্তু পঞ্চাশ-ষাটের দশকে তাঁরও কাফের পরিচয় পুরোপুরি ঘুচে গেলো। বরং প্রশংসিত হলো তাঁর অসাম্প্রদায়িকতা।

বস্তুত, বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতা এবং গভীর ভালোবাসা খুব কম সময়ের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। তাঁরা সংকল্পবদ্ধ হলেন যে, বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে সরকারী অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে হবে এবং কেউ এ ভাষার যথার্থ মর্যাদা না-দিলে তা আদায় করে নিতে হবে। অথবা এ ভাষার বিকৃতি করতে চাইলে তাও ঠেকাতে হবে। আরবি হরফে বাংলা লেখার যে-ষড়যন্ত্র করেছিলো কেন্দ্রীয় সরকার, তা এই সচেতনতার মুখেই নস্যাৎ হয়ে যায়। *মাহে নও* অথবা *আজাদের* মতো পত্রিকা জোর করে এবং কৃত্রিমভাবে যে-অসংখ্য আরবি-ফারসি শব্দ আমদানি করতে চেষ্টা করেছিলো, তাও ব্যর্থ হয়। তখন যাঁরা লিখতেন, তাঁরা খুব জোরের সঙ্গে বাংলা ভাষার পক্ষে বক্তব্য রাখতে আরম্ভ করলেন। বাংলা ভাষার দীর্ঘকালের উত্তরাধিকার তাঁরা গর্বের সঙ্গে তুলে ধরলেন।

এক কথায় বলা যায়, ধর্মের ভিত্তিতে যে-দেশ গঠিত হয়েছিলো, সেই পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে উঠলো। তবে স্বীকার করতে হবে যে, একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণমূলক শাসন এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলেই এই ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিয়ানার পরিবেশ গড়ে ওঠা সহজ হয়েছিলো। কিন্তু কারণ যাই হোক, হঠাৎ বাঙালিয়ানার যে-জোয়ার এলো, তার ফলে আগের চাইতে অনেক ঘটা করে রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, নববর্ষের অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালিত হতে থাকলো। এমন কি, শারদোৎসব এবং বসন্তোৎসবের মতো অনুষ্ঠানও হতে লাগলো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আগের চেয়ে অনেক বেশি রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের গান শোনা গেলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা ফ্যাশানে পরিণত হলো। বিদেশে লেখাপড়া শিখে যে-শিক্ষকরা দেশে ফিরে এলেন, তাঁদের রেকর্ডপ্লেয়ারের সঙ্গে এলো জেমস ফ্রম টেগোর, শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ইত্যাদি রবীন্দ্রসঙ্গীতের লংপ্লে রেকর্ড— এমন কি, তাঁদের অনেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত না-বুঝলেও। এই সময়ে অনেকে ছেলেমেয়েদের নাম রাখলেন বাংলায়, বাড়ি এবং দোকানের নামফলক লিখলেন বাংলায়, গাড়ির নম্বরও। তা ছাড়া, অফিস-আদালতেও বাংলায় অনেকে সই করতে আরম্ভ করলেন। মোট কথা, পোশাকে-আশাকে এবং চলনে-বলনে বাঙালিয়ানা একটা অনুকরণযোগ্য ফ্যাশানে পরিণত হলো।

পূর্ববাংলায় রবীন্দ্রনাথের পুনর্জন্ম হলো এই পরিবেশে। যাকে বাঙালি মুসলিম সমাজ কোনোদিন প্রসন্ন মনে আপনজন হিশেবে গ্রহণ করেনি, তাঁকেই পরিবর্তিত পরিবেশে ভালোবাসলেন তাঁরা এবং মেনে নিলেন নিজেদের কবি বলে। কেবল তাই নয়, এ সময়ে ভাষাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতীক এবং অনুপ্রেরণায় পরিণত হলেন রবীন্দ্রনাথ। অপর পক্ষে, সরকার জাতীয় সংহতির শত্রু হিশেবে চিহ্নিত করে রবীন্দ্রনাথের বিকল্প হিশেবে খাড়া করতে চেয়েছিলো ইকবাল এবং নজরুলকে, আর চেয়েছিলো তাঁকে লোকচক্ষুর আড়ালে সরিয়ে দিতে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালনে পাকিস্তান সরকার বাধা দিয়েছিলো। তা সত্ত্বেও সরকারের রোষ উপেক্ষা করে প্রদেশের অনেকে খুব ঘটা করে এই উৎসব পালন করেন। তারপর ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে সরকার বেতার-টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজানো বন্ধ করেছিলো। পশ্চিমবাংলা থেকে রবীন্দ্রনাথ-সহ অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকের রচনা আদমানিও বন্ধ করেছিলো। এমন কি, বিশ্ববিদ্যালয়ে অমুসলমান কবি-সাহিত্যিকের লেখা পড়ানো হবে কিনা, তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু প্রবল জনমতের চাপে পরের বছর রবীন্দ্রজয়ন্তীর ঠিক আগে সরকার রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়। তখন যে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয়, তার মধ্য দিয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা যতোটা প্রকাশিত হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রকাশিত হয় রাজনৈতিক প্রতিবাদ। এ সময় থেকে ছায়ানটের রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যে হাজার হাজার লোক হাজির হতেন, তাঁরা অনেকে রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, হয়তো তাঁর নামই জানতেন। কিন্তু সেই নাম তাঁদের কাছে প্রতিবাদের মন্ত্রে পরিণত হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের এই জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সরকার অবশ্য এখানেই থেমে থাকেনি। এর পরেও ১৯৬৭ সালে বেতার-টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজানো নিষিদ্ধ হয়। তারও সোচ্চার প্রতিবাদ করেন ছাত্র, শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবীরা। রাস্তায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের পক্ষে মিছিল বের হয়। প্রকৃত পক্ষে, এ ধরনের নিষেধের মধ্য দিয়ে সরকার বাঙালিয়ানার স্রোত ঠেকাতে চেষ্টা করলেও তার ফল হয়েছিলো একেবারে উল্টো। পূর্ববাংলার লোকেরা আরও বেশি করে রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের করে নিয়েছিলেন। বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য বই পড়ে নয়, রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা অর্জন করেছিলেন প্রতিবাদী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

এতে তখনকার প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোও সহায়তা দিয়েছিলো। এসব দল কেবল রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপনে উৎসাহ দেয়নি, বরং দলের কর্মীরাও অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। অসম অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে পূর্ববাংলায় স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত কোনো রেকর্ডিং স্টুডিও গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ষাটের দশকে যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন, তাঁদের গান শোনার জন্যে, তাঁদের গানের রেকর্ড প্রকাশের জন্যে একটা মহলে বিশেষ আগ্রহ জন্মেছিলো। এই পরিবেশে ১৯৬৯ সালে ছজন শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করা হয় করাচির স্টুডিওতে। তারপর এসব গানের রেকর্ড উপহার দেওয়া হয় জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। বঙ্গবন্ধু মুজিব তখন ভাষণ দিয়েছিলেন এই বলে যে, জনগণ রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে চায়। কেবল তা-ই নয়, তারপর থেকে তিনি 'আমার সোনার বাংলা' গানটির কথা বারবার তাঁর ভাষণে উল্লেখ করতে থাকেন। তাঁর উৎসাহ রবীন্দ্রভক্তদের উৎসাহিত করেছিলো এবং তাঁদের সাহস জুগিয়েছিলো।

বস্তুত, বাংলাদেশ-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ পরিণত হয়েছিলেন একটা প্রতীকে। শেষ পর্যন্ত তাঁর লেখা 'আমার সোনার বাংলা' গানটি যে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিশেবে গৃহীত হয়েছিলো, তাও প্রমাণ করে তাঁর প্রতি, তথা ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তখন বাঙালিদের ভালোবাসা কী গভীরভাবে দেখা দিয়েছিলো। এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ এ জন্যে যে-বাংলাদেশের সংসদ এ গানকে জাতীয় সঙ্গীত হিশেবে গ্রহণ করার অনেক আগেই জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে একে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দিয়েছিলো। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এ গান এবং রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য দেশাত্মবোধক গান গেয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারণ লোকেরা গর্বে, আনন্দে, বেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়েছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অবস্থার অবশ্য পরিবর্তন ঘটে। রবীন্দ্রনাথকে কেউ তখন আর নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করলো না। বরং সরকারী উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী এবং রবীন্দ্রমৃত্যুবার্ষিকী পালিত হতে লাগলো। ফলে রবীন্দ্রনাথ ফের বই-এর পাতায় বন্দী হলেন; আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হলেন। বেল পাতা দিয়ে নমঃ নমঃ করে মানুষ তখন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের দায় সারলো। আবার, অনেকের মনে তাঁর সম্পর্কে পুরোনো দ্বিধা দেখা দিলো। রবীন্দ্রনাথের গানকে জাতীয়সঙ্গীতের মর্যাদা দিলেও তাঁর নামে একটা উল্লেখযোগ্য রাস্তার নামও হলো না। একটা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠলো না। অথচ সেপাই থেকে সিপাহসালার পর্যন্ত কতো জানা-অজানা লোকের নামে বলতে গেলে শৌচাগার থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সড়ক থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত তৈরি হলো। মোট কথা, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে দিগন্ত জুড়ে দেখা দিলেও, ৭০-এর দশকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ আবার শয্যাশায়ী হলেন। এই পটভূমিতেই যশোরের রবীন্দ্রনাথ রোড পরিণত হয় আর. এন. রোডে।

তবে এটাই শেষ কথা নয়। এই মুমূর্ষু রবীন্দ্রনাথ আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন ১৯৭৫ সালের অগস্ট মাসে আততায়ীর হাতে কেবল শেখ মুজিব নন, বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা নিহত হওয়ার পর। শোনা গেলো মূর্তিপূজার প্রতীক বলে বাংলাদেশের জাতীয়সঙ্গীত বদলে যাবে। এই হুমকির মুখে ধুলো-পড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের খাতা নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা আরও একবার এগিয়ে এলেন। ১৯৬৩ থেকে ছায়ানট যে-বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছিলো, তাতে নতুন উৎসাহের জোয়ার এলো। ফৌজী-রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে রাজনীতি যখন অবদমিত, ধর্মনিরপেক্ষতা যখন কার্যত মৃত, তেমন সময়ে রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে সাংস্কৃতিক কর্মীরা ১৯৮০ সালে শুরু করলেন জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা। সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতি যে-সাড়া দেখা গেলো, তা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত তেমনি প্রবল। একজন কবিই উৎসাহ জোগালেন ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি চর্চায়।

মুজিব-হত্যার ঠিক পর-পর বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান সংশোধনের যে-কাজ শুরু হয়েছিলো, এই দশকেই তার ষোলো কলা পূর্ণ হয়। দুর্বল একনায়করা গদি আঁকড়ে থাকার জন্যে ধর্মের নাম ভাঙান। তার চেয়েও মারাত্মক— একাত্তরে দেশের

স্বাধীনতার যারা বিরোধিতা করেছিলো সরাসরি এবং সক্রিয়ভাবে, সেই সব লোক এঁকেবেঁকে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে পেট্রোডলার এসে মদদ জোগায় তাদের। ধর্মনিরপেক্ষতার যে-আদর্শ নিয়ে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিলো, ঘাতকের নির্দেশে সেই বাংলাদেশ অদ্ভুত উটের পিঠে চড়ে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে চলতে থাকে। চার দিকে ধর্মের উন্মত্ত জিগির আরম্ভ হয়। দেশের অমুসলমানরা পরিণত হন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে। এ সময়ে উপমহাদেশের অন্যত্র যে-কট্টর ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়, তাও বাংলাদেশকে প্রভাবিত করে। ভারতে বাবরি মসিজদ গুঁড়ো হলে বাংলাদেশে ডজনে ডজনে মন্দির ধ্বংস হয়। ভারতে গৈরিক পতাকা উড়লে বাংলাদেশে চাঁদতারা পতপত করে। ভারতের মাটি মুসলমানদের খুনে রাঙা হলে শত শত মাইল দূরের বাংলাদেশও লাল হয় হিন্দুদের রক্তে। ক্রিকেট খেলায় ভারত হারলে এবং পাকিস্তান জিতলে ঢাকায় বিজয় মিছিল বের হয়। এই পরিবেশ ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুকূল নয়। অথবা অনুকূল নয় রবীন্দ্রচর্চার জন্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক বছর আগে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যখন আবার জাতীয়সঙ্গীত বদলানোর প্রস্তাব করেন, তখন জনপ্রিয় প্রতিবাদের মুখে তাঁর ছুটিতে চলে যেতে হয়। যদিও, বাংলাদেশ যখন উজান স্রোতে বহমান, সেই পরিবেশে একই অধ্যাপক তাঁর রবীন্দ্রবিরোধিতার জন্যে কয়েক বছরের মধ্যে পুরস্কৃত হন। এসব চড়াই-উৎরাই সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ আজও বাংলাদেশে টিকে আছেন বহাল তবিয়তে। প্রতিকূল পরিবেশেও ঢাকায় রবীন্দ্রচর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, রবীন্দ্র পঠনপাঠনের নিয়মিত সভা বসে, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে উচ্চতর গবেষণা চলে।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের নাম এখনো বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। এই দেশে কেউ নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং সংস্কৃতিবান বলে দাবি করতে চাইলে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের নাম নিতেই নয়। ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনে তাঁর গান গাইতেই হয়। এমন কি, ক্রমবর্ধমান মাত্রায় মৌলবাদী চরিত্রের শাসন প্রবর্তিত হলেও, পাকিস্তানী আমলের সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের আসন আগের তুলনায় শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে জন্যেই ধর্মীয় রাজনীতির কাছে যতোই পণবন্দী হোক, সরকার এখন আর রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারছে না। বরং একজন ফৌজী-রাষ্ট্রপতি সরকারী উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের সিদ্ধান্তও নিয়েছেন। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যারোমিটারের মতো। ঘন অন্ধকারে ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন যতো জোরদার হয়, তাঁর নামের পারদ ততো ওপরে উঠতে থাকে। আর অনুকূল পরিবেশে দেশের প্রতিবাদী আন্দোলন যতো নিস্তেজ হয়, রবীন্দ্রনাথ ততোই পাঠ্যপুস্তকের দিকে সরে যেতে থাকেন।*

* আমার *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

(*স্টেসটম্যান*, রবীন্দ্রজয়ন্তী, ২০০৫)

১৯
কেন রবীন্দ্রনাথ ?

কোনো দিন আমি 'কবিগুরু' অথবা 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথ লিখিনি। বলিওনি। যাঁরা লেখেন অথবা বলেন তাঁদের আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের অতিভক্ত— এমন কি, কাউকে কাউকে মনে হয় রবীন্দ্রপূজারী। আমার ধারণা: এই অতিভক্তির ফলে সত্যিকারের রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাইনি অথবা এখনো দেখতে পাচ্ছি না। মানুষ রবীন্দ্রনাথ— 'যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে'— সেই মানুষ রবীন্দ্রনাথ আমাদের আড়ালে থেকে গেছেন। তাঁর জায়গায় দেখা দিয়েছেন একজন অতিমানব অথবা উপদেবতা। তাঁর রচনার আমরা তাই কদর্থ না-হলেও ভুল অর্থ করি। তা ছাড়া, তাঁর সৃষ্টির ওপরে ভিত্তি করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে না-গিয়ে বরং তাঁকে কেন্দ্র করেই বারবার ঘুরপাক খেতে থাকি। এক কালে কথায় বলতো: কানু ছাড়া গীত নেই। আধুনিক বঙ্গে কৃষ্ণের জায়গা দখল করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কখনো কখনো মনে হতে পারে: রবীন্দ্রনাথ ছাড়া গীত নেই।

কালিদাসের কালে তিনি জন্ম নেননি ঠিকই, কিন্তু তিনিও যথেষ্ট পুরোনো! জন্মেছিলেন এখন থেকে প্রায় দেড় শো বছর আগে। তারপর কবে তিনি বিগত হয়ে গেছেন! বস্তুত, তাঁর ভাষায় এখন নতুন কবি— নতুন কবিরা— আমাদের ঘরে গান করছেন। তারপরও তাঁকে নিয়ে নাম-কীর্তন করার প্রয়োজন আছে কি ? ধর্মের বেলায় দেখা যায়: মানুষ একটা বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকে। সেখান থেকে আর সামনে যেতে পারে না। অন্ধবিশ্বাস স্বচ্ছদৃষ্টিকে আবৃত করে। রবীন্দ্রনাথ তেমন একটা অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছেন বলে আশঙ্কা হয়। তা ছাড়া, অনেক সময় মনে হয়: তিনি নতুনদের আগমনের সব পথ রোধ করে আছেন। বাঙালি মুসলমানরা দীর্ঘদিন তাঁকে 'নিজেদের লোক' বলে গণ্য করতেন না। কিন্তু মুসলমান-প্রধান বাংলাদেশেও রবীন্দ্রচর্চা এখন অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোট কথা, নানা দিক থেকেই মনে হতে পারে: আর কতো রবীন্দ্রনাথ! এখনো কি তিনি প্রাসঙ্গিক ?

এক কথায় এর উত্তর বোধ হয় দেওয়া যায় না। মরেই হারিয়ে যান বেশির ভাগ মানুষ। কিন্তু সবাই নন। আকাশে লক্ষ-কোটি তারা দিনের আলোতে হারিয়ে যায়। অপর পক্ষে, আকাশ থেকে সরে গেলেও মেরুমণ্ডলে সূর্য প্রায় সারা রাত আলো দেয়। সে জন্যেই ৬৫ বছর আগে বিদায় নিলেও বাংলার আকাশ থেকে রবির আলো নিভে যায়নি। আমরা এখনো বাস করছি তাঁরই বলয়ে।

এর কারণ দুটি। প্রথমত তাঁর সর্বব্যাপী প্রতিভার জন্যে, দ্বিতীয়ত এখন তাঁর অবদান আজও নিঃশেষিত হয়নি বলে। তিনি ছিলেন বিশ্বের এক বিরল প্রতিভা।

বিশেষ করে বৈচিত্র্যের কথা বিবেচনা করলে তাঁর মতো প্রতিভা ইতিহাসে নজিরবিহীন। শেক্সপীয়র নাট্যকার এবং কবি ছিলেন, সুরকার ছিলেন না। মোৎসার্ট সুরকার ছিলেন, কিন্তু উপন্যাস লেখেননি। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি শিল্পী এবং বিজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু সুরকার ছিলেন না। নিউটন বিজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু কবি ছিলেন না। ভ্যান গখ ছবি এঁকেছেন, কিন্তু গান রচনা করেননি। মনে রাখা দরকার যে, কবি হিশেবে পরিচিত হলেও রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি ছিলেন না। তিনি একই সঙ্গে ছিলেন গীতিকার-সুরকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্প-লেখক এবং প্রবন্ধ-লেখক। যদি এখানেই শেষ হতো, তা হলেও তাঁকে কেবল সাহিত্যিক পরিচয় দিয়ে চালিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু তাঁর আরও পরিচয় ছিলো। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, ভাষাতাত্ত্বিক, পর্যটক, অভিনেতা, গায়ক এবং পল্লীপুনর্গঠক। বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রকে তিনি বিচিত্র এবং বর্ণাঢ্য অলঙ্কারে সাজিয়ে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টি দিয়ে। কিন্তু তাই বলে তাঁকে পূজো করার কারণ নেই। তিনি ফেরেশতা ছিলেন না— তাঁরও ছিলো অনেক সীমাবদ্ধতা। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা কবি হলেও, আজকের বিশ্বে যে-সব জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধানের দাওয়াই দিয়ে যেতে পারেননি। ধর্মপ্রচারকদের উপদশেকে চিরকালীন বিবেচনা করা যেমন ভ্রান্ত, রবীন্দ্রনাথের বাণী মহান হলেও, মনে রাখা দরকার— তার ওপরও কালের ছাপ রয়েছে।

এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর উপযোগিতা নিঃশেষ হয়নি। রাজনীতির দিক দিয়ে, এমন কি, সাংস্কৃতিক অনেক দিক দিয়েও বাঙালি এখন দু ভাগে বিভক্ত। কিন্তু বাংলার আকাশে এখনও একই রবি। নতুন বছর বরণ করতে, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত— সব ঋতুকে স্বাগত জানাতে, জন্মদিনে, মৃত্যুবার্ষিকীতে, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় অনুষ্ঠানে— বস্তুত সব কিছুতেই তাঁর গান চাই, চাই তাঁর কবিতা। তার চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো: উৎসবে, আনন্দে, শোকে, সান্ত্বনায়, প্রেমে, বিরহে— তাঁর গান, তাঁর কবিতা আমাদের সঙ্গী হয়। তাঁর ভাষা দিয়েই বলতে পারি: অনমনা পথ চলতে গিয়ে আমরা যেমন পথের দু ধারের ফুলদের ভুলে যাই, আকাশের তারাদের ভুলে যাই, অথচ আমাদের প্রাণের নিশ্বাসবায়ু তারা সমধুর করে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কথা সজ্ঞানে মনে না-করলেও তিনি প্রতি নিয়ত আমাদের চেতনায় মিশে আছেন এবং আমাদের অস্তিত্বকে সমৃদ্ধ করছেন।

আমাদের ওপর তাঁর সবচেয়ে বড়ো প্রভাব তাঁর ভাষার। আমাদের ভাষাকে তিনি ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। আমরা অজান্তেই তাঁর ভাষা ধার করে কথা বলি, তাঁর ভাষায় চিন্তা করি। তাঁর হাতের লেখা মকস্ক করি। তাঁর আগে পর্যন্ত যে-বাংলা ভাষা ছিলো, তা ছিলো অনেকাংশে কৃত্রিম, তার প্রকাশ-ক্ষমতা ছিলো সীমিত এবং তা ছিলো আমাদের মুখের ভাষা থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত। সেই ভাষাকে সহজ সরল করে তিনি নিয়ে আসেন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কাছাকাছি। কেবল তাই

নয়, সে ভাষাকে তিনি সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন; প্রকাশ-ক্ষমতা দান করে নানা ভাবের বাহন করে তোলেন। কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধ— সব রীতির ভাষাকেই তিনি সমৃদ্ধ করেছিলেন। ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন, শিক্ষা— সব ধরনের পরিভাষাকেও এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। বস্তুত, তাঁর ভাষার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বিশ শতকের বাংলা গদ্য। কিন্তু ঘরে-ঘরে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়লেও, শিক্ষার মান এখন নিচে নেমে যাওয়ায় আমাদের ভাষা তার সৌন্দর্য এবং প্রকাশ-ক্ষমতা উভয়ই যথেষ্ট পরিমাণে হারিয়ে ফেলেছে। এই অবক্ষয়ের পরিবেশে তাঁর রচনা বারবার আমাদের হীনতা থেকে মুক্তি দিয়ে ওপরে তুলে আনতে পারে। তিনি যে-ঐশ্বর্য দিয়েছিলেন, তা বিসর্জন দিলে সেটা হবে আত্মহননের মতো।

কেবল তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ আর বিদগ্ধ রুচি গত এক শো বছরে সমার্থক হয়ে গেছে। তাঁর আগে পর্যন্ত ভাষা-সাহিত্যে এক ধরনের স্থূলতা ছিলো। কিন্তু তিনি তাতে এমন একটা পরিশীলন এবং বৈদগ্ধ্য নিয়ে আসেন, যা আগেকার বাংলায় লক্ষ্য করা যায়নি। হয়তো প্রথম যৌবনে তিনি এই রুচির দেখা পেয়েছিলেন ইউরোপে। তাঁর কৌতুকবোধ, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর চলাফেরা, আচার-আচরণ, তাঁর বাকভঙ্গি— সবকিছুতেই এই রুচির দেখা মেলে। তাঁর ভাষার বক্রপ্রয়োগের মাধ্যমে রসিকতা সৃষ্টির একটি প্রমাণ দিতে পারি প্রসঙ্গত। যার কণ্ঠ বেশ কর্কশ তার সম্পর্কে তিনি হয়তো লিখতে পারেন যে, অমুকের কণ্ঠ খুব মধুর তা বলা যায় না। এ জাতীয় প্রয়োগ বাংলা ভাষায় তাঁর আগে পর্যন্ত ছিলো না। বস্তুত, আমাদের কথায়, আমাদের আচার-আচারণে, মধ্যবিত্তের বসার ঘরের শিল্পকর্মে, গানের চর্চায়, নাচের যৎকিঞ্চিৎ আয়োজনে, এমন কি, সংস্কৃতিবান বলে পরিচিত হওয়ার যে-প্রয়াস প্রকাশ পায় তাঁদের জীবনে— তার সবকিছুতেই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব।

বাঙালির রুচি গঠনে তাঁর প্রভাব যে কতো গভীর তার আর-একটা প্রমাণ মেলে তাঁদের রোম্যান্টিক প্রেমের চেতনা থেকে। তাঁর আগে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে ইউরোপ থেকে এই চেতনা বাঙালির জীবনে আসতে আরম্ভ করলেও ভালোবাসার ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গি, অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনের সূক্ষ্ম মাধুর্য এবং রোম্যান্টিকতা আমরা রবীন্দ্রনাথেই বিশেষ করে লক্ষ্য করি। প্রেমিক অথবা প্রেমিকার কানে কানে শোনানোর কবিতা অথবা গান বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জন্যে রেখে যাননি। অপর পক্ষে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং গান ছাড়া কপোত-কপোতীর প্রেমের কূজন কল্পনা করা যায় না। নাটকে, সিনেমায় তাঁর গান ছাড়া প্রেমের দৃশ্য অপূর্ণ থেকে যায়। এমন কি, যাঁরা আধুনিক প্রেমের গান লেখেন, তাঁরা অকাতরে তাঁদের শব্দ এবং এক্সপ্রেশন সংগ্রহ করেন তাঁরই গীতবিতানের বিশাল ভাণ্ডার থেকে।

কেবল মানবিক প্রেম নয়, তাঁর ঈশ্বরপ্রেমও বাঙালির, বিশেষ করে বিদগ্ধ এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালির অনুকরণের বস্তু। তিনি নিজে একেশ্বরে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁর চেতনায় এই বিশ্বাস এতো নিবিড়ভাবে মিশে ছিলো যে, তিনি প্রেম,

প্রকৃতি, মানুষ— যে-বিষয় নিয়েই লিখে থাকুন না কেন, তার মধ্যে সেই বিশ্বাসের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর গান সম্পর্কে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়। অথচ রবীন্দ্রনাথের সেই সৌন্দর্যময় মঙ্গলময় ঈশ্বর কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্মের অথবা সম্প্রদায়ের ঈশ্বর নন। তিনি প্রায় এক সেক্যুলার ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর মানবতারই পরম প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ জীবন শুরু করেছিলেন ব্রাহ্ম পরিচয় দিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যে-ধর্মকে স্বীকরণ করেছিলেন, তা মানুষের ধর্ম। তাতে কেবল উপনিষদ নয়, তাতে মিশে গিয়েছিলো গ্রাম-বাংলার দেবতা-বর্জিত আনুষ্ঠানিকা-বর্জিত বাউলের সহজ ভক্তি। কিন্তু বাউলের ভক্তিকেই তিনি নিয়েছিলেন, স্থূল দেহতত্ত্বকে নয়। মুক্ত-মনা বাঙালিদের তিনি অনুপ্রেরণা দিয়েছেন সেই মানুষের ধর্ম, সেই সেক্যুলার ঈশ্বরকে নিজেদের হৃদয়ে স্থাপন করতে। আজ বিশ্বে যখন ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক সহিংসতা একটা বিশাল দৈত্যের মতো মাথা তুলে সমগ্র মানবতাকে গ্রাস করতে উদ্যত, তখন রবীন্দ্রনাথের সেই ধর্ম এবং ঈশ্বরকে বড়ো প্রয়োজন।

বাঙালিরা এক হোক বলে আজ থেকে ১০১ বছর আগে ঈশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গদেশ বিভক্ত হলে কালে-কালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সহ পুরো বাঙালি সংস্কৃতিই দু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে তাঁর সেই আশঙ্কা এখন দাঁত মেলে দেখা দিয়েছে। একই ভাষায় কথা বললেও, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বাঙালিদের আত্মপরিচয় এখন আর অভিন্ন নেই। এখন সেই বাঙালিদের একাংশ ক্রমবর্ধমান মাত্রায় ভারতীয় হচ্ছেন; আর-এক অংশ ইতিমধ্যে বাংলাদেশীতে পরিণত হয়েছেন। এই বিভেদের যুগে দু পারের বাঙালিদের মধ্যে যে-দুজন মিলন সেতু হিশেবে কাজ করতে পারতেন, তাঁদের একজন রবীন্দ্রনাথ, অন্যজন নজরুল।

এই কলুষিত পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের নাম এখনও অসাম্প্রদায়িকতার আন্দোলনে সবচেয়ে বড়ো অনুপ্রেরণা হিশেবে বিবেচিত হচ্ছে। অসাম্প্রদায়িকতা আর রবীন্দ্রনাথকে এখন সমার্থক বলে গণ্য করা হয়। বস্তুত, বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে-বিতর্ক তার একদিকে আছে সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তি, অন্যদিকে অসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। নয়তো সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। মুসলিম জাতীয়তাবাদীরাও পয়লা বৈশাখ রবীন্দ্রনাথেরই গান দিয়েই পুরোনো বৎসরের আবর্জনা দূর করেন, তাঁর গানের সঙ্গেই নাচেন।

আধুনিক কালে জাতিসঙ্ঘ গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে বহু আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্বায়ন এখন সবচেয়ে ধরতাই ধুয়ো। সত্যি সত্যি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে গোটা বিশ্ব ছোটো হয়ে এসেছে। কিন্তু তারই মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে অন্ধ জাতীয়তাবাদ। নয়া-সাম্রাজ্যবাদ, ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয় স্বার্থ এবং ধর্মীয় উন্মাদনার নামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ যে হানাহানি, মানুষের জীবন নিয়ে যে-তাণ্ডবনৃত্য, তার পেছনে সবচেয়ে বড়ো কারণ জাতীয়তাবাদের বিস্ফোরণ। এখন থেকে নব্বুই বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন। এর ফলে পাশ্চাত্যে তাঁর জনপ্রিয়তাও রাতারাতি হ্রাস পেয়েছিলো। কিন্তু তাতে তিনি পিছুপা হননি। তাকে অগ্রাহ্য করেই সত্য এবং মঙ্গলের বাণী শুনিয়েছিলেন জাপান, ইউরোপ এবং অ্যামেরিকায়। জনপ্রিয়তার প্রলোভনে একটুও সরে যাননি তিনি নিজের কক্ষপথ থেকে। কারণ, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি জাতীয়তাবাদের ধ্বংসাত্মক এবং মানবতা-বিরোধী ভূমিকা দেখে বিচলিত হয়েছিলেন। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেও তিনি জাপান এবং জার্মেনিতে দেখেছিলেন সেই জাতীয়তাবাদকে আরও প্রবল হয়ে উঠতে। এমন কি, খোদ ভারতবর্ষের সহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনও তাঁর বিশ্বাসে আঘাত দিয়েছিলো।

যে-জাতীয়তাবাদ একটি জাতিকে অন্য জাতির শত্রুতে পরিণত করে, অন্য জাতির মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে প্রেরণা জোগায়, যে-জাতীয়তাবাদ মনুষত্বের চেয়েও দেশপ্রেমকে বড়ো করে দেখে, তাকে তিনি অকুণ্ঠভাবে নিন্দা করেছিলেন। তিনি নিজে অসাধারণ দেশপ্রেমিক ছিলেন। কিন্তু ভূমি নয়, সেই ভূমিতে যারা বাস করে— সেই মানুষকেই তিনি বড়ো করে দেখেছিলেন। সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক মানুষ। তিনি বলেছিলেন: দেশে দেশে তাঁর ঘর আছে। তিনি সেই ঘরেরই খোঁজ করেছেন। তাঁর কাছে রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ— সবই মানুষের জন্যে। রাষ্ট্র, ধর্ম অথবা সমাজের জন্যে মানুষ নয়। আজ যখন সভ্যতার তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে, তখন তাঁর সেই আন্তর্জাতিকতার বাণী বন্ধুর পথে চলতে আমাদের সম্বল হতে পারে।

সত্যি বলতে কি, রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছিলেন হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী অথবা লিখেছিলেন সভ্যতার সংকট, আজকের অবস্থা তার চেয়ে অনেক শোচনীয়। তিনি

যখন লিখেছিলেন, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে— তখনও অন্যায়ের প্রতিকার হতো। কিন্তু আজ সত্যি সত্যি মানবতা এক গভীর সংকটের সম্মুখীন। এক ক্রান্তিকালে উপনীত। হিটলারের, মুসোলিনীর, স্তালিনের সূচনা দেখেছিলেন তিনি। কিন্তু ষাটের দশকের তৃতীয় বিশ্বের অসংখ্য ফৌজী শাসকদের দেখেননি, পল পটদের দেখেননি। সাদ্দাম, বুশ এবং লাদেনদের দেখেননি। ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের নামে বিপন্ন রোয়াণ্ডা, বসনিয়া, গুজরাট, ইরাক, ফিলিস্তিন এবং আফগানিস্তানের মানুষকে দেখেননি। এই সংকটের নীরন্ধ্র অন্ধকারে তাঁর গান, তাঁর কবিতা, তাঁর চিন্তা আজও প্রাসঙ্গিক, আজও তা আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে। একলা পথে চলার অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে।

(*যুগান্তর*, রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা, ২০০৬)

২০

রবীন্দ্রনাথ কি বেঁচে আছেন ?

রবীন্দ্রনাথ মারা যান পঁয়ষট্টি বছর আগে— পাঠ্যবই-এর কল্যাণে সে তো শিশুরাও জানে! কাজেই আমার প্রশ্ন সেটা নয়, আমার জানতে ইচ্ছে হয়: মরেছেন, কিন্তু মরে তিনি ভূত অর্থাৎ পুরোপুরি বিগত হয়েছেন কিনা। সমকালীন সমাজে এবং, তার থেকেও জরুরী, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বেঁচে আছেন কিনা। সত্য বটে, বেশির ভাগ লোক মরেই হারিয়ে যান, কিন্তু তিনি তো বেশির ভাগ লোকের মতোন ছিলেন না! রবির আলো কি এখনো আমাদের মননকে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা দিককে আলোকিত করে ?

মেধাবর্জিত অতি সাধারণ শিক্ষার্থী ছিলাম বলে, রবীন্দ্রনাথ কতো বড়ো ছিলেন— সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে উপরের দিকে না-ওঠা পর্যন্ত আদৌ উপলব্ধি করতে পারিনি। তারও কয়েক বছর পরে রবিরশ্মিতে যখন মনপ্রাণনয়ন ধাঁধিয়ে গেলো, তখন মনে হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথ অমর। বিশেষ করে তখনকার পূর্ব বাংলায় যে-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন চলছিলো এবং তাতে তিনি যে-অন্তহীন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়েছিলো আমরা তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি। পাঠ্যপুস্তকের শুকনো পাতা থেকে তাঁকে উঠিয়ে এনে নতুন করে তাঁর মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছি। তিনি শুধু ছবি নয়, অন্তরের মাঝখানে ঠাঁই নিয়েছেন তিনি। আমাদের চলার পথের নিত্যসঙ্গী তিনি।

আরও একটা কারণে রবীন্দ্রনাথকে তখনকার পূর্ব বাংলার সমাজে খুব জীবন্ত মনে হতো। সে হলো: বাঙালি মুসলমান সমাজ তাঁকে কখনো 'নিজেদের লোক' বলে গ্রাহ্য করেনি। তাঁদের শতকরা নব্বুই জন অথবা তার চেয়েও বেশি সেকালে বাস করতেন গ্রামে। তাঁদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিলো খুবই কম। ইংরেজ আমলে শিক্ষার যে-সুযোগ এসেছিলো, চাকরি-বাকরির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার যে-পথ খুলে গিয়েছিলো, বর্ণহিন্দুরাই সেই ভোজের শরিক হয়েছিলেন। মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সেখানে পাত পড়েনি। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর যখন গর্বে বাঙালিদের বুক ফুলে ওঠে, তখনও গ্রামের মুসলমানদের কাছে সে খবর পৌঁছেনি। আর যে-শিক্ষিত মুসলমানরা এ সম্পর্কে জানতে পান, তাঁরাও তখন অবিমিশ্র ঔদাসীন্য দেখান। এর জন্যে দায়ী ছিলো তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং হীনম্মন্যতা। এক ধরনের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা। আরও মুশকিল ছিলো: তাঁদের মধ্যে কোনো খ্যাতিমান সাহিত্যিক ছিলেন না, যাঁকে নিয়ে তাঁরা বড়াই করতে পারেন। কিন্তু সে অভাব অনেকটা পূরণ হয়েছিলো ১৯২০-এর দশকে— যখন বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে হৈহৈ করে নজরুল মাঠে নামলেন।

মুসলমানদের মানসিক দৈন্য আংশিক পূরণ করে তিনি পরিণত হলেন মুসলমান রবীন্দ্রনাথে। যে-নজরুল জীবন ও সাহিত্যে ষোলো আনা অসাম্প্রদায়িক; যে-নজরুল তারস্বরে অসাম্প্রদায়িকতার শিঙ্গার হুঙ্কার বাজিয়েছিলেন, মুসলমানরা সেই নজরুলকেই ব্যবহার করলেন রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে তাঁদের সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ার হিশেবে।

এতে রবীন্দ্রনাথের যে কোনো অবদান ছিলো না, তা নয়। মুসলিম সমাজ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। তিনি গ্রাম বাংলায় বাস করেছিলেন বহু বছর। তাঁর প্রজাদের বেশির ভাগই ছিলেন মুসলমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সেই মুসলমানদের সম্পর্কে এতোটা জানেননি, যাতে তাঁদের নিয়ে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। বুড়ো বয়সে দুঃখ করে বলেছেন, মাঝে মাঝে তিনি ওদের প্রাঙ্গণের ধারে গেছেন, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করার সাধ্য ছিলো না। কেন সাধ্য ছিলো না, বিশ্বাসযোগ্যভাবে সে কথা বলতে পারেননি। শিক্ষা, বিত্ত এবং সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে এগিয়ে থাকা হিন্দু সমাজের একাংশ এখন মুসলমানদের সঙ্গে একত্রে পান-ভোজন করলে জাত যাবে বলে মনে করেন না বটে, কিন্তু মুসলমানদের সম্পর্কে এখনো তাঁরা উদাসীন। জানতে অনাগ্রহী। এমন কি, একটা মুসলিম নাম উচ্চারণ বা সঠিক বানান করতে গেলে গলদঘর্ম হন। উনিশ এবং বিশ শতকের নেতৃস্থানীয় তাবৎ বাঙালি সম্পর্কেই এই মন্তব্য কমবেশি প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও। কিন্তু অসীম কৌতূহলী মনের অধিকারী, অজানাকে জানার জন্যে পরম উৎসাহী হয়েও, বাকি সব বাঙালিদের মতো আচরণ তিনি করবেন কেন? বাড়ির পাশের একটা বড়ো সম্প্রদায়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা কি অতোই শক্ত। বিশেষ করে তাঁর মতো পাঠকের জন্যে? গ্রামে গিয়ে তাঁর গোরা প্রথম বারের মতো বৃহত্তর বাঙালি সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছিলো। গোরার স্রষ্টা হিশেবে দৃষ্টিকে আর-একটু প্রসারিত করে তিনি কেন সেই বৃহত্তর সমাজের কেবল বাইরের দিকটা দেখলেন, সমাজের ব্যক্তিগুলোর দিকে নজর দিলেন না? সহানুভূতির সঙ্গে কেন জানতে চাইলেন না তাঁদের ছোটোছোটো সুখদুঃখের কাহিনী? কেন তিনি নিজেকে বন্দী করে রাখলেন একটি গণ্ডীর মধ্যে? নাকি, এটাকেই বলে ব্যক্তির সীমানা?

অভিমান ভেঙে মুসলমানরা সেই রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করেন তাঁর মৃত্যুর দু দশক পরে— ১৯৬০-এর দশকে। এই অভিমানের মেঘ দূর হবার পেছনে অবশ্য তাঁর সাক্ষাৎ কোনো ভূমিকা ছিলো না। কারণগুলো নিহিত ছিলো অন্যত্র। দেশবিভাগের পর থেকে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে। নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে তাঁদের সচেতন হতে হয়েছিলো— আর্থ-সামাজিক কারণে, প্রতিকূল শাসন এবং দুর্বহ শোষণের মুখে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে-বাঙালিয়ানার হাওয়া বইতে শুরু করে, তাই রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁরা তাঁকে

আপনজন বলে গ্রহণ করেন। তাঁকে নিয়ে গর্ব করতে আরম্ভ করেন। আর, রবীন্দ্রনাথও সে পর্যায়ে তাঁর রচনা দিয়ে, বিশেষ করে তাঁর গান দিয়ে, পূর্ব বাংলার বাঙালিদের অনুপ্রাণিত করেন।

বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা পড়ে পাননি, অর্জন করেছিলেন। এবং, সে জন্যেই সেই অর্জিত সম্পদকে রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁরা অতিরিক্ত যত্ন দেখান। অচেনা রবীন্দ্রনাথ জ্যান্ত হয়ে ওঠেন এই পরিবেশেই। তখনকার পূর্ব বাংলায় যখন, ধরা যাক, রবীন্দ্রজয়ন্তী হতো, রবীন্দ্রমৃত্যুবার্ষিকী হতো, ঋতু-উৎসব হতো, পয়লা বৈশাখ হতো তখন তার মধ্যে একটা আন্তরিকতা থাকতো, প্যাশন থাকতো। সারা জীবনে যে রবীন্দ্রনাথ পড়েনি অথবা পড়লেও বুঝতে পারেনি, অথবা বুঝতে পারলেও তাঁর বাণী স্বীকরণ করেনি, সেও হাজির হতো এসব অনুষ্ঠানে। মাঠের মধ্যে হাজার হাজার লোক আসতো ছায়ানটের আহ্বানে। সে মোটেই সাহিত্যের টানে নয়। তার ভেতরে থাকতো রবীন্দ্রনাথ নামটির প্রতি খাঁটি ভালোবাসা, বাঁধ-ভাঙা উৎসাহ, রবীন্দ্রনাথ নামটিকে নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর আগ্রহ আর বাঙালিয়ানা-বিরোধী মনোভাবের প্রতি প্রচণ্ড প্রতিবাদ। সে আমলে যখন ফৌজী শাসনের খড়্গ নেমে আসতো সাংস্কৃতিক কর্মীদের ওপর তখন গোটা ছায়ানট গাইতো: ওদের বাঁধন যতো শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে। ফাহমিদা খাতুন তখন 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' বলে সুর ধরলে শ্রোতারা ভাবাবেগে বাষ্পাকুল হতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল হতো। একটা জাতির পরিচয়কে জাগিয়ে তুলতে, সেই পরিচয়ের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে— বন্দুক নয়— গান আর কবিতার পঙক্তি যে অব্যর্থ শক্তিশেলের মতো কাজ করতে পারে, সেটা তখনকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।

তাই বলে ষাটের দশকে রবীন্দ্রচর্চা আজকের মতো ব্যাপক হয়নি পূর্ব বাংলায়। রবীন্দ্রনাথের গান শোনার সুযোগ ছিলো খুবই সীমিত। ঢাকা বেতারে গান গাইতেন কলিম শরাফী, সনজীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, বিলকিস নাসিরউদ্দীন, জাহেদুর রহীম-সহ হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন। তখন পর্যন্ত একটি মাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত— আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ— ব্যবহৃত হয়েছিলো পূর্ব বাংলার চলচ্চিত্রে। প্রকাশিত হয়েছিলো ফাহমিদা খাতুনের গাওয়া ঐ একটি মাত্র গানের রেকর্ড। ঢাকা বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানও থাকতো খুব কম। এমন কি, একাধিকবার রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজানোর ওপর সরকার পুরো নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলো। কলকাতা থেকে প্রকাশিত গ্রামোফোন রেকর্ডও ঢাকায় ছিলো দুর্লভ বস্তু— ক্যাসেট আর সিডির দেখাই মেলেনি তখন। তারই মধ্যে কলকাতা থেকে আসতো বেতার জগৎ। সেই বেতার জগৎ দেখে সকাল আর সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান শুনতে হতো। এই পরিবেশে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়— এঁরা ছিলেন আমাদের চোখে এক-একজন জাগ্রত দেবদেবীর মতোন।

এক কালের অবহেলিত রবীন্দ্রনাথ সে পরিবেশে কতোটা ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন, তার একটা প্রমাণ— 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। এ গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিশেবে স্বীকৃতি লাভ করে ধীরে ধীরে জনগণের হাতে, যুদ্ধের সময়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় সংসদ তাকে কেবল আইনী অনুমোদন দান করে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিলো ২৫শে মার্চ। কিন্তু 'আমার সোনার বাংলা' গেয়ে সাধারণ মানুষ অনুপ্রাণিত হচ্ছিলেন, ভাবী স্বাধীন বাংলার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা প্রকাশ করছিলেন তার অনেক আগে থেকেই।

স্বাধীনতা লাভের পর তিন দশক চলে গেছে। ইতিমধ্যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের আদর্শ ধুয়েমুছে বঙ্গোপসাগরে ভেসে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে-উৎসাহ ষাটের দশকে দেখা দিয়েছিলো, সমাজের একাংশে তা এখনো জোরালোভাবেই বহাল রয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে নয়, রবীন্দ্রনাথ এখনো এঁদের মধ্যে সক্রিয়ভাবেই বেঁচে আছেন বলে মনে হয়। অপর পক্ষে, সমাজের আর-এক অংশে আছেন ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তি, যাদের আর-এক পরিচয় ভারতবিরোধী বলে। এঁদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ জ্যান্ত একটা সত্তা। এঁরা মৃত রবীন্দ্রনাথকে খুব ভয় করেন। এঁরা যেভাবে রবীন্দ্রবিরোধিতা করেন, ষাট বছর আগে মরে-যাওয়া কোনো ব্যক্তির প্রতি সাধারণত এতো বিরোধিতা কারো থাকে না। কেউ রবীন্দ্রচর্চা করছেন শুনলেই এঁরা তাঁর মধ্যে ভারতের দালালির গন্ধ পান। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মরেও এঁদের চেতনায় রীতিমতো জীবিত। সে অর্থে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের অ্যাকাডেমিক চর্চা সীমিত হলেও রবীন্দ্র-সমর্থক এবং রবীন্দ্র-বিরোধী— উভয় গোষ্ঠীর মধ্যেই তিনি বেঁচে আছেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে?

কালিদাস, ভ্যর্জিল প্রমুখের সঙ্গে তুলনা করে মাইকেল মধুসূদন বলেছিলেন এঁরা মানুষ, কিন্তু মিল্টন ডিভাইন। আমার চোখে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন ডিভাইন। কিন্তু সেই ভাবে রূঢ় আঘাত লেগেছিলো ৭১-এর পঁচিশে বৈশাখ এবং কোথায়? না, যেখানে রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং বাস— সেই খোদ কলকাতায়। পার্ক স্যর্কাসে বাংলাদেশ মিশনের সামনে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে শিল্পীরা যোগ দিয়েছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় আর দেবব্রত বিশ্বাস আসতে পারেননি ব্যক্তিগত কারণে। কিন্তু নামী-দামী অন্য শিল্পীরা এসেছিলেন। দেখলাম রাস্তায় বসে থাকা, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য শ্রোতা সুচিত্রা মিত্রের মতো শিল্পীর গানও শুনছেন না। গল্প করছেন নিজেদের মধ্যে। বিস্মিত হলাম বললে কিছুই বলা হয় না— দারুণ দুঃখিত হলাম। বুঝলাম, রবীন্দ্রনাথ এঁদের কাছে আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। আর-পাঁচটা ঠাকুর-দেবতার পুজোর মতো অথবা জামাই ষষ্ঠী কি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মতো এও একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠান। বেল পাতা নয়, তবে এর জন্যে নির্দিষ্ট কয়েকটা উপকরণ লাগে। যেমন,

সভাপতি, বক্তা, গায়ক, হারমোনিয়াম, তবলা, মাইক ইত্যাদি। সেগুলো সরবরাহ করার ব্যবস্থাও থাকে। ভাড়া করা যায়। পুজো দেখার মতো এ অনুষ্ঠানেও ধুতি-পাঞ্জাবী পরে যেতে হয়। গেলে সংস্কৃতিবান বলে পরিচিত হওয়া যায়।

এখন সাড়ে তিন দশক পরে রবীন্দ্রনাথের এই পতনের প্রক্রিয়াটা বুঝতে পারি। এর সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো কোনো অনুষ্ঠানের সাদৃশ্যও দেখতে পাই। সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত হলো একুশে ফেব্রুয়ারি— শহীদ দিবস। এক-একটি শহীদ দিবস প্রচণ্ড ঢেউয়ের মতো এসে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত দূরে সরিয়ে দিচ্ছিলো। ফলে দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তান পুরোপুরি এগিয়ে যাচ্ছিলো ভেঙে যাওয়ার দিকে। এ দিনের উদ্‌যাপনে কারো উদ্যোগ নিতে হয়নি। এ ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত। পূর্ব বাংলার শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে এর ছিলো নাড়ীর বন্ধন। এই দিনের উদ্‌যাপন তাঁদের উজ্জীবিত করতো, শোকের মধ্য দিয়ে শক্তি সঞ্চার করার অনুপ্রেরণা জোগাতো, বাঙালি হওয়ার, স্বাধীন হওয়ার উৎসাহ দিতো। ৭১ সাল পর্যন্ত এ দিনের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য ছিলো অন্তহীন। কিন্তু ৭২ সাল থেকে এ দিনের রূপান্তর ঘটলো— এ দিন পরিণত হলো আনন্দ-উৎসবে। ধীরে ধীরে এর উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য— দু-ই লোপ পেলো। এ হলো এখন বাঙালির পঞ্জিকায় আরও একটি ছুটির দিন, আরও একটি পার্বণ। এ দিনে এখনও প্রভাত ফেরী বের হয়, হাজার হাজার লোক শহীদ মিনারে যান। কিন্তু অনেকে, বিশেষ করে তরুণদের অনেকে, জানেনও না কেন যান। এ দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সে অনুষ্ঠানের জন্যে সরকারী তহবিল থেকে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা বরাদ্দ থাকে। ঠিকাদার রাস্তায় আল্পনা আঁকে, সামিয়ানা খাটায়। শিল্পীরা গান গাইবার জন্যে সম্মানী পান। দর-দস্তুর হয়। এক অনুষ্ঠানের গান শেষ করে তাঁদের অন্য অনুষ্ঠানে ছুটতে হয়।

৭১-এর কলকাতায় এই একই ধরনের প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতা দেখেছিলাম। আমার ধারণা, এখন তিনি সম্ভবত আরও প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছেন। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হলো: অন্যদিকে— কলেজ স্ট্রীটে আর কলেজ পাড়ায়— তিনি আবার যৌবন ফিরে পেয়েছেন। হ্যাঁ, রবীন্দ্র-বাণিজ্য এবং রবীন্দ্র-শিল্পের খুব প্রসার ঘটেছে, অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। তা ছাড়া, বাংলার অধ্যাপক একের পর এক রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ক নোট বই লিখে বাড়ি বানাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের নামে প্রবন্ধ লিখে কলামিস্ট পঁচিশে বৈশাখ আর বাইশে শ্রাবণ যৎকিঞ্চিৎ কামাই করছেন। কেউ বা চাকরিতে উন্নতি করার জন্যে রবীন্দ্রনাথের ওপর সম্ভাব্য (এমন কি অসম্ভব) সব বিষয় নিয়ে ডাক্তারি পাশ করছেন। (রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথিতে কতোটা পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, তা নিয়েও বোধ হয় এতো দিনে পিএইচডি অভিসন্দর্ভ লেখা হয়েছে। আমার অজ্ঞতা মাফ করবেন— আমি ঠিক নিশ্চিত নই এ বিষয়ে লেখা হয়েছে কিনা। কিন্তু হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথ, ভোজনরসিক রবীন্দ্রনাথ, কৃষিবিশারদ রবীন্দ্রনাথ, জমিদার রবীন্দ্রনাথ— এসব বিষয় নিশ্চয় এখন আর বাদ নেই!)

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন যে, তাঁর গান আর ছোটোগল্প টিকে থাকবে। অন্তত এখনো আছে। গল্পটা তেমন নয়, কিন্তু তাঁর গান ছাড়া আধুনিক শৌচাগার উদ্বোধনও কল্পনাতীত। এ বছরের (২০০৬) ২৫শে জানুয়ারি মাইকেল মধুসূদনের সমাধিতে গিয়েছিলাম সেখানে কিভাবে তাঁকে বাঙালিরা স্মরণ করেন, তা দেখার ঔৎসুক্য মেটাতে। দেখলাম রাজনৈতিক টাউটরা এসেছেন এবং তরুণ-তরুণীরা এসেছেন জোড়ে। টেলিভিশনের ক্র্যুরাও। সভাপতি মশাই ছাড়া বাকি সবাই বোধ হয় কবিতা আবৃত্তি করলেন। হ্যাঁ, মাইকেলের কবিতা। আমি যখন ভাবছি— কী অন্যায়, বাংলার মাটিতে রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত!— ঠিক তখনই এক তরুণী আবেগে গলা কাঁপিয়ে পড়লেন রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাড়া মাইকেলের জন্মদিনও উদ্‌যাপিত হয় না! আর তাঁর গান তো বাঙালি জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ গান বোঝার জন্যে উচ্চাঙ্গসংগীতের জ্ঞান লাগে না। তা ছাড়া, কথাগুলো খুব আকর্ষণীয়। প্রচুর 'তুমি' এবং প্রচুর ভালোবাসার কথা থাকে। সেগুলো সহজে বোঝা যায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাঁর গানের কথাগুলো কানের ভিতর দিয়া একেবারে মরমে প্রবেশ করে। সে জন্যে কবিতা অথবা ছোটোগল্পের চেয়েও তাঁর গানের চাহিদা ঢের বেশি। চাহিদা আর সরবরাহের নিয়মে তাঁর গান নিয়ে তাই রীতিমতো বাণিজ্য হচ্ছে। (বৈদেশিক মুদ্রার কথা ভেবে সরকারী ভুর্তুকী দিলে কেমন হয়?)

বাণিজ্য করতে গেলে বিবেকের, বিবেচনার কথা ভাবা যায় না। রবীন্দ্রবাণিজ্যেও এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান মাত্রায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন, একটা সময় পর্যন্ত দেখা যেতো যে, একজন বড়ো শিল্পী একটা গান রেকর্ড করলে অন্য শিল্পী আর সে গানের রেকর্ড করতেন না। ফলে নতুন রেকর্ডের জন্যে যেসব গান বড়ো একটা গাওয়া হতো না, তেমন গান খুঁজে বের করতে হতো। এভাবে অনেক অপ্রচলিত গান সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতো। কিন্তু এখন আর সেই চক্ষুলজ্জা নেই। যে-কোনো শিল্পী যে-গান খুশি গাইতে পারেন। আগের শিল্পীর তুলনায় ভালো করলে তার যুক্তি থাকতো। এমন কি, আগের শিল্পী গানের যে-ইন্টারপ্রেটেশন দিয়েছেন, তার থেকে ভিন্ন ইন্টারপ্রেটেশন দিলে অথবা নিজস্ব ভঙ্গিতে গান পরিবশেন করলেও অযৌক্তিক হতো না। কিন্তু এখন ক্যাসেটের যুগে স্বরলিপি ধরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে যিনি গান করতে পারেন, তারই গান বাজারে ছাড়া হয়। কারণ, এর জন্যে কম্পেনিকে টাকা খরচ করতে হয় না, যাঁর ক্যাসেট তিনি নিজেই টাকাপয়সা দিয়ে কম্পেনির কর্মকর্তাদের অনুরোধ-উপরোধ করে ক্যাসেট প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। আর্থিক অবস্থা আর-একটু ভালো হলে একই কৌশলে সিডিও প্রকাশ করা যায়। কম্পেনির কোনো আর্থিক লোকসান নেই তাতে— কারণ ক্যাসেট বিক্রি না-হলেও কিছু যায়-আসে না, গায়ক-গায়িকাই টাকা দিয়ে পুষিয়ে দেন।

রেকর্ড কম্পেনিগুলোর আর-একটা আয় হলো: একজন বিখ্যাত শিল্পী ধরা যাক যদি চল্লিশটা গান গেয়ে থাকেন, তা হলে নানা রকমের পার্মিউটেশন-কম্বিনেশন করে সেই গানগুলো দিয়েই চার-পাঁচটা সিডি করে ফেলেন। একজন ভালো শিল্পীর সঙ্গে আরও দুজন মাঝারি শিল্পীর গান মিশিয়ে সংকলন প্রকাশ করেন। যাঁর টাকা আছে, তিনিই ক্যাসেট অথবা সিডি প্রকাশ করতে পারার আর-একটা কারণ: এখন আর বিশ্বভারতীর সঙ্গীত পর্ষদের অনুমোদন লাগে না। গলায় সুর না-থাকলে অথবা বেসুরো গাইলে কোনো ক্ষতি নেই। এই অরাজকতার যুগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রবরবা ব্যবসা চলছে।

রবীন্দ্রব্যবসার আর-একটা এলাকা দখল করেছেন প্রকাশকরা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থস্বত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন বিশ্বভারতীকে। বিশ্বভারতীই ষাট বছর সেই গ্রন্থস্বত্ব ভোগ করেছিলো। কিন্তু এখন সেই একচেটিয়া স্বত্ব লোপ পাওয়ার পর নানা প্রকাশক এগিয়ে এসেছেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ব্যবসা করার জন্যে। একই *রবীন্দ্ররচনাবলী* এখন ছাপছেন নানাজন। কেউ কেউ চক্ষুলজ্জায় একটু ভিন্ন রকমে রচনাগুলো সাজাচ্ছেন। আর কেউ কেউ অতো ঝামেলা না-করে ৬১ সালের সংস্করণই হুবহু ছাপিয়ে দিচ্ছেন। সাধু যার ইচ্ছা ঈশ্বর তার সহায়। এ ক্ষেত্রে প্রকাশকদের সহায় হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি। কম্পোজ করার ঝামেলা নেই। অফসেটে ছাপা হচ্ছে। সুতরাং চৌর্যবৃত্তির জন্যে চোরদেরও যেসব কৌশল আয়ত্ত করতে হয় সাধনা করে, প্রকাশকের তাও দরকার হয় না। খালি লেটার প্রেসকে একটু উন্নত করে অফসেট প্রিন্টের ব্যবস্থা করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশ করার প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রকাশদের মধ্যে যে-লড়াই ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও প্রবল হবে, তাতে কাজ করবে আর-পাঁচটা ব্যবসায় যেসব জিনিশ— মার্কেট ফোর্স— কাজ করে, সেগুলোই। অর্থাৎ কতো কম দামে ছেপে কতো বেশি লাভ করা যায়। কতো চকচকে মলাট দিয়ে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করা যায় (হায়রে বিশ্বভারতীয় মলাট!), কতো আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, উপন্যাস হলে মলাটে নায়িকার অর্ধনগ্ন ছবি ইত্যাদি। এর পরে এর সঙ্গে আরও যুক্ত হবে বাংলার অধ্যাপকদের নাম। ভূমিকা-সংবলিত অমুকের সম্পাদিত *রবীন্দ্ররচনাবলী*।

দেখেশুনে মনে হতেই পারে যে, রবীন্দ্রনাথ আবার অশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। আমাদের কাছাকাছি চলে এসেছেন। কেউ বেড়াতে এলে নিদেন পক্ষে বসার ঘরে বুড়ো রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি টাঙানো দেখবেন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পাবেন। তা ছাড়া, কাঁচের আলমারিতে একেবারে আনকোরা নতুন *রবীন্দ্ররচনাবলী*ও দেখতে পাবেন (ঘর সাজানোর উপকরণ— কেউ কোনোদিন খুলে দেখেনি)। এর পরে আর সংস্কৃতিবান বলে অন্য কারো স্যার্টিফিকেটের প্রয়োজন হবে না। যে দেবতা সর্বগৃহে সংস্কৃতিরূপে সংস্থিত, তিনি রবীন্দ্রনাথ। (রামকৃষ্ণ পর্যন্ত হয়েছিলেন। বেচারা রবীন্দ্রনাথ একটু দেরিতে জন্মেছেন, তা না-হলে তাঁকে দ্বাদশ অবতার বলে চালিয়ে দেওয়া যেতো!)

ভাগ্যের পরিহাস, রবীন্দ্রশিল্প ও বাণিজ্যের যখন এতোই শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, এমন কি, তাঁর গান এবং রচনাবলী ঘরে ঘরে শোভা পাচ্ছে, সেই সুসময়ে আসল রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রায় ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা ছিলেন। নিজেই তাঁর এই অবস্থা হবে কল্পনা করে রূপকের মধ্য দিয়ে লিখেছিলেন: নদী যখন হারিয়ে যায়, তখন দেখতে পাই গর্ত এবং বালি। (সরিয়াসলি নেবেন না দয়া করে!) রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ তাঁর আদর্শ যখন প্রায় পুরোপুরি লোপ পেতে বসেছে, অথবা লোপ পেয়েছে, সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথের সুন্দর রঙিন ছবি, গানের রেকর্ড আর রচনাবলী গুনগুনিয়ে আমাদের ঘরে এলো। রবীন্দ্রনাথ আমার চোখে মানবতার প্রতীক। মহত্ত্বের প্রতীক। ঔদার্যের প্রতীক। আন্তর্জাতিকতার প্রতীক। আনুষ্ঠানিকতার বদলে তিনি শেষে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন মানুষের ধর্মে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নয়, তাঁর কাছে ধর্ম ছিলো সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গল। জীবন এবং সমাজ থেকে সেই রবীন্দ্রনাথকে বিসর্জন দিয়ে আজ যে-রবীন্দ্রনাথকে পুজো করা হচ্ছে, তিনি রবীন্দ্রনাথ নন। সে রবীন্দ্রনাথ কবে মরে ভূত হয়ে গেছেন!

(*দৈনিক স্টেটসম্যান*, রবীন্দ্রজয়ন্তী, ২০০৬)

২১
শ্রেষ্ঠ বাঙালি: রবীন্দ্রনাথ বনাম শেখ মুজিব

বছর তিনেক আগে একটি বিশ্ববেতার সম্প্রচার সংস্থা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কে, তা নিয়ে একটি জরিপ করেছিলো তাদের শ্রোতাদের মধ্যে। কয়েক হাজার শ্রোতা যে-জবাব দিয়েছিলেন, তাতে শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে নাম পাওয়া গিয়েছিলো শ দেড়েক ব্যক্তির— মীর জাফর এবং গোলাম আযমের নামও বাদ যায়নি। সুতরাং এ মতামতকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জরিপের ওপরের দিকে অনেক বিখ্যাত বাঙালির নাম ছিলো; যেমন রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নজরুল ইসলাম ইত্যাদি। কিন্তু সবার ওপরে নাম ছিলো শেখ মুজিবুর রহমানের। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার পরে— দু নম্বরে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেখ মুজিবের তুলনা দেখে অনেকেই একে এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু প্রতিভার বিচারে যেমনই হোক না কেন, বাঙালির ইতিহাসে মুজিব কি রবীন্দ্রনাথের তুলনায় খুব নগণ্য ? বিশেষ করে বাঙালিদের যে-ইতিহাস এখন থেকে শত বর্ষ পরে লেখা হবে, তাতে এই গুরুত্ব আজকের তুলনায় কি বৃদ্ধি পাবে না ?

আমরা এক কথায় সংস্কৃতি বলে যে-ধারণাটাকে চিহ্নিত করি, তা হলো প্রধানত বৈদগ্ধ্যের। এলোমেলোভাবে গলা ওঠা-নামা করে চেঁচালে, তা থেকে কোলাহল সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু পরিশীলিত পদ্ধতিতে গলার ওঠা-নামা করে শব্দ বের করলে তা সঙ্গীতে পরিণত হয়। তেমনি তালে-তালে পরিশীলিতভাবে অঙ্গভঙ্গি করলে তা নাচে পরিণত হতে পারে। পেট ভরানোর জন্যে যা-তা রান্না করে হাপুসহুপুস করে খেলে সেটা যা-ই হোক, রন্ধন এবং খাদ্য পরিবেশনাও শিল্পিত হতে পারে। মোট কথা, বিদগ্ধতাকেই আমরা অনেক সময়ে সংস্কৃতির সঙ্গে অভিন্ন করে দেখি। কিন্তু বৈদগ্ধ্যবর্জিত রাজনীতি সংস্কৃতির চেহারা আমূল বদলে দিতে পারে এবং তা পারে তুলনামূলকভাবে কম সময়ের মধ্যে। আমরা যাকে বাঙালি সংস্কৃতি বলি তার একটা প্রধান এলাকাই জুড়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ— বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিক্ষা, রুচি ইত্যাদি বহু বিষয়ে। কেবল তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবদানে এসব জিনিশকে এমন একটা উৎকর্ষ দিয়েছেন, যা তাঁর আগেকার অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা এখন তাঁর ভাষায় কথা বলি, লিখি। অজানতেই তাঁর গান, তাঁর কবিতা আমাদের মন এবং হৃদয়কে আলোকিত এবং মার্জিত করে। সেখানে শেখ মুজিবের কোনো অবদান নেই। এমন কি, তিনি নিজে রাবীন্দ্রিক বৈদগ্ধ্য কতোটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, সেও প্রশ্নসাপেক্ষ। কিন্তু এখন বাঙালি সংস্কৃতি যে-পথে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে শেখ মুজিব জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বৈপ্লবিক অবদান রেখেছেন বলে আমার ধারণা।

বাঙালির যে-ইতিহাস এবং সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে গত সাত-আট শতাব্দী ধরে, তাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এক ভদ্রলোক, যাঁর নাম আমার পাঠকদের অনেকে হয়তো জানেনও না— শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্। আমরা এখন যাকে বঙ্গদেশ বলে জানি, প্রাচীন কালে তা বিভক্ত ছিলো ছোটো ছোটো বেশ কয়েকটি দেশে— গৌড়, রাঢ়, সুক্ষ্ম, বরেন্দ্রী, বঙ্গ, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট, হরিকেল ইত্যাদি। এসব দেশের শাসক এক ছিলেন না। এসব দেশ মিলে কোনো একটি অভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটও ছিলো না। যিনি এদের একত্রিত করে এক অভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় আনেন অথবা আনার গোড়াপত্তন করেন তাঁরই নাম শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্। তাঁর মস্ত অবদান এই যে, তিনি চোদ্দো শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসব দেশের বেশির ভাগ জায়গাই জয় করে এগুলোকে একটি মাত্র প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন। সবগুলো দেশ এক বঙ্গদেশে পরিণত হয়।

বস্তুত, ইলিয়াস শাহের হাতে একবার একটা অখণ্ড বঙ্গদেশ স্থাপিত হওয়ার পর অখণ্ড বঙ্গীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠারও সম্ভাবনা দেখা দেয়। তার আগে, রবীন্দ্রনাথের মতে, এই দেশগুলোর সংস্কৃতি এক ছিলো না। "বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় বরেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিলো তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজের মিলও ছিলো না।" কিন্তু এক বঙ্গদেশের আওতায় এসে ধীরে ধীরে একটা বঙ্গীয় পরিচয় গড়ে ওঠার ভিত্তি তৈরি হলো। সিকান্দার শাহ এবং হোসেন শাহের আমলে এই ভিত্তি আরও মজবুত হয়। এই প্রশাসনিক ইউনিট আরও সমন্বিত হয় মোগল যুগে। তারপর কয়েক শতাব্দী ধরে আমরা আঞ্চলিক পরিচয় কাটিয়ে বাঙালি হয়ে উঠি। ষোড়শ শতকে মুকুন্দরাম যাকে 'বাঙাল' বলেছিলেন, ভারতচন্দ্র সে পরিচয়কে আরও সম্প্রসারিত করে বঙ্গের তাবৎ অধিবাসীকে 'বাঙ্গালী' বলে চিহ্নিত করেন, কারণ গোটা এলাকাই সুবেহ বাঙ্গালায় পরিণত হয়েছিলো।

তা ছাড়া, বাংলা ভাষাও রীতিমতো বাংলা হয়ে ওঠে আলোচ্য সময়ে। মনে রাখা দরকার, চর্যাপদের ভাষা খাঁটি বাংলা ছিলো না। তা ছিলো বাংলা, ওড়িয়া এবং অহমিয়ার জননী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল এবং চর্যাপদের সঙ্গে তার ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্যের পরিমাণ বিবেচনা করলে বলতে হয় বাংলা ভাষা তার নিজের বৈশিষ্ট্য লাভ করতে শুরু করে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী থেকে। তারপর সেই বিবর্তিত ভাষাতেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত হয়, মনে হয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে। কিন্তু বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তখনো একটা অখণ্ড ভাষিক পরিচয় গড়ে উঠেছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। আঠারো শতকের আগে পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের ভাষা "বাঙ্গালা" নামে পরিচিত হয়নি। এলাকা এবং ভাষা উভয় দিয়ে একটা অভিন্ন বঙ্গীয় পরিচয় গড়ে ওঠে কয়েক শতাব্দী ধরে। ভারতচন্দ্র নিজেকে বাঙ্গালী বলেছিলেন বঙ্গের অধিবাসী হিশেবে। কিন্তু তাঁর দেড় শো বছর পরে রবীন্দ্রনাথের কাছে বাঙালির প্রধান ঐক্য

মনে হয়েছে আঞ্চলিক নয়, ভাষিক ঐক্য। "এর মধ্যে এক ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি।" অর্থাৎ বাঙালি সংস্কৃতিতে যেসব অভিন্ন উপাদান আছে, রবীন্দ্রনাথের মতে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাংলা ভাষা। সে কারণে যখন থেকে বাংলা ভাষার উন্মেষ, তখন থেকে বাঙালি সংস্কৃতির সূচনা।

ভৌগোলিক অনৈক্য ছাড়াও, বাঙালি সমাজের সবচেয়ে বড়ো বিভেদ হলো: এ সমাজ বহু কোঠায় বিভক্ত, জল-অচল কোঠায়। বহু প্রাচীর গড়ে উঠে এই সমাজকে ছোটো ছোটো ভাগে বিভক্ত করেছে। সবচেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হলো ধর্মের। সেন-আমলে বৌদ্ধ আর হিন্দুরা পাশাপাশি বাস করতে পারেননি— একীভূত হয়েছিলেন। আবার হিন্দু-মুসলমান বহু শতাব্দী ধরে পাশাপাশি বাস করেও কাছাকাছি আসতে পারেননি। তাঁদের একত্রে খানাপিনা হয় না; বিয়েতো দূরের কথা। একটা সময়ে ছোঁয়াছুঁয়িও ছিলো বিরাট ব্যবধানের কারণ। এক বাংলা ভাষায় কথা বললেও তাঁদের ভাষায়ও স্বাতন্ত্র্য আছে। জল আর পানি— উভয় এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। কিন্তু হিন্দুরা পানি বললে তাঁদের জাত যায়; মুসলমানরা জল খেলে তাঁদের মুসলমানীত্ব চলে যায়। বাংলা ভাষার মতো 'কুফুরী জবান' (কাফেরদের ভাষা) তাঁদের মাতৃভাষা কিনা, তা নিয়েও এক শতাব্দী আগে মুসলমানরা বিতর্ক করেছেন। কাগজ-কলম, জামা-মোজা, জমা-খরচের মতো আরবি-ফারসি শব্দ হিন্দুরা ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু সন্তানের আরবি-ফারসি নাম রাখেন না। তবে গ্রামের অশিক্ষিত মুসলমানরা চাঁদ মিঞা, সুরুজ মিঞা, তারা মিঞা, কালা মিঞা, ধলা মিঞা নাম রাখেন। শহরের শিক্ষিত অসাম্প্রদায়িক মুসলমানরাও তাঁদের বৈদগ্ধ্য প্রমাণ করার জন্যে নাম রাখেন বাংলায়। কিন্তু তবু তাঁদের ভেদ ঘোচে না। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ধর্মীয় পরিচয় তাঁদের ভূতে পাওয়ার মতো সারাক্ষণ অধিকার করে থাকে। তেমন অবস্থা হলেই ভদ্র পোশাকের আড়াল থেকে ধর্মের লেজটা বেরিয়ে পড়ে।

দেবতাহীন ধর্মে বিশ্বাসী বাউলরা আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় পরিচয় অস্বীকার করে মনুষ্য পরিচয়কেই বড়ো করে তুলে ধরেছিলেন। 'আমার পথ ঢাইকাছে মসজিদে মন্দিরে' বলে মদন বাউল গান গেয়েছেন। লালন ফকির জাতের ভিন্নতা দেখতে পাননি। কিন্তু বৃহত্তর সমাজে এঁদের প্রভাব পড়েনি। যাঁরা সাহিত্য-সৃষ্টি করে সমাজের আরও বৃহত্তর পরিধিতে পৌঁছতে পেরেছিলেন, যেমন ধরা যাক, বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁরা আবার ধর্মের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। যিনি নিজের বিচিত্র সৃষ্টি দিয়ে একটা ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক পরিবেশ রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। নজরুল ইসলামও খানিকটা। সে দিক দিয়ে সময়ের বিচারে বাঙালিত্বের ইতিহাসে ইলিয়াস শাহ যে-মাইলফলক তৈরি করেছিলেন, তারপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক রবীন্দ্রনাথ। তাঁদের অবদান ভিন্ন ধরনের। কাজেই সেই অবদানের কোনো তুলনা চলে না। 'শাহে বাঙ্গালিয়ান' অর্থাৎ বাঙালিদের শাহ উপাধি গ্রহণ করে ইলিয়াস শাহ নিজেকে

গৌরবান্বিত করেছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাঙালিদের বিদগ্ধ রুচির মানুষে পরিণত করেছিলেন। তাঁর সৃষ্টি দিয়ে, বস্তুত, বাঙালিকেই গৌরবান্বিত করেছিলেন তিনি। ইলিয়াস শাহ ভারতবর্ষে বাঙালিদের একটা স্বাধীন দেশের অধিবাসীতে পরিণত করেছিলেন। অপর পক্ষে, স্বাধীনতা দিতে না-পারলেও রবীন্দ্রনাথ বাঙালিদের বিশ্বের কাছে একটা স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছিলেন। নজরুল ইসলামও সাম্প্রদায়িকতার সীমানা লঙ্ঘন করে মানুষকে মানুষ হিশেবে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। মদন বাউলের মতো তিনিও বলেছিলেন যে, দাঙার পরে মসজিদ-মন্দির টিকে থাকলো, কিন্তু মানুষ থাকলো না। তিনিও বলেছিলেন যে, মানুষের জন্যে ধর্ম, মানুষ ধর্মের জন্যে নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরের কথা না-বলে, যিশু, কৃষ্ণ, মোহাম্মদ-প্রবর্তিত দৈবিক এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন, যদিও বিশেষ কোনো ধর্মকে তিনি অন্য ধর্মের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেননি।

অল্পকাল আগে বাঙালি সংস্কৃতির একটি ইতিহাস লিখে তারপর তার নির্ঘণ্ট তৈরি করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উল্লেখ আছে ছিয়াশিটি পৃষ্ঠায়; আর শেখ মুজিব সম্পর্কে চারটি পৃষ্ঠায়। আমি রবীন্দ্রনাথের ভক্ত নিঃসন্দেহে, তবে অন্ধভক্ত নই; কেবল তাই নয়, যাঁরা অন্ধভক্ত তাঁদের আমি অপছন্দ করি। গুরুগিরিতে আমার বিশ্বাস নেই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কথা আমি বাড়িয়ে লিখিনি। এ ইতিহাসে তাঁর যতোটুকু কৃতিত্ব প্রাপ্য, আমি তার বেশি দিইনি বলেই মনে করি। তা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সঙ্গীত, মননশীলতা, ইতিহাস, নাটক, থিয়েটার, সিনেমা, ধর্ম, পোশাক, খাদ্য, নারী ইত্যাদি বিষয়ে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা বারবার আসতেই পারে। আমরা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে রবীন্দ্রবিশ্বেই বাস করি। তা ছাড়া, আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার— রবীন্দ্রনাথ কেবল বঙ্গদেশ অথবা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা নন। তিনি বিশ্বেরই চিরকালের একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি। ধরা যাক, দা ভিঞ্চি। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা থেকে শুরু করে বহু ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো এতো বৈচিত্র্য তাঁর প্রতিভাতেও ছিলো না। রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্প লেখক, গীতিকার, সুরকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, চিত্রশিল্পী— কী না! কাজেই প্রতিভার মাপে তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

অপর পক্ষে, শেখ মুজিব ছিলেন একজন জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী রাজনীতিক। যখন তিনি হয়তো দেশকে আরও দিতে পারতেন, তার আগেই আততায়ীরা তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। সুতরাং তাঁর নাম আর কতোবারই আসবে? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পৌনঃপুনিক উল্লেখ আর মুজিবের সীমিত উল্লেখ থেকে বাঙালির ইতিহাসে তাঁদের প্রভাবের পরিমাপ করা বোধ হয় সম্ভব নয়। অর্থাৎ মুজিবের প্রভাব এবং অবদান রবীন্দ্রনাথের ছিয়াশি ভাগের চার ভাগ নয়। বাঙালির ইতিহাসে তাঁর স্থান তার থেকে অনেক ওপরে, অনেক বেশি। তিনি বাঙালিদের চিরস্থায়ীভাবে একটি

স্বাধীন দেশ দিয়েছেন। কেবল তাই নয়, তিনি যে-দেশ তৈরি করেছিলেন, তার মধ্যে ধর্মনির্বিশেষে বাঙালিত্বের বিকাশের সম্ভবনাও অনেক বেশি ছিলো। পিতা সাধারণত সন্তানের একটা নাম দিয়ে সেই নামের মধ্য দিয়ে একটা প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। এক সময়ে বৃহত্তর বঙ্গদেশের জনপ্রিয় নাম ছিলো বাংলাদেশ। শেখ মুজিব তাঁর স্বপ্নে দেশকে ভালোবেসে সেই পুরোনো বাংলাদেশ নামটাই দিয়েছিলেন। সেই দেশের জাতীয় সঙ্গীত হিশেবে বেছে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই একটি গান— আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। অনেক সময়ে তিনি বক্তৃতায় বলতেন "আমি তোমায় খুবই ভলোবাসি।" এই নামের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রত্যাশার খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাংলাদেশের নাগরিকদের সরকারী নাম তিনি দিয়েছিলেন 'বাঙালি'। হয়তো তিনি আশা করেছিলেন তাবৎ বাঙালির দেশ হবে এই বাংলাদেশ। সব ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতে পারবেন এখানে স্বাধীনভাবে। এখানে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে অবাধভাবে।

কিন্তু সন্তানের বাল্যকালে পিতার মৃত্যু হলে সে সন্তান যেমন অনেক সময়ে অভীষ্ট পথে যায় না, অথবা যেতে পারে না, শেখ মুজিবের স্বপ্নে-দেখা বাংলাদেশও তাঁর প্রত্যাশিত পথে যায়নি। তার জন্যে দায়ী রাজনীতি। তিনি নিজে অসাধারণ জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী রাজনীতিক হলেও, স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। অসীম সম্ভাবনা এবং জীবনীশক্তি নিয়ে যে-বাংলাদেশ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো, অচিরেই তা পাগলা ঘোড়ার মতো তাঁর হাত থেকে ফসকে বেরিয়ে যায়— তিনি তার রাস টেনে ধরতে পারেননি। আসলে তিনি যতো বড়ো নেতা ছিলেন, প্রশাসক হিশেবে ততোটাই অযোগ্য ছিলেন। সে কেবল অভিজ্ঞতার অভাবে নয়, শাসক হবার মতো ক্ষমতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তাই তাঁর ছিলো না। সময়টাও তাঁর অনুকূল ছিলো না। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে তিনি আদৌ খাড়া করতে পারেননি। একদিকে, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা এবং অবকাঠামো ভেঙে পড়েছিলো; অন্যদিকে, শিল্প-বাণিজ্য এবং প্রশাসন চালানোর মতো অভিজ্ঞ লোকের অভাবও ছিলো। তার ওপর দুর্নীতি ও দলবাজি মুক্তিযুদ্ধ এবং তার ত্যাগস্বীকারের স্পিরিটকে পুরোপুরি ধ্বংস করেছিলো। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং ভারতের দাদাগিরির মনোভাবও তাঁর সহায়তা করেনি। হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের বহু শতাব্দীর অবিশ্বাসও এ সময়ে হাঁ করে বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসাকে গিলে ফেলেছিলো। সর্বোপরি, মোশাহেব-পরিবেষ্টিত মুজিব মুক্তচিন্তা এবং জনগণ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। ফলে সপরিবারে চরম মূল্য দিতে হয় তাঁকে। কিন্তু তার থেকে বেশি মূল্য দিতে হয় বাঙালিদের। বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশের যে-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো, তা একেবারে ধূলিসাৎ হয়। ক্ষমতালোভী ফৌজী-শাসকদের হাতে পড়ে এবং পেট্রো-ডলারের কল্যাণে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশই রুদ্ধ হয়নি, সেই সঙ্গে 'বাঙালি' পরিচয়ও ধুয়ে-মুছে যায়।

এ অবস্থায় বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যে-বাঙালি সংস্কৃতি রচিত হবে, তাতে একই সঙ্গে প্রাধান্য পাবে মুসলমানী এবং পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক উপাদান। স্বাধীন দেশ হিশেবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণায় সেই সংস্কৃতিই হবে অনেক জোরালো এবং ভবিষ্যতের মূলধারার বাঙালি সংস্কৃতি। বাংলা ভাষাও এ প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে বলে আমি মনে করি না। অপর পক্ষে, ভারতের একটি রাজ্যের সংস্কৃতি হিশেবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সংস্কৃতি দুর্বল থেকে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তাতে প্রাধান্য পাবে হিন্দু উপাদান। তখন ইংল্যান্ডের ইংরেজি এবং মার্কিন ইংরেজির মতো বাংলা ভাষার দুটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি হলে অবাক হওয়ার কারণ থাকবে না।

তার অর্থ শেখ মুজিব নিজে রবীন্দ্রভক্ত হলেও ঠিক এক শো বছর আগে বঙ্গভঙ্গের সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে-আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, মুজিব নিজের অজ্ঞাতে তাকেই বাস্তবায়িত করলেন। রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা ছিলো যে, বঙ্গদেশকে মুসলমানপ্রধান পূর্ববঙ্গ এবং হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে বিভক্ত করলে কালে-কালে অখণ্ড বাঙালি সংস্কৃতি, এমন কি, বাঙালি পরিচয়ও বিনষ্ট হবে। সেই বাঙালি সংস্কৃতি এবং পরিচয়কে আপাতদৃষ্টিতে রীতিমতো রাষ্ট্রীয় ভিত্তি দান করেন শেখ মুজিব। মনে হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নকেই বাস্তবায়িত করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন শেখ মুজিব। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, স্বাধীন বাংলাদেশ এবং ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবাংলাকে কেন্দ্র করে কালে-কালে অখণ্ড বাঙালিত্ব চিরকালের জন্যে খণ্ডিত হবে মনে হয়। সেদিক দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে শেখ মুজিব কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নন, এমন কি, এক অর্থে, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে?

রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সংস্কৃতিকে প্রসারিত এবং সমৃদ্ধ করেছিলেন— তাকে উৎকর্ষ দিয়েছিলেন। অপর পক্ষে, শেখ মুজিব যা করেন তার ফলে বাঙালি সংস্কৃতি খণ্ডিত হয় এবং তাঁর অভীষ্ট পথে না-গিয়ে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। তিনিও রবীন্দ্রনাথের মতো বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশের স্থায়ী ব্যবস্থা করেন, যদিও কার্যকারণে তা এক ভিন্ন বাঙালি সংস্কৃতি। অদৃষ্টের পরিহাস এ সংস্কৃতি স্বাধীন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যেদিকে যাচ্ছে এবং যাবে— তিনি তা কামনা করেননি। কিন্তু তবু তা অবশ্যম্ভাবী। বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে শেখ মুজিব রবীন্দ্রনাথের মতো "শ্রেষ্ঠ" না-হলেও, কম গুরুত্বপূর্ণ নন।

(*দৈনিক স্টেটসম্যান*, ২০০৫)

২২
নজরুলের ধর্মমত ও অসাম্প্রদায়িকতা

নজরুল ইসলামকে কেউ খুবই ভালোবেসেছেন, কেউ বা অসম্ভব ঘৃণা করেছেন। কিন্তু কেউই তাঁকে অবহেলা করতে পারেননি। তিনি যখন জনপ্রিয়তার একেবারে তুঙ্গে, তখনো কেবল প্রশংসার জোয়ারে ভাসেননি, বরং তীব্র নিন্দা আকর্ষণ করেছেন অনেকের তরফ থেকে। যেমন, মৌলবীরা (নজরুলের ভাষায় মৌ-লোভীরা) ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, তিনি কাজী হলেও কাফের। আর হিন্দুরা তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'পাত-নেড়ে'। তাঁর ভাষায়, পুরুষরা তাঁকে নারীঘেষা বলে গাল দিয়েছেন, মেয়েরা তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন নারীবিদ্বেষী বলে। চরকার গান লিখেছেন বলে তাঁর নিন্দা করেছেন বিপ্লবীরা, আর কংগ্রেসীরা তাঁকে অবিশ্বাস করেছেন বিপ্লবী ঠাহর করে। তা হলে নজরুল আসলে কী ? আপাতদৃষ্টিতে তাঁর পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিত্বের পেছনে আছে তার প্রবল পছন্দ-অপছন্দ। তিনি যা বলেছেন, চীৎকার করে বলেছেন। তিনি যে-পথে চলেছেন, তার মাঝখান দিয়ে চলেছেন। আপোশ করে চলা, পাশ কাটিয়ে চলা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়।

আরও একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, তীব্রতাই তাঁর বিশ্বাসের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, তাঁর বিশ্বাস অটল, ধ্রুবতারার মতো। কখনো তিনি এলিয়ে পড়েননি, কারণ একটা শক্ত ভিত্তি ছিলো তাঁর বিশ্বাসের। সেই ভিত্তিটা মানবতার। সব মত, সব পথের উর্ধ্বে মানুষকে নিতান্ত মানুষ হিশেবে দেখার ক্ষমতা ছিলো তাঁর। সে শক্তি তিনি সম্ভবত অর্জন করেননি, সেটা ছিলো তাঁর স্বভাবেরই অংশ। তাঁর যে-মানবপ্রীতির জন্যে তিনি মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা লাভ করেছিলেন, সেই মানবপ্রীতিই তাঁকে আবার অনেকের কাছে, অনেক গোষ্ঠীর কাছে অপ্রিয় করে তুলেছিলো। তিনি মানুষে মানুষে সাম্যের কথা বলেছেন, কিন্তু কমিউনিস্ট হতে পারেননি। এমন কি, তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুললেও, তিনি তাতে যোগ দিতে পারেননি। কারণ, তাঁর মানবপ্রীতিকে কতোগুলো বিধান অথবা একটা কট্টর আদর্শের ছকে ফেলতে পারেননি তিনি। 'এক সমাজকে মানলে, করবে / আরেক সমাজ নির্বাসন।' কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, কোনো রাজনৈতিক দল, কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি একাত্ম হতে পারেননি। তাঁর মানবতার সংজ্ঞার সঙ্গে কারো ষোলো আনা মিল হয়নি।

নজরুল হয়তো ঠিকই বলেছেন— তিনি বর্তমানের কবি, ভবিষ্যতের নবী নন। হয়তো তাঁর সাহিত্য চিরকালীন সাহিত্য নয়। কিন্তু তিনি যে-মানবতার কথা বলেছিলেন, তা চিরকালের। তাঁর আগে অথবা পরে কোনো বাঙালি সাহিত্যিক, কোনো দার্শনিক, কোনো ধর্মীয় নেতা, এমন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানবতার জয় গান

করতে পারেননি— 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।' সত্য বটে, তাঁর অন্তত দু শতাব্দী আগে চণ্ডীদাস বলেছিলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' কিন্তু চণ্ডীদাসের মানুষ এবং নজরুলের মানুষ এক নন। চণ্ডীদাস মনের মানুষের কথা বলেছিলেন। নজরুল বলেছিলেন রক্তমাংসের মানুষের কথা।

মানুষের প্রতি এই অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্যেই নজরুল বলতে পেরেছিলেন যে, জগতের সব পবিত্র গ্রন্থ এবং ভজনালয়ের চেয়ে একটি মানুষের ক্ষুদ্র দেহ অনেক বেশি পবিত্র। মানুষকে ঘৃণা করে যাঁরা ধর্মগ্রন্থ পড়েন, তিনি তাঁদের কাছ থেকে ধর্মগ্রন্থ কেড়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মন্দির-মসজিদ ভেঙে ফেলার জন্যে কালাপাহাড় এবং গজনি মামুদকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে তাঁর এই যে-মানবপ্রীতি, তা-ই তাঁকে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খাঁটি বাঙালিতে পরিণত করেছিলো।

অথচ নজরুল রীতিমতো মুসলমান হতে পারতেন। তিনি যে-অশিক্ষিত পরিবারে জন্মেছিলেন, সে পরিবারে আনুষ্ঠানিক ইসলাম ধর্মই পালিত হতো। আর, ছেলেবেলা সেই ধর্মের শাস্ত্র পড়েই মাত্র দশ বছর বয়সে মসজিদে নামাজ পড়ানোর চাকরি পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি যেসব ইসলামী গান লিখেছিলেন, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কোরান-হাদিস তিনি ভালোই জানতেন। কিন্তু ছেলেবেলার এই শিক্ষা সত্ত্বেও তিনি মোল্লাহ হলেন না, বরং কয়েক বছরের মধ্যে 'কাফের কাজী' উপাধি লাভ করেন। পরিণত নজরুল যে কেবল ইসলাম ধর্মের কতোগুলো বিধানের বিরোধিতা করলেন, তাই নয়; আনুষ্ঠানিক ধর্মেরই তিনি বিরোধিতা করলেন। খোদার আসন আরশ ছেদ করে উঠলেন, ভগবানের বুকে পদচিহ্ন এঁকে দিলেন। কি করে এটা সম্ভব হয়েছিলো, বলা শক্ত। ছাত্রজীবনে এবং সেনাবাহিনীতে থাকার সময়ে তিনি অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের ঘনিষ্ঠতায় এসেছিলেন— এই একটি তথ্য দিয়েই এর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

আপসোস করেছেন, 'মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া।' তাঁর আগেকার আট শো বছরের বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত লালন ফকিরই জাতের এই মানবতা-বিরোধী চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন। এবং তিনিও তা দেখতে পেয়েছিলেন ভূমিজ সন্তান ছিলেন বলে। কিন্তু নজরুল 'জাতের নামে বজ্জাতি'র কথা লেখার পর যে-আশি বছর চলে গেছে, তার মধ্যে অন্য কেউ-আর এমন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জাতের বিভেদমূলক স্বরূপ তুলে ধরেননি।

নজরুল রাজনীতিক ছিলেন না। কিন্তু সমকালের রাজনীতি দিয়ে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর চারদিকে যেসব ঘটনা ঘটছিলো, সে সম্পর্কে তিনি সাহিত্যিক নির্লিপ্ততা অথবা নীরবতা পালন করতে পারেননি। সে জন্যেই চিত্তরঞ্জন দাশ হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের যে-প্রয়াস দেখিয়েছিলেন, তাকে তিনি যেমন উদাত্ত কণ্ঠে স্বাগত জানিয়েছিলেন, অন্য কেউ তা জানাননি। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তিনি একটি কবিতায় লিখেছিলেন যে, মুহাম্মদের আগে তাঁর জন্ম হলে কোরানেও তাঁর নাম থাকতো। এমন সাহসের কথা বোধ হয় পরাধীন ভারতবর্ষেই লেখা সম্ভব ছিলো। এখন ধর্মীয় উন্মত্ততার যুগে স্বাধীন ভারত অথবা স্বাধীন বাংলাদেশ— কোথাও এ কথা বলার জো নেই।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য অথবা অনৈক্য নজরুলের মনে যে কী প্রবল ভাবাবেগ এবং প্যাশনের জন্ম দিতো, তা আভাস পাওয়া যায় চিত্তরঞ্জন মারা যাওয়ার পরের বছর। ১৯২৬ সালের এপ্রিলে কলকাতায়, বলতে গেলে, সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়া হয়। মসজিদের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে সবাই বাজনা বাজানো বন্ধ করেছিলো, একটি লোক ছাড়া। তার জবাবে মসজিদের ভেতর থেকে একদল লোক বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয়। কিন্তু তারা লাঠিসোটা এবং ধারালো অস্ত্র কি করে পেলো কোনো পরিকল্পনা ছাড়া, বলা মুশকিল। সে যাই হোক, এই দাঙ্গাই ছিলো বঙ্গদেশের প্রথম সবচেয়ে ভয়াবহ দাঙ্গা। এতে বন্দুকও ব্যবহৃত হয়েছিলো। এর অল্প দিন পরেই কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। নজরুল এই দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে গান লেখেন— 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'। এ গানে তিনি রাজনীতিকদের মনে করিয়ে দেন তাঁদের দায়িত্বের কথা— অসহায় জাতি ডুবে মরছে। এ সময়ে ওরা হিন্দু, না মুসলিম এ প্রশ্ন তোলা অসঙ্গত, কারণ ওদের একমাত্র পরিচয় ওরা দেশমাতার সন্তান। কংগ্রেসের সম্মেলনে নজরুল আর দিলীপকুমার রায় এ গান উদাত্ত গলায় গেয়ে শোনান। কিন্তু রাজনীতিকরা তাঁদের আবেদনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট বাতিল করেন।

কেবল রাজনীতিক নন, অন্যরাও দাঙ্গার সময়ে নিজেদের গা বাঁচিয়ে চলেছিলেন। কলকাতায় তখন ছোটোবড়ো সংস্কৃতিকর্মী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী— হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের— কম ছিলেন না। এমন কি, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের মতো সাহিত্যিকও ছিলেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, এই

দাঙ্গার সময়ে ঠাকুরবাড়ির ভিস্তি আবদুলের দু কান কেটে দিয়েছিলো দাঙ্গাকারীরা। রক্ত ঝরতে থাকা কান নিয়েই আবদুল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছিলো। আর-একদিন জনাচল্লিশ মুসলমান দাঙ্গাবাজদের তাড়া খেয়ে দেওয়াল টপকে ঐ বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলো। সুতরাং ঐ বাড়ির কারো দাঙ্গার কথা অজানা ছিলো না। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথেরও নয়। কিন্তু সমাজের বিশিষ্ট হিন্দু-মুসলমান কেউই নজরুলের মতো জোর গলায় কাণ্ডারী হুঁশিয়ার গাওয়া দূরে থাক, গুনগুন করেও হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সুর ভাঁজেননি। রবীন্দ্রনাথ, ধরা যাক, খবরের কাগজে একটা বিবৃতি অন্তত দিতে পারতেন। বঙ্গভঙ্গের সময়ে তিনিই তো রাখী পরিয়েছিলেন মুসলমানের হাতে!

একমাত্র কাণ্ডারী হুঁশিয়ার গান নয়, ১৯২৬ সালের দাঙ্গা দেখে নজরুল এতো ব্যাকুল হয়েছিলেন যে, তিনি 'মন্দির ও মসজিদ' এবং 'হিন্দু-মুসলমান' নামে দুটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। মন্দির ও মসজিদ প্রবন্ধে আবেগে আপ্লুত হয়ে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অনুসারীদের ধিক্কার দিয়েছেন। ধর্ম যে মানুষের তৈরি এবং অর্থহীন, তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। 'হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল।' কিন্তু হতাশা দিয়েই তাঁর বক্তব্য তিনি শেষ করেননি। আশা করেছেন 'সেই রুদ্র আসিতেছেন, যিনি ধর্ম-মাতালদের আড্ডা ঐ মন্দির-মসজিদ-গীর্জা ভাঙিয়া সকল মানুষকে এক আকাশের গম্বুজতলে লইয়া আসিবেন।' 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে লিখেছেন, এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের প্রধান কারণ মোল্লা-পুরুতের দেওয়া শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা। 'হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিতত্ব! তেমনি দাড়িও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব!'

দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে ঐ একবারই নয়, নজরুল বারবার হিন্দু-মুসলমানের মিলন এবং ভ্রাতৃত্বের কথা বলেছেন। মনে করিয়ে দিয়েছেন 'মোরা একটি বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।' কখনো বলেছেন, হিন্দু-মুসলমান দেশমাতার দুই আঁখি-তারার মতো। ভুল বোঝাবুঝি থেকে তাঁদের মনোমালিন্য হতে পারে, মারামারিও অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁরা একই মায়ের দু সন্তান। তাঁরা একই ভাষায় মাকে ডাকেন। বস্তুত, সংক্ষেপে বলা যায়, তিনি যেভাবে বারংবার হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টা করেছেন, বাংলা সাহিত্যে অন্য কেউ তা করেননি। অন্তরের অনুভূতি দিয়ে তো নয়ই, এমন কি, সামাজিক দায়িত্ব হিশেবেও নয়।

আরও একটি জিনিশ বিশেষ করে লক্ষ্য করার মতো— তিনিই প্রথম হিন্দু এবং মুসলিম ঐতিহ্যের অসামান্য মিলন ঘটিয়েছিলেন। কবিতার একই চরণে তিনি দেবতা এবং ফেরেশতা, অবতার এবং পয়গম্বরের কথা বলতে পারতেন। তিনিই বাংলা সাহিত্যের একমাত্র কবি, যিনি একই সঙ্গে হিন্দু এবং মুসলমানী ধর্মীয় সঙ্গীত রচনা

করেছেন। কেবল তাই নয়, একই সঙ্গে রচনা করেছেন কীর্তন এবং শ্যামাসঙ্গীত। তাঁর শ্যামাসঙ্গীতে তিনি আবার শ্যামামায়ের সঙ্গে মিলন ঘটাতে পেরেছেন শ্যামের। তাঁর ভক্তির দৃষ্টিতে সব ধর্ম, সব বর্ণ একাকার হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেন, নজরুলের সাহিত্যে বৈদগ্ধ্যের অভাব ছিলো। তাঁর নিজের ভাষায় 'সেই চিরকেলে বাণী' ছিলো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর আগে অথবা পরে কেউই সব্যসাচীর মতো হিন্দু-মুসলিম ঐহিত্যের এমন সমন্বয় ঘটাতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথও নন। সাহিত্যের মান বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের কোনো তুলনা চলে না, কিন্তু ঐতিহ্য সমন্বয়ের প্রশ্ন উঠলে স্বীকার করতেই হবে যে, নজরুল যেমন করে হিন্দু-মুসলিম ঐহিত্যের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা আদৌ করতে পারেননি। করার চেষ্টাও করেননি। বস্তুত, বাড়ির কাছের পড়শিদের প্রাঙ্গণের ধারে গেলেও তিনি তাঁদের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেননি। অপর পক্ষে, নজরুল তা কেবল করেননি, সার্থকভাবে করেছিলেন। তিনি যেভাবে তৎসম-তদ্ভব শব্দের সঙ্গে আরবি-ফারসি শব্দের মিলন ঘটিয়েছিলেন, তাও একমাত্র তারই রচনায় দেখা যায়। এবং তিনি এটা করেছিলেন, আধুনিক বাংলা ভাষার জন্মদাতা এবং পালক রবীন্দ্রনাথ যখন 'খুন' শব্দের ব্যবহারে বিরক্ত হয়েছেন, সেই প্রতিকূল সময়ে।

হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রয়াসে তিনি যে-ভূমিকা রেখেছিলেন, নজরুল নিজেই তার মূল্যায়ন করেছেন: 'আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।' কিন্তু আজও হিন্দু-মুসলমান এক হতে পারেননি। স্বাধীনতা লাভের পরে শিক্ষা এবং অর্থনীতির উন্নতির ফলে তাঁদের পারপরিক রক্তপাত এবং হানাহানি বন্ধ হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তা হয়নি। বরং পশ্চিমবঙ্গে গৈরিক পতাকা এখন পতপত করে উড়তে শুরু করেছে। আর বাংলাদেশে হিন্দু খেদানোর সহিংস প্রক্রিয়া আরও জোরদার হয়েছে। বাংলাদেশে ইদানীং দাঙা হলে, হিন্দু খুন করে পুণ্য অর্জনের চেষ্টা না-করে ধর্মান্ধরা হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ করে আর বাড়িতে আগুন লাগায়। তাদের লক্ষ্য: ভয়ভীতি দেখিয়ে হিন্দুদের তাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা। এমন কি, তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পরেও হিন্দুদের ওপর নেমে আসে অত্যাচারের খড়্গ কৃপাণ। তাঁদের অপরাধ: সম্ভবত তাঁরা অসাম্প্রদায়িক প্রার্থীদের ভোট দিয়েছেন। মোট কথা, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলেও, হিন্দু-মুসলমানের প্রেম কিছু বৃদ্ধি পায়নি। নজরুলের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। আশি বছর আগে চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, 'হিন্দু-মুসলমানের পরানে তুমিই বাঁধিলে সেতু!' এ কথা সমান সত্য তাঁর সম্পর্কেও। কিন্তু মর্মান্তিক সত্য হলো: চিত্তরঞ্জন এবং নজরুল প্রেমের আহ্বান জানালেও, দুজনার ললিত বাণীই হাওয়ায় ভেসে গেছে।

নজরুলের অসাম্প্রদায়িকতা আমরা যে কেবল সাহিত্যের মধ্যেই লক্ষ্য করি, তাই নয়। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্মের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন।

তাঁর বন্ধুত্ব কোনো ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না। এমন কি, বিয়েও তিনি করেছিলেন নিজের ধর্মের সীমানা অতিক্রম করে। এসব ক্ষেত্রে মুসলমানরা স্ত্রীকে ধর্মান্তরিত করেন। অপর পক্ষে, নজরুলের সেই সৎসাহস ছিলো যে, প্রমীলার ধর্মবিশ্বাসের ওপর প্রভাব না-খাটিয়েই তাঁকে বিয়ে করতে পেরেছিলেন। যে-পরিবারে তিনি বিয়ে করেছিলেন, সেই পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ভালোবাসতেন, কিন্তু তাঁদের বাড়ির কন্যাকে মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্যে তৈরি ছিলেন না। এই পরিবারের বিরজাসুন্দরী দেবীকে নজরুল নিজের মায়ের শূন্য আসনে বসিয়েছিলেন, কিন্তু তিনিও এ বিয়ে মেনে নিতে পারেননি। হিন্দু সমাজের অনেক রক্ষণশীল সদস্যরাও নয়। কারণ, একে তাঁরা বিবেচনা করেছিলেন তাঁদের জাত মারার একটি চোখ-ধাঁধানো দৃষ্টান্ত হিশেবে।

সন্তানদের নামকরণ এবং শিক্ষায়ও এই অসাম্প্রদায়িকতার প্রমাণ দিয়েছিলেন নজরুল। তাঁর প্রথম সন্তানের নাম তিনি দিয়েছিলেন কৃষ্ণ মহাম্মদ। মুসলমানদের মধ্যে এখন বাংলায় নাম রাখেন অনেকেই। কিন্তু কৃষ্ণ এবং মহাম্মদের মিলন ঘটিয়ে নয়। দ্বিতীয় পুত্রের নাম দিয়েছিলেন অরিন্দম খালেদ। তৃতীয় এবং চতুর্থ পুত্রের নাম দিয়েছিলেন যথাক্রমে সব্যসাচী আর অনিরুদ্ধ। অরিন্দম, সব্যসাচী এবং অনিরুদ্ধ— তিনটি নামেরই ধর্মনিরপেক্ষ অর্থ থাকলেও, তাদের ধর্মীয় অনুষঙ্গই প্রধান। মুসলমানরা এতে তাঁর প্রতি প্রসন্ন হতে পারেননি। কিন্তু নজরুল সে সমালোচনা অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন। কারণ, আনুষ্ঠানিক ধর্মের চেয়েও মানবিক এবং ভাষিক পরিচয় তাঁর কাছে বড়ো ছিলো। সন্তানদের তিনি কোনো ধর্মীয় শিক্ষাও দেননি। নিজেও ব্যক্তিগত জীবনে কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন না। দ্বিতীয় পুত্র মারা যাওয়ার পর তিনি যখন শোকে প্রায় উন্মাদ হয়ে যান, তখন অবশ্য বরদাচরণ মজুমদারের প্রভাবে পড়ে তিনি কালী পূজো করতে আরম্ভ করেছিলেন বলে কেউ কেউ লিখেছেন।

অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, যে-নজরুল ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার গান গেয়েছেন, মুসলমানরা, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা সেই নজরুলের নাম ব্যবহার করেই মুসলিম জাতীয়তাবাদের নিশান উড়িয়েছেন। তাঁরা নজরুলের নাম ভাঙিয়েছেন নিজেদের সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে। রবীন্দ্রনাথ থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে রাখার জন্যে পাকিস্তানীরা নজরুলকে খাড়া করেন মুসলমান-রবীন্দ্রনাথ হিশেবে। তাঁর কবিতার ভাষা সংস্কার করে তাঁরা নজরুলের 'ভগবান'কে 'রহমানে' পরিণত করেন। 'মহাশ্মশান'কে বদলে করেন 'গোরস্থান'। সামগ্রিক নজরুলকে নয়, তাঁরা খাড়া করলেন এক খণ্ডিত নজরুলকে। নজরুলের ইসলামী গান বাজানো হলো বেতারে, টিভিতে। নজরুল যে শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন এবং অন্যান্য ভক্তিবাদী গানও লিখেছিলেন, তার কথা কেউ জানলোও না। পাঠ্যবইতে তিনি যে-প্রাধান্য পেলেন তা তাঁর অবদানকে ছাড়িয়ে গেলো। এমন কি,

অনেক সময়ে রবীন্দ্রনাথ ম্লান হয়ে গেলেন নজরুলের ছায়ায়। যে-কালে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করাকে সরকার ভালো চোখে দেখতো না, সেই কালে নজরুল-জয়ন্তী পালনে সরকারের উদার পৃষ্ঠপোষণা মিললো।

এমন কি, যে-নজরুলকে ১৯২০-এর দশকে মুসলমানরা নমরুদ, ফেরাউন, শয়তানের অবতার এবং কাফের বলে গাল দিয়েছিলেন, সেই নজরুল পঞ্চাশের দশকে সংস্কার-সাপেক্ষে মুসলমান হয়ে উঠলেন, আর শতাব্দীর শেষে এসে নব্য-সাম্প্রদায়িকতায়-উন্মত্ত লোকেদের কাছে তিনি পাক্কা মুসলমানে পরিণত হলেন। নজরুল একদিনে মরেননি। তিনি নির্বাক হয়ে বেঁচেছিলেন পঁয়তিরিশ বছর। তারপর কেটে গেছে আরও তিরিশ বছর। এই প্রায় পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে তিনি কয়েকবার মারা যান। তাঁর গানের চরম অনাদর থেকে মনে হয়, তিনি প্রথম বার মারা যান পশ্চিমবাংলায়, দেশবিভাগের ঠিক পরে। মনে হয়, তার পেছনেও ছিলো সাম্প্রদায়িকতা। দ্বিতীয় বার তিনি মারা যান পূর্ব পাকিস্তানে, তাঁকে খণ্ড খণ্ড করে হাজির করায়। তৃতীয়বার মারা যান বাংলাদেশে, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করায়। চতুর্থবারও মারা যান বাংলাদেশে— মৌলবাদীদের হাতে। এবারে কেবল ব্যক্তি নজরুল নন, তাঁর আদর্শও ভূত অর্থাৎ অতীত হয়ে যায়। নজরুল মরেও মুসলিম জাতীয়তাবাদের হাত থেকে রেহাই পাননি। পরিজনের মতামত ছাড়াই তাঁকে যে ঢাকায় সমাধিস্থ করা হয়, সেও ইসলামের প্রতীক হিশেবে তাঁর নাম ব্যবহার করার জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্য থেকেই।

অথচ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাবে উভয় বাংলাতেই বাঙালিত্ব যখন বিপন্ন, এমন কি, বিপন্ন যখন মনুষ্যত্ব, তখন নজরুলের বেঁচে থাকাটাই খুবই দরকার ছিলো। বস্তুত, একজন নজরুল নয়, খুবই দরকার ছিলো ঘরে ঘরে নজরুলের।

(**মেলাসেন, তিনি মেলাসেন ?** নামে প্রকাশিত *দৈনিক স্টেটসম্যান*, নজরুল জয়ন্তী, ২০০৫)

২৪

শামসুর রাহমান: মুকুটহীন জাতীয় কবি

কোনো খেতাবে তিনি বিশ্বাস করতেন না। সরকারী খেতাব তাঁর ভাগ্যে জোটেওনি। যাঁরা বিবেকের কথা বলেন, স্রোতের বিরুদ্ধে চলেন, হুক্কাহুয়ায় শরিক হন না, তাঁদের জন্যে কোনো খেতাব জোটাও শক্ত। তাই মুকুট তিনি পাননি, মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় সম্মানও নয়। কিন্তু তিনি ছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি, নিঃসন্দেহে। জাতীয় কবি— নানা কারণেই। রবীন্দ্র-পরবর্তী তিরিশের দশকের কয়েকজন কবি মিলে নতুন যুগ সৃষ্টি করেছিলেন। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু— প্রত্যেকেই ছিলেন নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁরা স্থায়ী আসন পাবেন বলে মনে হয়। তবে তার পরের অর্ধ-শতাব্দী ধরে যাঁরা বাংলা কাব্যের আসরে আবির্ভূত হন, তাঁরা আগের কবিদের তুলনায় কম সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁরা কেউ যুগ সৃষ্টি করতে পারেননি। পাঠকরা তাঁদের কতোদিন মনে রাখবেন, বলা শক্ত। তা ছাড়া, তাঁদের অনেকে আঞ্চলিক কবি হিশেবে পরিচিত, অখণ্ড বাংলা সাহিত্যের কবি নন। তাঁরা কেউ পশ্চিবঙ্গের কবি, কেউ পূর্ব বাংলার অর্থাৎ বাংলাদেশের কবি। এই আঞ্চলিক সীমানা অতিক্রম করে বাংলা ভাষার একজন প্রধান কবি হয়েছিলেন শামসুর রাহমান। আর বাংলাদেশের কথা উঠলে এক বাক্যে বলতে হয় যে, মোটামুটি দেশ-বিভাগের পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অর্ধ-শতাব্দীর বেশি সময় ধরে তিনি আমাদের সাহিত্যের মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করেছিলেন।

কেবল এই ব্যাপ্তি অথবা কবিতার প্রাচুর্যের জন্যে নয়, তাঁর কৃতিত্বকে আরও বড়ো করে দেখতে হয় এ জন্যে যে, তাঁর কবিতা সত্যি সত্যি হৃদয়কে নাড়া দেয়। কবি তাঁর আবেগকে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে পারেন জাদুকরের মতো তাঁর নিজস্ব ভাষা, ছন্দ এবং ভঙ্গি দিয়ে। এবং সেটাই তো একজন মহৎ কবির কাজ! তিনি যথার্থই সহৃদয়হৃদয়সংবাদী। তাঁর ভাষা এবং ভঙ্গি এমন বিশিষ্ট রঙে রাঙানো যে, অমনোযোগী পাঠকও চিনতে পারবেন যে, তাঁর কবিতা তাঁরই কবিতা।

আর, সাহিত্যের ইতিহাসের কথা বিবেচনা করলে, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার সাহিত্যের কথা বিবেচনা করলে তাঁকে কৃতিত্ব দিতে হয় একটা নতুন ধারার প্রবর্তক হিশেবে। সত্যি বলতে কি, তিনি কেবল সেই নতুন ধারার প্রবর্তক নন, তার সবচেয়ে বড়ো এক্সপোনেন্টও। পূর্ব বাংলার সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব এমন একটা সময়ে যখন মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রধানত দুটি ধারা প্রচলিত ছিলো। এক. ইসলামী পুনর্জাগরণের ধারা— যার সূচনা নজরুল ইসলাম থেকে এবং যা বিস্তার লাভ করে ফররুখ আহমদ, বেনজির আহমদ, তালিম হোসেন, মোফাখখারুল ইসলাম প্রমুখের

মধ্য দিয়ে। আর দ্বিতীয় যে-ধারাটি বহমান ছিলো, সেটি হলো পল্লীসাহিত্যের ধারা। এই ধারার প্রবর্তক ছিলেন জসীমউদ্দীন। এবং বন্দে আলি মিঞাদের মতো অনেকেই এ ধারা কমবেশি অনুকরণ করেছিলেন।

সার্বজনিক সাহিত্য হিশেবে সীমাবদ্ধতা যা-ই থাকুক না কেন, এই দুই ধারার কোনোটাকেই কৃত্রিম বলা যায় না। কারণ, পূর্ব বাংলার পিছিয়ে-থাকা মুসলমান সমাজে ইসলামী জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রবল থাকাই তো স্বাভাবিক! আবার কবিদের সবারই শেকড় যেহেতু প্রোথিত ছিলো গ্রামের মাটিতে, সে জন্যে তাঁদের পক্ষে পল্লীর উপাদান নিয়ে সাহিত্য রচনাও ছিলো স্বাভাবিক।

হয়তো আরও অনেক কাল চলতো এই দুই ধারার অনুবর্তন। কিন্তু শামসুর রাহমান সেই পরিবেশে এই দুই ধারার ঠিক বিপরীত দিকে গেলেন। তিনি ইসলামী ভাবধারা দিয়ে উদ্বুদ্ধ হননি। জসীমউদ্দীনের "পল্লীসাহিত্য" দিয়েও নয়। ছাত্রজীবনেই তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়ে। জীবনানন্দের ভাষা এবং বৈশিষ্ট্য তিনি দ্রুত কাটিয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তাঁর সেক্যুলার মানবিক আবেদনের কবিতা তাঁর অন্তরকে নাড়া দিয়েছিলো। তিনি তাই ধর্মীয় জাগরণমূলক মুসলমানী কবিতা লিখলেন না। তাঁর কাছে হিন্দু অথবা মুসলমানের থেকে মানুষ অনেক বড়ো। তিনি মানুষের কবিতা লিখলেন। আবার, মানুষের কবিতা লিখতে গিয়েও তিনি কুলি-মজুরদের উদ্ধার করার কবিতা লিখলেন না। ধর্ম এবং জাগরণমূলক কবিতার বদলে ব্যক্তিগত অনুভূতির, প্রেমের, প্রকৃতির, দেশের, সৌন্দর্যের কবিতা লিখেছেন তিনি। ধর্মীয় ধারার বদলে তিনি প্রবর্তন করেন একটি সেক্যুলার রোম্যান্টিক ধারা। সে অর্থে তিনিই পূর্ব বাংলার প্রথম বিশুদ্ধ কবি।

দ্বিতীয়ত, পল্লীসাহিত্যের ধারাও তিনি অনুকরণ করলেন না। তাঁর জন্ম নগরে সেটাই তার একমাত্র কারণ নয়। মন-মানসিকতার দিক দিয়েও তিনি ছিলেন নাগরিক। পল্লীবাংলার উপাদান, পল্লীর অনুষঙ্গ এবং গ্রামের ভাষা তাঁকে বিশেষ অনুপ্রাণিত করতে পারেনি। তবে তিনি নাগরিক বিষয়বস্তু নিয়ে কাব্য রচনা করেন— কেবল এই অর্থেই তিনি নাগরিক কবি নয়। তিনি বিদগ্ধ কবি— এই অর্থেও নাগরিক। তাঁর মধ্যে কোনো গ্রাম্যতা ছিলো না।

সব কবিই রোম্যান্টিক। কিন্তু শামসুর রাহমান এমন আপাদমস্তক রোম্যান্টিক ছিলেন যে, সেটা আলাদা করে উল্লেখ না-করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়। রোম্যান্টিক বললে অনেকেই প্রেমের কথা ভাবেন। কিন্তু তিনি তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন, তাঁর প্রেম, তাঁর আশা-নিরাশা সবই দেখেছেন রঙিন রোম্যান্টিক আলোতে, কঠোর বাস্তবতার খররৌদ্রে নয়। মানুষ দুঃখ নয়, আনন্দের ভিখিরি। কিন্তু তিনি দুঃখ নিয়েও এমন রোম্যান্টিক হয়েছেন যে, তাকে দুঃখবিলাস বললে বাড়িয়ে বলা হয় না।

তাঁর "হৃদয়ে-লতিয়ে-ওঠা একটি নিভৃততম গানে / সুখে নিদ্রায় কিবা জাগরণে, স্বপ্নের বাগানে, / অধরের অধীর চুম্বনে সান্নিধ্যের মধ্যদিনে / .. দুর্বিনীত ইচ্ছার ডানায় / আসক্তির কানায় কানায়"— সর্বত্রই দুঃখ তার নাম লেখে।

সত্যি বলতে কি, জীবন এবং মৃত্যু উভয়ের কথা বলতে গিয়েই তিনি তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। জীবনকে তিনি দারুণ ভালোবাসতেন। জীবন তাঁর কাছে ঝাঁ ঝাঁ রোদে লাঙল চালানো, মেঘনার ঢেউয়ে দাঁড় বাওয়া, শীতার্ত রাতে আগুন পোহানো নিরিবিলি, কারখানার কালি মুছে বাড়ি ফেরা একা শিস দিয়ে, বইয়ের পাতায় মগ্ন হওয়া, সহপাঠিনীর চুলে অন্তরঙ্গ আলো তরঙ্গের খেলা দেখা, মিছিলে এগিয়ে চলা, নিশান ওড়ানো।

মনে আছে, তাঁর ষাট বছর পূর্তি হওয়ার পর আমি বিবিসির জন্যে তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি নিজেকে বৃদ্ধ বলে কল্পনা করেন না। তিনি মনের চোখে দেখতে পান যে, তিনি হাফ-প্যান্ট পরে স্কুলে যাচ্ছেন। চোখের সামনে অনেক লাল-নীল-সবুজ দেখতে পান তিনি। বয়স যে বাড়ছে, এটা তিনি প্রায় অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছেন। "বয়সের ওষ্ঠে ঠোঁট রেখে দেখি দূরে / বয়স দাঁড়িয়ে থাকে বালকের মতো আলোজ্বালা গলির ভেতরে।" কবি আর ব্যক্তি হুবহু এক হয় না। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি এই রোম্যান্টিক প্রেমাকুল মনোভাব বহাল রেখেছিলেন। ভালোবাসায় তিনি উদার ছিলেন। ভালোবাসতেই তিনি ভালোবাসতেন। অনেক জায়গায় তাঁর ভালোবাসা রীতিমতো দেহঘন। "তোমার শরীর কোথাও নিরালা পথ, মসৃণ অথবা তরঙ্গিত, / কোথাও বা সুরভিত ঝোপ, আমার ওষ্ঠ-পথিক / ক্রমাগত আঁকে পদচিহ্ন সবখানে। ... তোমার সপ্রাণ চুললগ্ন বেলফুল / কী কৌশলে আমার বয়স নিয়েছিল চুরি করে।" "অবৈধ সঙ্গম করে ঘামে নেয়ে উঠতে পারি সহজ অভ্যাসে।" এসব কবিতা তিনি লিখেছিলেন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে। তাঁর কবিতায় ভালোবাসাবাসির ছড়াছড়ি নিজেই তা স্বীকার করেছেন। "আমার কবিতা পথপ্রান্তে দুঃখীর চোখের মতো / চোখ মেলে চেয়ে থাকে কার পায়ের ছাপের দিকে, / গা ধোয় ঝরনার জলে। স্বপ্ন দেখে বনদেবী তার / ওষ্ঠে ঠোঁট রেখে হু হু জ্বলছেন সঙ্গম-লিপ্সায়।"

জীবনের প্রতি এই কামরাঙা ভালোবাসা সত্ত্বেও নিজের মৃত্যু নিয়েও তিনি বিলাস করেছেন বহু কবিতায়। তাঁর বয়স যখন চল্লিশের চেয়েও কম, তখন 'বিবেচনা' বলে একটি কবিতায় ভেবে নিয়েছেন: যেদিন তিনি খাটে নিশ্চেতন হয়ে পড়ে থাকবেন, সেদিন হয়তো কাঁদবে কেউ; আত্মীয় স্বজন কেউ কেউ শোকে ধোবে সত্তা, প্রতিবেশীদের কোনো একজন হয়তো বলবে, লোকটা নাস্তিক ছিলো, শরিয়তে মোটেই ছিলো না মন, মসজিদে তার সাথে কখনো হয়নি দেখা, এবং নিষিদ্ধ দ্রব্যে ছিলো তার উৎসাহ প্রচুর। তাঁর মৃত্যুর দিনটা কেমন হবে, আবহাওয়া কেমন থাকলে

ভালো হয়, তাও তাঁর কল্পনাকে উস্কে দিয়েছে। এমন কি, তিনি যে বলে গেলেন যে, তাঁকে যেন সমাধিস্থ করা হয় তাঁর মায়ের সমাধিতে— সেও এক করুণ রোম্যান্টিক কল্পনা। দিনের শেষে মায়ের কোলে ফিরে যাওয়ার ভাবনা থেকে। প্রসঙ্গত বলতে হয়, মা তাঁর সত্তায় একটা প্রগাঢ় আসন জুড়ে আছেন। প্রতিদিন ধ্যানী প্রদক্ষিণে ছায়াবৃত আপন সংসারে তিনি মাকে দেখতে পান। মায়ের অন্তহীন স্নেহের সলিলে সিক্ত তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব।

বিষাদ সব মহৎ সাহিত্যেরই সাধারণ লক্ষণ। শামসুর রাহমান তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর অনেক কবিতায় বিষাদের ঘন ছায়া চেষ্টা না-করলেও চোখে পড়ে। তা সত্ত্বেও তাঁর কাব্যে গোড়া থেকেই একটা আশাবাদ লক্ষ্য করি। তিনি দ্বিতীয় বার মৃত্যুর আগেও প্রথম গান গেয়েছেন, করোটির ওপরও রৌদ্র দেখতে পেয়েছেন। নিরালোকেও তিনি দিব্যরথে চড়েছেন। তাঁর এই আশাবাদ তাঁর পাঠককে উদ্বোধিত করে, অনুপ্রেরণা দেয়। শেষ পর্যন্ত এই আশাবাদ তিনি বজায় রেখেই কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি করে গেছেন। তাঁর শেষ জন্ম দিনের একটি সাক্ষাৎকার দেখেছিলাম, তাতে তিনি হতাশায় অন্ধকার দেশ সম্পর্কে এই আশাবাদের কথা বলেছেন। আস্থা হারাননি। তিনি বলেছেন, তিনি হয়তো দেখে যেতে পারবেন না, কিন্তু বর্তমানের নীরন্ধ্র অন্ধকারে আবার আলোর বন্যা আসবে। তাঁর এই ইতিবাচক কণ্ঠস্বর দৈববাণীর মতো আশ্বাস দেয়।

শামসুর রাহমানের আর-একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে আমাদের জাতীয় জীবনের পথ কখনো সমতল ছিলো না। তাতে অনেক চড়াই-উৎরাই ছিলো। সেই পরিবেশে দেশের প্রতি একজন সমাজ-সচেতন কবির যে দরদের দৃষ্টি থাকবে, সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু শামসুর রাহমানের মধ্যে দেশপ্রেম একটু প্রবলভাবেই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ভালোবাসা দেশ এবং মাটির জন্যে, ভাষার জন্যে, নিপীড়িত মনুষ্যত্বের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে। দেশকে তিনি তুলনা করেছেন মায়ের সঙ্গে— তাতে এমন কিছু অভিনবত্ব নেই, কিন্তু তিনি যখন মাকে তুলনা করেছেন দেশের সঙ্গে— স্বদেশের স্বতন্ত্র মহিমা অনন্য উপমা তার— তখন বোঝা যায়, দেশের জন্যে তাঁর ভালোবাসা কতো আন্তরিক। টেলিমেকাস, বর্ণমালা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, আসাদের শার্ট, তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা তুমি, দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে, একটি মোনাজাতের খসড়া, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় ইত্যাদি কবিতায় দেশের নানা স্বপ্ন দেখেছেন তিনি।

বস্তুত, তাঁর কবিতা আমাদের একদিকে যেমন স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছে, অন্য দিকে তেমনি তাঁর কবিতা আমাদের স্বাধীনতার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখার জন্যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তিনি দুঃখিনী

বর্ণমালাকে দেখে যেমন শোকাহত হয়েছেন, তেমনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন উদ্ভট উটের পিঠে স্বদেশকে চলতে দেখে। তাঁর দেশপ্রেমমূলক কবিতা তাঁর প্রেমের কবিতার মতোই হৃদয়কে নাড়া দেয়। আমার ধারণা, রবীন্দ্রনাথের পরে তিনিই বাংলা ভাষায় সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে বেশি দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেছেন। নজরুল ইসলামের কথা আমি ভুলে যাচ্ছি না। এ দুজনের দেশাত্মবোধক কবিতার চরিত্র আলাদা। নজরুলের দেশাত্মবোধক কবিতা বিদ্রোহমূলক, রাজনৈতিক; শামসুর রাহমানের দেশাত্মবোধক কবিতা দেশের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম প্রেমের কবিতা।

ভাষা ব্যবহারে তাঁর বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ না-করলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয় না। নজরুল ইসলাম থেকে আরম্ভ করে বিশ শতক জুড়ে যে-মুসলমান কবি-সাহিত্যিকরা লিখেছেন, তাঁদের সবার ভাষাতেই মুসলমানী শব্দ অর্থাৎ আরবি-ফারসি শব্দের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ ব্যক্তিগত এবং প্রাত্যহিক জীবনেই তাঁরা এ ধরনের শব্দ বেশি ব্যবহার করতেন। কিন্তু শামসুর রাহমানের ভাষায় তাঁর ধর্মীয় চরিত্র প্রাধান্য পায়নি। তিনি আরবি-ফারসি এবং গ্রামীণ শব্দ প্রচুর ব্যবহার করেছেন, কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে। এ ক্ষেত্রেও তাঁর মধ্যে এক ধরনের নাগরিকত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে আরও বলা উচিত যে, তিনি ভাষা এবং শব্দ ব্যবহারে অত্যন্ত সচেতন এবং সব সময়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন। ঢাকার কুট্টিদের ভাষায় কবিতা লেখা যায় কিনা, সে পরীক্ষাও তিনি সফলভাবে করেছেন। ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি বৈশিষ্ট্য রেখেছিলেন সেই পুরোনো অক্ষরবৃত্তের মধ্যেই। যদিও তিনি অন্য ছন্দ নিয়েও পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন।

শামসুর রাহমানের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলো— এর জন্যে আমি সত্যি গর্ব অনুভব করি। এই পরিচয় থেকে একটা জিনিশ সব সময়ই চোখে পড়েছে। তিনি অসম্ভব নিরহঙ্কার লোক ছিলেন। নিজের ঢাক বাজাতে আমরা সবাই আগ্রহী। আমরা অনেকেই মনে করি, নিজের ঢাক নিজে না-পেটালে, আর কে পেটাবে। এবং শূন্যপাত্রই বেশি ঝনঝন করে। কাজেই আমাদের ঢাকই প্রবল শব্দে বাজে। শামসুর রাহমান এর উল্টো ছিলেন। তিনি নিজেকে জাহির করেননি— কী দেশে, কী বিদেশে। সম্প্রতি উইলিয়াম র‍্যাডিচি একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, শামসুর রাহমান যদি তাঁর কাব্যসমূহের অনুবাদ করানোর ব্যাপারে এবং প্রচারের ব্যাপারে তৎপর হতেন, উদ্যোগী হতেন, বিদেশের সমালোচকদের নজরে আসতেন, তা হলে, তাঁর পক্ষে নোবেল পুরস্কার পাওয়াও হয়তো অসম্ভব হতো না। কিন্তু আত্মপ্রচারে বিমুখ এই লাজুক মানুষটি নিজেকে চিরদিন লুকিয়ে রাখলেন!

কাছের মানুষকে আমরা যথাযথ সম্মান দিই না, সম্মান দিতে শিখিনি। তাঁদের আমরা নিজেদের প্রতিপক্ষ বলে বিবেচনা করি। তারপর সাধারণত মরার পর আমরা

অনুষ্ঠান করে তাঁদের প্রতি সম্মানের পাত্র উজাড় করে দিই। শামসুর রাহমান যে অতো মহৎ একজন কবি ছিলেন, আমার মনে হয়, আমরা তা বুঝতে পারিনি। তাঁর জীবদ্দশায় জীবনানন্দকে পেরেছিলাম ? পারিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শামসুর রাহমান ভবিষ্যতে হারিয়ে যাবেন না। বরং বাংলা সাহিত্যের পাঠকরা তাঁর কাব্যে আরও গুণ দেখতে পাবেন। তাঁর কাব্য আরও ভালোবাসবেন। তাঁকে মনে রাখবেন দীর্ঘকাল।

(*যুগান্তর*, অক্টোবর ২০০৬)

২৪

বাঙালির আদিখ্যেতা

আদিখ্যেতা কথাটার মধ্যেই আছে আদিখ্যেতা। কারণ, 'অধিক' শব্দের বিশেষ্য হলো 'আধিক্য'। কিন্তু বাঙালিরা এই একটা প্রত্যয় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেননি। তাঁরা 'আধিক্য'র পরে ব্যাকরণের মাথা খেয়ে আবার একটা 'তা' প্রত্যয় জুড়ে দিয়ে শব্দটাকে করেছেন 'আধিক্যতা'— চলতি বাংলায় 'আদিখ্যেতা'। (অনেকে যেমন ভুল করে দারিদ্র্যতা লেখেন, তেমনি।) আসলে, বাঙালির চরিত্রেই এই আদিখ্যেতা রয়েছে, রয়েছে সবকিছুকে বাড়িয়ে, অতিরঞ্জন করে বলার প্রবণতা। প্রশংসা করলে বাঙালিরা যেমন মাত্রা ছাড়িয়ে যান, নিন্দা করলেও তেমনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

এটা যে, সাম্প্রতিক বৈশিষ্ট্য, তা মনে করার কারণ নেই। কারণ, মধ্যযুগের সাহিত্যও দেখতে পাই সবচেয়ে বহুলব্যবহৃত অলঙ্কার হলো: অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। বিপ্রদাসের *মনসামঙ্গলে* মুসলমান জমিদার হাসনের লাখ লাখ সৈন্যের বিরুদ্ধে মনসা দেবী দু লাখ নাগ, বাইশ লাখ ভুজঙ্গ, বিশ লাখ ফণা-ধরা মহাপদ্ম নাগ এবং ছত্রিশ লাখ তক্ষক পাঠিয়েছিলেন। মনসামঙ্গলের অনেক পরে লেখা মুসলমানী পুঁথিতেও লাখ লাখ সৈন্য মরার কথা বলে কবি পরক্ষণে বলেছেন, 'শুমার করিয়া দেখি চল্লিশ হাজার।'

যে-যুগে মানুষ বয়স গুনতো কুড়ি দিয়ে, সেই যুগে হাজার, লাখ, কোটি— এসব শব্দের বিশেষ কোনো অর্থ ছিলো না! বোধ হয় আধুনিক কালেও নেই। তা না-হলে একটি বাক্যে কেউ হাজার হাজার (অথবা কোটি কোটি) সালাম ও আদাব জানাতে পারে? হাজার আর লাখ এত অর্থহীন হয়েছে যে, সম্প্রতি হাজারের বদলে লেখা হচ্ছে— হাজারো। লাখের বদলে লাখো।

মনে মনে অন্যের সম্পর্কে যাই ভাবুন, বাঙালিরা বাইরে অন্তত বিনয়ে বিগলিত। 'পরম পূজনীয়েষু', 'পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু' ইত্যাদি সম্বোধন করে যাঁদের কাছে চিঠি লেখা হয়, তাঁদের সবার প্রতিই পত্রলেখকের যে-অগাধ অথবা আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা থাকে, তা হলপ করে বলা যায় না। 'শ্রীশ্রীচরণকমলেষুর পাদপদ্মে' (একই কথা, অতএব আদিখ্যেতা) প্রণতি জানাবার সময়ে ভক্তির চেয়ে ভণ্ডামি অনেক বেশি থাকে। এমনি ভণ্ডামির দৃষ্টান্ত হলো: প্রভূত খানাপিনার আয়োজন করে নিমন্ত্রণ করার সময়ে 'চারটে ডাল-ভাত' খাওয়ার কথা বলা। প্রাসাদের মতো অট্টালিকা নির্মাণ করে তার নাম দেওয়া 'পর্ণকুটীর'।

বস্তুত, এ রকমের অতিরঞ্জন থেকেই বাংলা বিশেষণগুলো ধীরে ধীরে ধার খুইয়ে ফেলছে। বিশেষণের আগে তাই লাগাতে হচ্ছে ভীষণের মতো বিশেষণীয়

বিশেষণ। যেমন, ভী-ষ-ণ সুন্দর, ভীষণ ভালো। আমার ধারণা, এই ধরনের ব্যবহার সম্প্রতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, 'মহা' শব্দটির ব্যবহার। সম্ভবত '৭২ সালে সবার আগে বাংলা একাডেমীর পরিচালক মহাপরিচালক হন। তারপর মহামারীর মতো দেখা দিলো মহাসচিব, মহাজোট, মহাসম্মেলন, মহাসড়ক, মহানগরী। সম্ভব-অসম্ভব সব বিশেষণের আগেই 'মহা' এসে মহা উৎপাত শুরু করলো। এভাবে মহা শব্দটিই এখন তার মাহাত্ম্য হারিয়ে ফেলেছে। মহার মাহাত্ম্য হারানোর একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। স্বাধীনতার পরে লক্ষ্য করলাম, জনসভাকে লেখা হচ্ছে সমাবেশ। আর শেখ মুজিবের মতো বড় নেতার সভাকে বলা হচ্ছে মহাসমাবেশ। সত্যি সত্যি তখন তাতে অনেক লোক হতো। কিন্তু এখন রাজাকার-নেতার সভায় কয়েক ডজন খুদে রাজাকার উপস্থিত হলেও তাকে কেউ কেউ বলেন মহাসমাবেশ। অতঃপর মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীর সভাকে কী বলা হবে?— মহামহাসমাবেশ অথবা মহাজনসমুদ্র ? (এখনই বলে রাখি, মহাজনসমুদ্র লেখার বিপদ আছে— এখন সমাস বিশ্লিষ্ট হবার জামানায় ওটাকে কেউ মহাজন-সমুদ্র মনে করতে পারেন, বিশেষ করে দেশে যখন মহাজন অর্থাৎ ধার-দেনেওয়ালা এবং মহৎ জনদের এতো আদিখ্যেতা হয়েছে!

রাজনৈতিক আদিখ্যেতারও দুয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। শেখ মুজিব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা— এ বিষয়ে রাজাকার ছাড়া অন্যদের কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা না-বলে তাঁকে বলা হয়— জাতির জনক। কথাটা এসেছে সম্ভবত ইংরেজি ফাউন্ডিং ফাদার/ফাদার অব দ্য নেশন থেকে। বহুল প্রচলিত এক্সপ্রেশন— বাংলা ভাষা একে মেনে নিয়েছে। শুনতে অতো খারাপ লাগে না। কিন্তু মুজিবের ক্ষেত্রে ঐ একটা বিশেষণ অনেকে যথেষ্ট মনে করেন না— তাঁর দ্বিতীয় বিশেষণ তাই বঙ্গবন্ধু। সম্প্রতি এক জায়গায় এ দুটির সঙ্গে তৃতীয় আরেকটি বিশেষণ দেখলাম 'বাংলাদেশের স্থপতি'। যাঁরা ব্যক্তিপূজা করেন, তাঁদের কথা আলাদা; কিন্তু যাঁরা পূজা করেন না, তেমন কারো তুলনায় শেখ মুজিবের প্রতি আমার শ্রদ্ধা একটুও কম নয়। আমি বিশ্বাস করি, তিনি যা করেছেন, তার জন্যে তিনি অবশ্যই সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিশেবে ইতিহাসে মর্যাদা পাবেন। কিন্তু এ কথা মনে করা সত্ত্বেও এ যাবৎ আমি কখনো 'বঙ্গবন্ধু' লিখিনি। এবং মনে করি, তাঁর পুরো নাম নয়, তাঁকে সংক্ষেপে কেবল মুজিব বললেই যথেষ্ট হয়। সক্রেটিস যদি কেবল সক্রেটিস, গেলিলিও যদি গেলিলিও, শেক্সপীয়র যদি শেক্সপীয়র, নিউটন যদি নিউটন, লিঙ্কন যদি লিঙ্কন, আইনস্টাইন যদি আইনস্টাইন এবং ম্যান্ডেলা যদি শুধু ম্যান্ডেলা নামে পরিচিত এবং বিখ্যাত হতে পারেন, তবে মুজিব বলার সময় প্রতিবার তাঁকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলতে হবে কেন ?

ওদিকে, শেখ মুজিব বাংলাদেশের বিতর্কাতীত প্রতিষ্ঠাতা হওয়ায় জিয়াউর রহমানের দল পড়েছেন দারুণ বেকায়দায়। এ দলের লোকেরা যেহেতু তাঁর নাম

ভাঙিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চান, সে জন্যে তাঁকেও ফেরেশতায় পরিণত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই তাঁরা তাঁকে দুটো বিশেষণ ইতিমধ্যে দিয়েছেন। প্রথমে শহীদ, তার পর স্বাধীনতার ঘোষক। অথচ আশ্চর্য, ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হলেও, তাঁকে শহীদ বলা হয় না! যদ্দুর শুনেছি, জিয়া নিহত হন সেনাবাহিনীর আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে। অন্তত ধর্মযুদ্ধে যে নিহত হননি— এ বিষয়ে নিশ্চিত। এমন কি, তিনি যেভাবে ক্ষমতায় এসেছিলেন, সেটাকেও আদৌ ধর্মসঙ্গত বলা যায় না। তা হলে তিনি কোন যুক্তিতে শহীদ হলেন ? এমন কি, বিএনপির নেতারাও ভালো করে জানেন যে, জিয়াউর রহমান কোন পরিবেশে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং সে ঘোষণায় তিনি কী বলেছিলেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন মুজিবের নামেই। তা না-হলে তাঁর মতো একজন অজ্ঞাত মেজরের আহ্বানে কেউ যুদ্ধ শুরু করেনি, অথবা যুদ্ধ চালিয়েও যায়নি। অথচ এই ঘোষক পদবীটা এত জরুরি হয়ে পড়েছে যে, সেটা না-বললে দেশের সবচেয়ে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত লোকেরও চাকরি চলে যায়— এমন কি, রাষ্ট্রপতির।

বাঙালির আতিশয্যপ্রীতি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও কিছু কম ছিলো না। তিনিও বিশেষণপ্রেমিক ছিলেন। এমন কি, তাঁর ওপর কেউ 'কবিগুরু' 'গুরুদেব' 'মহাকবি'ইত্যাদি বিশেষণ একক অথবা একত্রে বর্ষণ করলে তিনি রাগে অন্ধ হয়ে তাকে অভিশাপ দিতেন বলে শোনা যায়নি। গান্ধীজীর রাজনৈতিক আন্দোলন দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাই তাঁকে একটা উপাধি দেন— মহাত্মা। সেই থেকে দেশবাসী গান্ধীজীর আসল নাম প্রায় ভুলে গিয়ে তাঁর নামই দেন মহাত্মা গান্ধী। রবীন্দ্রনাথ ১৯২০-এর দশকের গোড়ার দিকে গান্ধীজীকে যখন এই উপাধি দেন, তখন বাংলার জনপ্রিয় নেতা ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। গান্ধীজীর একটা বিশেষণ থাকলে বাঙালি নেতারও একটা বিশেষণ প্রয়োজন হয়। অতএব তিনি হলেন দেশবন্ধু। তারপর একে-একে দেখা দিলেন দেশপ্রিয়, নেতাজী, শেরে বাংলা, বঙ্গবন্ধু। যাঁরা এ রকম কোনো বিশেষ নামে ভূষিত হলেন না, তাঁরাও পিছিয়ে থাকলেন না। তাঁদের নামের আগে লেখা হলো দেশবরেণ্য, দেশনন্দিত ইত্যাদি। এ রকমের বীরপূজার পথ ধরে সম্প্রতি শেখ হাসিনা হয়েছেন জননেত্রী। খালেদা জিয়া হয়েছেন দেশনেত্রী।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, বাংলাদেশে সম্প্রতি বিদ্যুতের মতো অনেক কিছুই তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে; কিন্তু বন্যার পানির মতো যে-জিনিশটার প্রাদুর্ভাব হয়েছে তা হলো নেতা-কর্মীর। একটা দলের যিনি নেতৃত্ব দেন, তিনি নেতা। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন থাকতে পারেন, যাঁদের বলা যায় নেতৃস্থানীয়। কিন্তু এখন গ্রাম পর্যায়েও দলের নেতা তৈরি হয়েছেন। এতো নেতা যে, কোনো ভিড়ের মধ্যে একটা লাঠি ছুঁড়ে মারলে আধ-ডজন নেতা আহত হন। আর, নেতা-কর্মী? এ এক অদ্ভুত পরিভাষা। যা

আগে ছিলো সমর্থক, সক্রিয় সমর্থক অথবা কর্মী, তাই এখন পদোন্নতি পেয়ে নেতা-কর্মীতে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক টাউট, দলীয় চাঁদাবাজ এবং মহাফাজিল— সবাই এখন নেতাকর্মীর পদ 'অলঙ্কৃত' করেছেন। বাঙালিরা কর্তাভজা— শক্তের ভক্ত, নরমের যম। পেছনে গাল দিলেও ক্ষমতাবানের সামনে তাঁরা হাত কচলাতে অত্যন্ত পারদর্শী। (একটা জন্তুর কথা তাঁরা মনে করিয়ে দেন। সে জন্তুটা মালিক এবং মালিক-স্থানীয় সবার সামনে হাত কচলানোর বদলে একটা বিশেষ অঙ্গ নাড়তে থাকে।) এ জন্যে উচ্চপদস্থ কোনো সরকারি কর্মচারীর সামনে পড়লে বাঙালিরা কেঁচো হয়ে যান। কী বলে সম্মান জানাবেন ভেবে পান না। তাই একটার পর একটা বিশেষণের আশ্রয় নিতে থাকেন। যেমন, কোনো মন্ত্রী এলে তাঁকে অমুক সাহেব অথবা জনাব অমুক বললে যথেষ্ট মনে করেন না। বলেন মাননীয় মন্ত্রী। মন্ত্রী কথাটাই যথেষ্ট সম্মানের। কিন্তু মাননীয় বললেও যথেষ্ট হয় না। অনেকে বলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী। ভাবখানা এই যে, এ দেশে সরকার ছাড়া অন্যদেরও মন্ত্রী আছে। অনেকে আবার বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী বলে বিবেচনা করেন যে, কথাটা যথেষ্ট গালভারি হলো না। তাঁরা তখন বলেন— গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী— যদিও এরশাদী সংশোধনের পর আক্ষরিক অর্থে বাংলাদেশ এখন আর গণপ্রজাতন্ত্রী নেই। কারণ, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এখন আল্লাহর ওপর বর্ষিত হয়েছে।

বাংলাদেশ যেহতু কার্যত নির্বাচিত একনায়কের দেশ, সে জন্যে মন্ত্রীর তুলনায় প্রধানমন্ত্রীর স্থান অনেক উঁচুতে। তাই মাননীয় বিশেষণ তাঁর জন্যে যথেষ্ট নয়। তাঁর নামের আগে আরও দু-একটা বেশি বিশেষণ স্বভাবতই প্রয়োজন হয়। যেমন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তনয়া জননেত্রী মহামান্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (খালেদা জিয়াকেও সম্প্রতি কী কী বিশেষণে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, তার খেই হারিয়ে ফেলেছি।) এই বিনয়ের স্রোতে ভেসে-যাওয়া আত্মসম্মানবর্জিত মহাভণ্ড লোকগুলোই আবার শেখ হাসিনা ক্ষমতা থেকে সরে গেলে তাঁর মুণ্ডুপাত করে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর ভজনা শুরু করেন। রাতারাতি অফিসে নতুন ছবি টানান। প্রথম আলোতে প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে জানতে পারলাম যে, এবারের স্বাধীনতা দিবসে (২০০৬) বাংলাদেশ টেলিভিশন (আসলে হিজ মাস্টার্স ভয়েস অব বাংলাদেশ) থেকে যে-সম্প্রচার করা হয়, তাতে একবারও নাকি শেখ মুজিবের নাম বলা হয়নি। বেশ্যারও বোধহয় খদ্দেরের প্রতি এর চেয়ে বেশি আনুগত্য থাকে। বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিকদের নামের সঙ্গে আরও যেসব অর্থহীন বিশেষণ ব্যবহৃত হতে দেখেছি, সেগুলো হলো: মহানায়ক, মহান নেতা, ক্ষণজন্মো, রূপকথার নায়ক, জনগণের নেতা, মজলুম জননেতা ইত্যাদি। এ রকম একটা দৃষ্টান্ত দিই মণি সিংহ সম্পর্কিত একটি লেখা থেকে। এতে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'বর্ণাঢ্য ও সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী মণি সিংহের জীবনাবসান ঘটে...।'

মৃত্যু সম্পর্কে বাঙালিদের অনেকগুলো লক্ষ্য করার মতো এক্সপ্রেশন আছে। যেমন, স্বর্গলাভ, স্বর্গারোহণ, স্বর্গীয়, স্বর্গত (নরকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও), মৃত্যু বরণ, শাহাদাত বরণ, শাহাদাত বরণকারী ইত্যাদি। এগুলো একটাও আমার বানানো নয়, সবগুলোই অথেনটিক। আমি ভেবে পাইনে, মৃত্যুকে বরণ করে কিভাবে— যদি না সেটা আত্মহত্যা হয় ? কেউকেটা মরলে সেই তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি বাঙালিরা শ্রদ্ধা জানান। আত্মা যদি থাকেই, তবে সেটা যে বিদেহী— তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না! তা হলে বিদেহী কথাটার আদিখ্যেতা কেন ?

খবরের কাগজে মাঝেমধ্যে দুটো ব্যবহার লক্ষ্য করি— যুগব্যক্তিত্ব আর যুগমানব। এর কি কোনো অর্থ আছে, নাকি এও আমাদের আদিখ্যেতা? এর অর্থ কি যে-ব্যক্তি অথবা মানব একটা নতুন যুগ তৈরি করলেন? নাকি যে-ব্যক্তি অথবা মানব একটা বিশেষ যুগের যথার্থ প্রতিনিধি অথবা যথার্থ ফসল? প্রসঙ্গত 'ব্যক্তিত্ব' শব্দটাও আদিখ্যেতার আরেকটি চমৎকার উদাহরণ। ব্যক্তিকে ব্যক্তিত্ব বলে না, ব্যক্তিত্ব হচ্ছে ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্যর্সন থেকে যেমন প্যর্সনালিটি। যেভাবে সেই ব্যক্তিত্ব কথাটার অব্যবহার করা হচ্ছে প্রতিদিন, তা দেখলে আহ্লাদে আটখানা হওয়ার উপায় থাকে না। 'তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।' বড় মাপের ব্যক্তিত্বও বোধ হয় শুনেছি। বড় মাপের মানে লম্বা চওড়া। সত্যিকারের লম্বা এবং মোটা লোককে বড় মাপের ব্যক্তি বললে প্রবল আপত্তির কারণ দেখিনে। যদিও একজনের দেহের দিকে ইঙ্গিত করে কোনো মন্তব্য করা ঠিক ভদ্রতার মধ্যে পড়ে না। কিন্তু বড় মাপের ব্যক্তিত্ব ?— একেবারে অর্থহীন।

রাজনৈতিক এলাকা থেকে আর-একটি আদিখ্যেতার দৃষ্টান্ত না-দিয়ে পারছি না। বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতির নামের আগে বেশ কয়েকটি বিশেষণ লক্ষ্য করেছি। অধ্যাপক ডক্টর রাষ্ট্রপতি ...। এর থেকে বেহুদা তোশামুদি আর কিছু হতে পারে না। রাষ্ট্রপতির চেয়ে বড়ো আর কী আছে ? তা ছাড়া, ইংরেজি ভাষায় কাউকে প্রফেসর বললে তার থেকে সম্মানের কিছু থাকে না। ডক্টর কথাটা তখন বেকার হয়ে যায়। তাই কেউ অধ্যাপকের পর ডক্টর বললে তা হাসির খোরাক ছাড়া কিছুই জোগাবে না। বাড়তি সম্মান তো নয়ই! বাংলাদেশে আরও লক্ষ্য করি অধ্যাপক আর প্রফেসরের মধ্যেও একটা পার্থক্য করা হয়। প্রফেসরকে বাংলায় অধ্যাপক বলা হলে তিনি নাখোশ হন— কারণ অধ্যাপক বললে যেন যথেষ্ট বলা হয় না। (প্রশংসার কাঙাল আর কাকে বলে!) কলেজের শিক্ষকরা অনেক দিন আগে থেকেই নিজেদের নামের আগে অধ্যাপক লিখে থাকেন। একজন অধ্যক্ষও অধ্যাপক। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধ্যক্ষরা নামের আগে লেখেন অধ্যক্ষ। সম্প্রতি একজনের নামের আগে দেখলাম উপাধ্যক্ষ। শুনে হাসির চেয়ে বিস্ময়ই বেশি বোধ করেছি। কিছু কাল আগে আরেকজনের নামের আগে দেখলাম তিনি লিখেছেন ইঞ্জিনিয়ার অমুক। অধ্যাপক, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, অ্যাডভোকেট— এঁরা সবাই পেশা আর পদের কথা লিখতে

পারলে এনজিনিয়ার আর পিছিয়ে থাকবেন কেন ? এর পরে আস্তে আস্তে আরও কতোটা পদস্খলন হবে, সেটা এখনই বোঝা যাচ্ছে না।

মহান এবং পবিত্র শব্দ দুটোরও শ্লীলতাহানি করা হচ্ছে প্রতিদিন। যেমন মহান স্বাধীনতা দিবস, মহান শহীদ দিবস। একটা দিন কী করে মহান হয়, সেটা বোঝা কঠিন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধানে মহানের এ রকম কোনো সংজ্ঞা নেই। আরেকটি আদিখ্যেতা পবিত্র শব্দের। ওরস, মিলাদ, রমজান, ঈদ, হজ, দরগা, মাজার, মক্কা, মদিনা— সবই পবিত্র, সন্দেহ নেই। কিন্তু শরীফ লেখার পরও কি শব্দের গোড়ায় আবার পবিত্র লেখার কোনো দরকার আছে ? আরেকটা এক্সপ্রেশন দেখেছিলাম— 'পবিত্র শোণিতে রঞ্জিত'। কোন রক্তটা পবিত্র আর কোনটা অপবিত্র আমার সীমিত বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে তার হদিস করতে পারিনি।

এর থেকেও গুরুতর একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি ধর্ম থেকে। যিশু খৃষ্ট পরিচিত শুধু যিশু অথবা খৃস্ট হিশেবে। বুদ্ধ পরিচিত বুদ্ধ হিশেবে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হিশেবে। কোনো বিশেষণ ছাড়াই কোটি কোটি লোকের কাছে তাঁরা পরম শ্রদ্ধেয়। কিন্তু ব্যতিক্রম ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা। তাঁরা তাঁদের ধর্মপ্রবর্তকের নামের আগে-পিছে অনেকগুলো বিশেষণ জুড়ে দিতে পছন্দ করেন। কেউ না-দিলে তাঁকে প্রায় নাস্তিক বলে গণ্য করেন। সৈয়দ মুজতবা আলি লিখতেন মহাম্মদ সাহেব। তাই নিয়ে তাঁর অনেক গালমন্দ শুনতে হয়েছে। তাঁর যুক্তিটা ছিলো: জীবদ্দশায় মহাম্মদকে সম্মান করে তাঁর অনুসারীরা বলতেন: সাহাব অর্থাৎ সাহেব। সে জন্যেই, তাঁর অনুসারীদের বলা হয় সাহাবা। তার মধ্যে অসম্মানের কিছু নেই। মওলানা আকরম খান তাঁর যে-জীবনী লিখেছিলেন, তাতে মোহাম্মদ নামের আগে কোনো বিশেষণ দেননি, এমন কি, হজরতও নয়। তার মানে কি এই যে, তাঁর শ্রদ্ধা ছিলো না ধর্মপ্রবর্তকের প্রতি? তাঁর নামের শেষে দরুদ অথবা পীস বি আপন হিম লেখাও আমার কাছে বাহুল্য মনে হয়। কারণ তিনি তো সৃষ্টিকর্তার পেয়ারা দোস্ত, তাঁর জন্যে আমাদের মতো পাপীতাপীর দোয়ার কি কোনো দরকার আছে ?

ধর্ম থেকে অন্য প্রসঙ্গে যাবার আগে পীর অথবা তার থেকেও ছোটো 'মাপে'র ধর্মীয় নেতাদের কথা বলে নিই। ছেলেবেলায় ক্বচিৎ পীরের কথা শুনতাম। পীরদের সম্মানসূচক পদবী ছিলো মওলানা। কিন্তু এখন মওলানার নামের সঙ্গে অনেকগুলো বিশেষণ লাগানো হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই পত্রিকা থেকে। 'শামসুল উলামা হজরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কেবলাহ'। এই বিশেষণগুলোর একটা ছাড়া বাকিগুলোর অর্থ আমার জানা নেই। এমন কি, যাঁর কথা বলা হচ্ছে, তাঁর নামও শুনিনি। ঐ একই পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপনে দেখলাম লন্ডনের এক বাঙালি পাড়ায় একটি 'ওয়াজ মাহফিল' হবে এবং তাতে 'ওয়াজ ফরমাইবেন' পাঁচজন মওলানা ও হাফিজ। এই পাঁচজনের নামের আগেই আছে সম্মানসূচক উপাধি 'হযরত'। এতজন হজরতের কাছাকাছি বাস করছি জেনে পুলকিত ও আশ্বস্ত বোধ করলাম। কারণ

এঁদের পুণ্যগুণে মৌলবাদীদের বোমাবাজি থেকে রক্ষা পাব বলে ভরসা করছি। সত্যি সত্যি, সম্প্রতি মওলানাদের বিশেষণের সংখ্যা 'অত্যাধিক' বৃদ্ধি পেয়েছে (আকারটা আদিখ্যেতা)। আগে যাঁরা মুন্সি অথবা মৌলবী বলে পরিচিত ছিলেন, ভুঁইফোড়ের মতো রাতারাতি তাঁরা মওলানায় পরিণত হয়েছেন। দাড়ি থাকলেই তাকে মওলানা বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। দাড়িহীন মওলানা এখনো দেখিনি, তবে খুনীকে মওলানা হতে দেখেছি। যেমন, পালাবদলের খেলায় রাজাকারও মওলানায় পরিণত হয়েছেন। যে যতো বড় রাজাকার, সে ততো বড় মওলানা। তাঁর ওয়াজের ততো ক্যাসেট বিক্রি হয়। জেএমবি-র খুনিরাও মওলানা, মুফতি ইত্যাদি উপাধিতে অলঙ্কৃত হয়েছেন। একটু আদিখ্যেতা করে বলতে পারি এসব উপাধিকে তাঁরা অলঙ্কৃত করেছেন।

এক সময়ে যাঁরা বিলেতে যেতেন, তাঁদের বলা হতো: বিলেতফেরত। এতো কম লোক তখন সুদূর বিলেতে যেতেন বা যেতে পারতন যে, কথাটার একটা তাৎপর্য থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু এখন আর তা নেই। তেমনি যখন দেশ থেকে মাত্র কয়েক শো লোক হজ করতে মক্কা যেতেন, তাঁদের বলা হতো আল-হজ। বোম্বাই পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলে বলা হতো বোম্বাই হাজী। কিন্তু এখন ? এখন কি আল-হজ না-বললে চলে না! দেশের অমুসলমান ছাড়া বাকি তো তাবৎ লোকই প্রায় হজ করে ফেলেছেন। কেউ কেউ বছরে একাধিকবার রাজনৈতিক হজও করেন। তা হলে আর কেন আল-হাজ ?

কেবল ধর্মীয় অথবা রাজনৈতিক নেতাদেরই নয়, অন্যদেরও সম্মানের আতিশয্য দেখানো হয়। যে-রবীন্দ্রনাথের গান অথবা কবিতা ছাড়া সম্ভবত শৌচাগারের উদ্বোধনও সম্ভব হয় না, সেই রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে শুরু করা যাক। রবীন্দ্রনাথ মস্ত বড় কবি, সন্দেহ নেই। বিশ্বের কাছে তিনি বাঙালিদের পরিচয় তুলে ধরেছিলেন, তাতেও সন্দেহ নেই। তবে তাঁকে মহাকবি, বিশ্বকবি, কবীন্দ্র, কবিগুরু, গুরুদেব ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করার কী প্রয়োজন ? তাঁর নামটাই কি কালিদাস অথবা শেক্সপীয়রের মতো যথেষ্ট নয় ? অন্তত আমি আমার কোনো রচনায় এই বিশেষণগুলোর একটাও ব্যবহার করিনি। তাতে যে সেসব রচনায় তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা কিছুমাত্র হ্রাস পেয়েছে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের মতো বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত হয়েছেন ঋষি অথবা সাহিত্যসম্রাটে, নজরুল বিদ্রোহীতে। এসবের কোনো দরকার ছিলো না। সম্প্রতি একটি পত্রিকায় একজন কবি-মুক্তিযোদ্ধার খবর পড়লাম। তিনিও অনেকগুলো বিশেষণের অধিকারী। 'বিশিষ্ট কবি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা'। মুশকিল হলো: এই বিশিষ্ট কবির নাম পর্যন্ত আমি শুনিনি। তা ছাড়া, তিনি বন্দুক নিয়ে মুক্তিযুদ্ধও করেননি। কী করে বীরত্ব প্রমাণ করলেন, দুর্বোধ্য।

বস্তুত, বাঙালিদের বিশেষণ-প্রীতির প্রবল বন্যায় 'বিশিষ্ট' কথাটার অর্থ বঙ্গোপসাগরে ভেসে গেছে। বিশিষ্ট হলো সে, যাকে সাধারণ থেকে আলাদা করে

লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ঢালাওভাবে সবার নামের সঙ্গে বিশিষ্ট লাগালে বিশিষ্ট কথাটাই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। সত্যি বলতে কি, কেবল বাঙালিদের মধ্যে নয়, বাংলা ভাষার মধ্যেও অতিকথনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তা না হলে কেন বলা হবে অমুক ব্যক্তি সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন ? পদটাকে কী করে একজন অলঙ্কৃত করেন ? রঙ লাগান ? মহতী সভা এ রকমের একটি অর্থহীন বাগাড়ম্বর। কিন্তু ব্যাকরণের দিক দিয়ে এতে লিঙ্গের কোনো ভুল নেই। অপর পক্ষে, কিছু দিন আগে 'শাহাদাত বরণকারী' 'স্বাধীনতার ঘোষক' 'জেনারেল (অবঃ)' 'জিয়াউর রহমানের বিধবা' 'ক্ষমতাসীন চার দলীয় ঐক্যজোটের নেতা', 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী' 'দেশনেত্রী' বেগম খালেদা জিয়া এক ভাষণে বলেন, 'মহতী' অনুষ্ঠান। এ থেকে অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিশেষ কিছু বোঝা না-গেলেও, বোঝা গেলো তাঁর ভাষণ যিনি লিখেছিলেন, তাঁর লিঙ্গজ্ঞান দুর্বল। অনুষ্ঠান কথাটা পুংলিঙ্গ। অতএব মহতী না হয়ে মহৎ অথবা মহান হবার কথা। এসব বিশেষণ ব্যবহার করতে গিয়ে ব্যাকরণের শ্লীলতাহানির কী দরকার ? সোজা এবং সংক্ষেপে 'অনুষ্ঠান' বললেই হয়!

আরেকটা বিশেষণ প্রায়ই শোনা যায়: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। ধরা যাক, কারো বই ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলে অমনি তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখকে পরিণত হন। এ রকমের খ্যাতি আরোপের বাসনা বাঙালিদের মধ্যে এতই প্রবল যে, 'প্রবাসী'ও একটি বিশেষণে পরিণত হয়েছে। যেমন, প্রবাসী লেখক। এ দিয়ে বোঝা গেলো যে-লেখক বিদেশে থাকেন। কিন্তু তার মধ্যে গৌরবের কী আছে? বিশেষণের এই ভিড়ে এখন আর ফল দিয়ে কারো পরিচয় হয় না, তোশামোদীরা কী বিশেষণ দিলেন, তা দিয়েই বাজিমাতের চেষ্টা চলে। অর্থহীনভাবে চিরন্তন, আবহমান, প্রচণ্ড, অসম্ভব, বিখ্যাত, প্রখ্যাত ইত্যাদি বিশেষণও ব্যবহার করা হয় যখন-তখন। অসম্ভব সুন্দরের একটা অথেনটিক দৃষ্টান্ত দিই আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে— 'অসম্ভব সুন্দর মুহূর্ত কিশোর পারেখ অমর করে রেখেছেন।' এক জায়গায় পড়েছিলাম 'অন্যতম'— শ্রেষ্ঠ অর্থে। যেমন, শ্রেষ্ঠ কবি লিখতে গিয়ে লেখক লিখেছেন অন্যতম কবি।

মনে আছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাংলার অধ্যাপক ১৯৬৯ অথবা ৭০ সালে দাউদ পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁকে সম্মান জানানোর জন্যে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে একটি ছাত্রী এই পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপককে খুশি করার জন্যে (অন্য ভাষায়— তৈল প্রদান করার নিমিত্ত) তার বক্তৃতায় বলেছিলো, '...দাউদ পুরস্কার পেয়ে বিশ্বের কাছে তিনি বাঙালিদের মুখোজ্জ্বল করেছেন।' শুনে হেসেছিলাম। কিন্তু অবাক হইনি। কারণ বাঙালিরা এমন অতিশয়োক্তি করেই থাকেন। এঁরা দিঘিকেও সাগর বলেন। ব্যাং ভাবে তার কুয়োই মহাসাগর। কারণ, মহাসাগর সে কখনো দেখেনি। তুলনা করার সময়ে একটা বস্তুকে অন্য একটা বস্তুর

সঙ্গে তুলনা করা হয়। দুটোরই আকার, আয়তন, বৈশিষ্ট্য, সাদৃশ্য ইত্যাদি জানা থাকলে তবেই সেই তুলনা সার্থক হয়। তা না-হলে সেই তুলনাই অনর্থক। জ্ঞানের অভাব থেকে অনর্থক তুলনা দেখা দিতে পারে; কিন্তু না, বাঙালির অনর্থক তুলনার কারণ তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য— আদিখ্যেতা।

(*প্রথম আলো*, মে ২০০৬)

২৫

ভবিষ্যতের বাংলা ভাষা-সাহিত্য

বাংলা ভাষার বয়স প্রায় হাজার বছর, কারো কারো মতে, তার চেয়েও বেশি। নানা বাঁক ঘুরে, নানা রকমের প্রভাব স্বীকার করে প্রায় সবার অলক্ষে এ ভাষা বর্তমান রূপ নিয়েছে। কিন্তু গত আড়াই শো বছরে দুটি রাজনৈতিক ঘটনা এই ভাষাকে যতো বদলে দিয়েছে, তেমন দ্রুত অথবা ব্যাপক পরিবর্তন একটা ভাষার ইতিহাসে বড়ো একটা দেখা যায় না। প্রথম ঘটনাটি হলো: ইংরেজ শাসনের রাজধানী হিশেবে কলকাতা নগরীর উদ্ভব আর দ্বিতীয় ঘটনা স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হিশেবে ঢাকার অভিষেক। কলকাতা রাজধানী হওয়ার ফলে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের যে-পরিবর্তন হয়েছিলো, সে ইতিহাস আমাদের কমবেশি জানা। কিন্তু ঢাকা একটি স্বাধীন দেশের রাজধানী হওয়ায় বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের ওপর যে-প্রভাব পড়তে পারে, তা এখনো জল্পনাকল্পনার বিষয়। তবে কলকাতায় যা ঘটেছিলো এবং গত তিন দশকে ঢাকায় যা ঘটেছে, তা থেকে খানিকটা অনুমান করা যেতে পারে, বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য কোন পথে যাচ্ছে, অথবা ভবিষ্যতে কোন চেহারা পেতে পারে।

জীবিকার অন্বেষণে এবং ভাগ্যের উন্নতি করার আশায় আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে হাজার হাজার মানুষ কলকাতায় আসতে আরম্ভ করেন। এঁরা আসেন কলকাতার আশেপাশের এলাকা থেকে। যতো সময় যেতে থাকে, এই সংখ্যাও ততো বাড়তে থাকে। তা ছাড়া, যেসব জায়গা থেকে লোকেরা আসেন, তার পরিধিও দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। সবারই একই উদ্দেশ্য— কলকাতায় বিত্ত এবং বিদ্যার যে-ভোজ হচ্ছে, তার শরিক হওয়া। মফস্বল থেকে আসা এই লোকেরা কলকাতায় ভিড় করেছিলেন বিচিত্র আঞ্চলিক ভাষা এবং সংস্কৃতি নিয়ে। একদিকে এসব ভাষা এবং সংস্কৃতি কলকাতার লোকেদের প্রভাবিত করেছিলো, অন্যদিকে কলকাতার ভাষা এবং সংস্কৃতিও প্রভাবিত করেছিলো এই বহিরাগতদের। কোনো কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রভাবও পড়েছিলো ক্ষেত্রবিশেষে। যেমন, বাংলা গদ্যকে গড়ে তোলার ব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন জোনাথান ডানকান এবং হেনরি পিটস ফরস্টারের মুনশিরা আর উইলিয়াম কেরীর পরিচালনায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কয়েকজন পণ্ডিত। এই পণ্ডিতদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। সরকারী বৃত্তের বাইরে কয়েক বছর পরে বাংলা গদ্যের দিক নির্দেশনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন রামমোহন রায়। সর্বোপরি, বাংলা ভাষা ওপর ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ প্রভাবও পড়েছিলো। তারপর ধীরে ধীরে সমন্বয়ও ঘটেছিলো এসব বিচিত্র উপাদানের।

উনিশ শতকের গোড়ায় যে-প্রামাণ্য বাংলা সাধু ভাষার জন্ম হয়, সে ভাষা এই কলকাতার ফসল। সে ছিলো আগের শতাব্দীর বাংলা থেকে রীতিমতো ভিন্ন ধরনের। আঠারো শতকের যে-বাংলা গদ্যের নমুনা আমরা দেখতে পাই, তাতে একদিকে যেমন আরবি-ফারসি শব্দের ব্যাপক ব্যবহার ছিলো, তেমনি সে গদ্য লেখা হতো ছোটো ছোটো বাক্য দিয়ে। কিন্তু ১৭৮০-র দশক থেকে ইংরেজ কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে আইনের বই এবং সরকারী কাগজপত্র অনুবাদ করাতে দিয়ে যে-বাংলা লেখা হয়, তাতে আরবি-ফারসি উপাদান কমে যায় এবং বাক্যের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। সরল বাক্য পরিণত হয় জটিল এবং যৌগিক বাক্যে। বিশেষ করে হেনরি পিটস ফরস্টার এবং উইলিয়াম কেরী এই রীতির বাংলাকে খুব উৎসাহিত করেন। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য আমার লেখা বই *কালান্তরে বাংলা গদ্য*।) কেরীর অধীনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতরা যেসব পাঠ্যবই লেখেন, তা লেখেন এই নতুন ধরনের এবং অনেকটা কৃত্রিম ভাষায়। সাধারণ বাঙালিদের মধ্যে এসব রচনা বেশি লোক পড়েননি, কিন্তু রামমোহন রায় থেকে শুরু করে অন্য যাঁরা পরবর্তী বিশ বছরে বাংলা লিখতে এগিয়ে আসেন, তাঁরা গদ্যের এই রীতিকে অস্বীকার করতে পারেননি। কমবেশি এই রীতির ওপর ভিত্তি করেই তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের নিজেদের গদ্যরীতি।

এভাবে যে-বাংলা গদ্যের জন্ম হলো, তা ছিলো মুখের ভাষা থেকে যথেষ্ট আলাদা। রামমোহন রায় এই গদ্যকে খানিকটা সাবলীলতা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। আর, ১৮২০-এর দশকে খবরের কাগজগুলো এই ভাষাকে প্রতিদিনের ব্যবহারের উপযোগিতা দিয়েছিলো। কিন্তু মাধুর্যবর্জিত এবং আড়ষ্ট এই ভাষা সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী ছিলো না। ১৮৪০-এর দশকের শেষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ আবিষ্কার করেন এবং তাতে সাহিত্যিক গুণাবলী আরোপ করেন। ফলে এক কালের আড়ষ্ট সাধু বাংলাই বেতাল পঞ্চবিংশতি অথবা সীতার বনবাস লেখার মতো সুললিল হয়ে ওঠে। তাঁর ভাষা পড়তে হোঁচট খেতে হয় না। তা ছাড়া, তিনি অনুপ্রাস এবং লঘুগুরু শব্দের এমন চমৎকার সমন্বয় ঘটান, যা তাঁর ভাষাকে একটা সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যও দান করেছিলো। তা সত্ত্বেও এ ভাষাও ছিলো মুখের ভাষা থেকে অনেক দূরে, তার ভিত্তি ছিলো তার আগেকার অর্ধশতাব্দীর সাধু ভাষা। তিনি তাকে কেবল মাধুর্যমণ্ডিত করেছিলেন। তা ছাড়া, এ ভাষা সব বিষয় লেখার উপযোগী ছিলো না।

বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন প্রাচীন ভারতের গল্প অথবা পৌরাণিক কাহিনী। অপর পক্ষে, প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৫৪ সালে *আলালের ঘরের দুলাল* নামে যে-কাহিনী লিখতে আরম্ভ করেন, তার বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন সমসাময়িক সমাজ থেকে। কেবল বিষয়বস্তু নয়, যে-ভঙ্গিতে তিনি লিখতে চেয়েছিলেন, তার জন্যেও বিদ্যাসাগরের ভাষা উপযোগী ছিলো না। এ জন্যে তিনি বহু জায়গায় চলতি ক্রিয়াপদ, সর্বনাম এবং

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করে মুখের ভাষার কাছাকাছি নতুন এক রীতির গদ্য উদ্ভাবন করেন। তার চেয়েও বড়ো কথা, তিনি বাংলা ভাষার অন্য একটি সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেন। সে সম্ভাবনাকে আরও এগিয়ে দেয় কয়েক বছর পরে প্রকাশিত *হুতোম প্যাঁচার নকশা*। এই বইয়ের লেখক কথ্য বাংলার অসাধারণ ক্ষমতাকে তুলে ধরেন। কিন্তু এ ভাষাও সবকিছু লেখার উপযোগী ছিলো না। এমন কি, এ রকমের ভাষা প্রচলনের জন্যে সময়ও তখনো পর্যন্ত অনুকূল হয়নি । এ জন্যেই বোধ হয় এই অসাধারণ রীতির কোনো অনুকারক আমরা দেখতে পাইনে।

১৮৬০-এর দশকে এসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাধু রীতিকে অবলম্বন করে বাংলা ভাষাকে সৃজনশীল সাহিত্যের উপযোগিতা দান করেন। বিষয়বস্তু অনুযায়ী তিনি কোথাও ব্যবহার করেন লঘু ভাষা, কোথাও গুরুগম্ভীর ভাষা। তবে ক্রিয়াবিভক্তি অথবা সর্বনামে তিনি কথ্যভাষাকে অনুসরণ করেননি। তাঁর ঝোঁকও ছিলো প্রধানত তৎসম শব্দ এবং সমাসবদ্ধ পদের ওপর। এ কথায় বলা যায় যে, তাঁর গদ্য কোথাও কোথাও মুখের ভাষার শক্তিকে প্রকাশ করলেও, তা ছিলো মূলত সাধু ভাষা। তখনো কৃত্রিমতা কাটিয়ে মুখের ভাষাকেই সাহিত্যের ভাষার মর্যাদা দেওয়ার মতো লেখকের আবির্ভাব ঘটেনি। ১৮৭৮-৭৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ থেকে কতোগুলো চিঠি লিখেছিলেন তাঁর ইউরোপ প্রবাসের অভিজ্ঞতা জানিয়ে। সে চিঠিগুলো *ভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। কথ্যভাষায় লেখা এই চিঠিগুলো প্রমাণ করে যে, সেই আঠারো বছর বয়সেই তিনি কথ্যভাষার সম্ভাবনার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এর কয়েক বছর পরে তিনি যখন গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করেন, তখন তিনি আর কথ্যভাষায় লিখতে সাহস পাননি, পাঠকরা সে ভাষাকে মেনে নেবেন কিনা, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হতে পারেননি। তাই সেসব তিনি সাধু ভাষাতেই লেখেন, যদিও ১৮৯০-এর দশকে তিনি *গল্পগুচ্ছের* ভাষায় সর্বনামে কথ্যভাষার রীতি কোথাও কোথাও ব্যবহার করেছিলেন।

প্রবন্ধ— সব কিছুই লেখা সম্ভব মুখের ভাষায়। তারপর থেকে গত নব্বুই বছর ধরে বেশির ভাগ লেখকই চলতি বাংলায় তাঁদের সাহিত্য রচনা করেছেন। এমন কি, কলকাতায় আনন্দবাজার পত্রিকা অথবা ঢাকায় ইত্তেফাকের মতো পত্রিকা সাধুভাষাকে জোর করে ধরে রাখার যে-প্রয়াস চালায়, তাও অনেক আগেই ভেঙে পড়ে। এভাবে এককালে যে-গদ্য মুখের ভাষার কাছাকাছি ছিলো, সেই গদ্য আবার মুখের ভাষার কাছাকাছি ফিরে এলো। কিন্তু তার জন্যে এক শো বছরেরও বেশি সময় তাকে উজানপথে চলতে হয়েছে।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে কলকাতায় যে-ভাষা এবং সাহিত্যের বিকাশ লক্ষ্য করি, তার আরও কতোগুলো বৈশিষ্ট্য ছিলো। এই নগরীতে তখন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক ছিলেন মুসলমান। কিন্তু তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন অবাঙালি। তাঁরা লেখাপড়ার দিকে এগিয়ে আসেননি। সে জন্যে, বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের বিকাশে তাঁদের কোনো ভূমিকা পালন করার প্রশ্নই ওঠে না। বস্তুত, তাঁরা বঙ্গদেশে বাস করলেও, বাঙালি বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন না; প্রতিবেশী বাংলাভাষী হিন্দুরাও তাঁদের বাঙালি বলে গণ্য করতেন না। উনিশ শতকের বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য তাই পনেরো আনাই হিন্দুদের গড়া। এমন কি, শতাব্দীর শেষেও খুব কম মুসলমানই বাংলায় লিখতেন। খুব কম মুসলমানই স্বীকার করতেন যে, তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা। এই পরিবেশে যে-সাহিত্য রচিত হয়, সেও বাংলা গদ্যের মতো হিন্দু লেখকদের তৈরি। তাতে মুসলমানদের অবদান যেমন খুব সামান্যই ছিলো, তেমনি তাতে মুসলিম জীবনও প্রায় অনুপস্থিত। এক কথায়, কলকাতাকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকে যে-নতুন সংস্কৃতি দানা বাঁধে, সেই সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান ছিলো নিতান্তই নগণ্য, এবং তার প্রধান কারণ বাংলা ভাষার দিকে তাঁদের মুখ ফিরিয়ে থাকা এবং আধুনিক শিক্ষার দিকে এগিয়ে না-আসা।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ এবং তারপর ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পর অবশ্য অবস্থা বৈপ্লবিকভাবে পাল্টে গেছে। দেশবিভাগের পর কলকাতা পরিণত হয় ভারতের একটি প্রাদেশিক রাজধানীতে। শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সীমিত বিকাশ এবং বামপন্থী ও উগ্রবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে কলকাতা প্রাদেশিক রাজধানী হিশেবেও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। তদুপরি, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী এবং ইংরেজি হওয়ায় বাংলার গুরুত্বও অনেক কমে যায়। এর ফলে উনিশ এবং বিশ শতকের কলকাতায় বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে অগ্ন্যুৎপাতের মতো সৃজনশীলতার যে-স্ফূরণ লক্ষ্য করেছিলাম, সেই ধারা বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আর বজায় থাকেনি। তার অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায় সর্বত্র। একুশ শতকের গোড়ায় এখন দেখা যাচ্ছে, কলকাতায় হিন্দীর চর্চা ক্রমবর্ধমান, কিন্তু বাংলার চর্চা সে অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে হয় না। এমন কি, সন্দেহ হয়, পঞ্চাশ বছর পরে বাংলার চর্চা এখন যেটুকু আছে, তাও থাকবে কিনা।

অপর পক্ষে, বাংলাদেশের দিকে তাকালে আমরা অন্য ছবি দেখতে পাই। বিশ শতকের গোড়া থেকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বাংলা তাঁদের মাতৃভাষা কিনা তাই নিয়ে বিকর্ত শুরু হয়। কিন্তু ১৯৩০ সালের মধ্যে এই বিতর্কের অবসান ঘটে। দেশবিভাগের পরে মুসলমানপ্রধান পূর্বপাকিস্তানে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা সত্যিকার প্রবল হয়ে ওঠে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। বস্তুত, এই আন্দোলনকে ঘিরেই শেষ পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তান ভেঙে গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। এই স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষাও বাংলা। সেদিক দিয়ে এই দেশে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য বিকাশ লাভ করার অসাধারণ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়েও সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের অবদান ছিলো খুবই কম। বাংলা ভাষা চর্চায়ও তাঁরা অনেক পিছিয়ে ছিলেন। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষে এসে, এখন মনে হয়, মানের দিক দিয়ে না-হলেও বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য চর্চায় পরিমাণের দিক দিয়ে পশ্চিম বাংলাকে বাংলাদেশ হারিয়ে দিয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যেতে পারে, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং মানবিক বিদ্যা চর্চার জন্যে যতো বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে কি তার একাংশও প্রকাশিত হয়েছে? অথবা এখন বাংলাদেশে প্রতি বছর যতো বই এবং পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়, পশ্চিমবঙ্গে কি তা হয়? কেবল তাই নয়, বাংলাদেশে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য যে-সরকারী পৃষ্ঠপোষণা পাচ্ছে, পশ্চিম বাংলায় তা পাওয়া যাচ্ছে না, অথবা তা প্রত্যাশা করাও ঠিক নয়। এমন কি, সেখানে এখন যেটুকু সরকারী আনুকূল্য পাওয়া যাচ্চে, ভবিষ্যতে তাও অব্যাহত থাকবে বলে মনে হয় না। আমার ধারণা, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের চর্চা তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট কমে যাবে। অন্য দিকে, সরকারী ভাষা হিশেবে বাংলাদেশে বাংলা ভাষার চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এমন কি, গান, নাটক এবং সিনেমার ব্যাপারেও এ কথা বলা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে এসব এখনো বাংলাদেশের তুলনায় বিস্তর এগিয়ে আছে, কিন্তু পঞ্চাশ বছর পরে সে অবস্থা তেমন থাকবে বলে মনে হয় না।

কেবল তাই নয়, একদিন কলকাতা নগরীতে যে-বাংলা ভাষা বিকাশ লাভ করেছিলো এবং যে-ভাষা সমগ্র বঙ্গদেশের আদর্শ ভাষায় পরিণত হয়েছিলো, সেই ভাষা আর সমগ্র বাংলাভাষীদের প্রামাণ্য বাংলা বলে বিবেচিত হবে কিনা, সে নিয়ে এখন সন্দেহ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। প্রথম যৌবনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বরিশালের গ্রাম থেকে ঢাকায় পড়তে এসে প্রথমেই যা শিখতে চেষ্টা করেছিলাম, তা হলো "শুদ্ধ ভাষা"য় কথা বলা। এই প্রবণতা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত কমবেশি বজায় ছিলো। কিন্তু এখন ঢাকার তরুণ-তরুণীরা প্রামাণ্য বাংলায় কথা বলেন না। এখন বরং এক ধরনের ঢাকাই বাংলায় কথা বলাই ফ্যাশানে পরিণত

হয়েছে। এমন কি, যাঁরা যশোর-খুলনা-কুষ্টিয়া, রাজশাহী-দিনাজপুর— এসব অঞ্চলের এবং ইচ্ছে করলেই "শুদ্ধ বাংলা" অথবা "শুদ্ধ ভাষা"র কাছাকাছি একটা ভাষায় কথা বলতে পারেন, তাঁরাও সে বাংলা না-বলে ঢাকাই বাংলা বলেন। বাংলাদেশের গণ্যমান্য লোক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষ যখন কথা বলেন, এমন কি একটা সভায় বক্তৃতা করেন, তখনো তাঁরা পুরোটা অথবা আংশিকভাবে এই ঢাকাই বাংলাই ব্যবহার করেন।

বাংলাদেশের সৃজনশীল সাহিত্যে দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার বহু বছর আগে থেকেই লক্ষ্য করা গেছে, সে কেবল যশোর-খুলনার ভাষা নয়, নোয়াখালির ভাষারও মতো দুর্বোধ্য আঞ্চলিক ভাষাও সাহিত্যে স্থান পেয়েছে ষাটের দশকের গোড়ায়। "মুসলমানী" শব্দের আধিক্যও দেখা দেয় দেশবিভাগের পরে থেকে। এখন ঢাকার টেলিভিশন-নাটকে আঞ্চলিক ভাষা এতো বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে যে, কোনো চরিত্র প্রামাণ্য কথ্য ভাষায় কথা বললে তাকে প্রায় কৃত্রিম বলে মনে হয়। সৃজনশীল সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষার এই ব্যবহার অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু যা আশঙ্কার সঙ্গে এখন লক্ষ্য করছি, তা হলো, ইতিমধ্যে তরুণদের কেউ কেউ ঢাকাই ভাষায় প্রবন্ধও লিখতে চেষ্টা করছেন। এমন কি, ঢাকার ভাষায় কবিতা লিখেছেন শামসুর রাহমান এবং, কেবল সংলাপ নয়, পুরো গল্প লিখেছেন ইমদালুল হক মিলন।

এই ঢাকাই বাংলা বিশেষ করে ঢাকা অঞ্চলের বাংলা নয়। এ হলো কয়েকটি জিলার এক ধরনের মিশ্র বাংলা। এ ভাষায় মুসলমানদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত ধর্মীয় অনুষঙ্গের বহু আরবি-ফারসি শব্দও আছে। যেমনটা, ধরা যাক, সৈয়দ শামসুল হকের *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* নাটকে লক্ষ্য করি। বলা শক্ত, এ ভাষা ঠিক কোন জিলার ভাষা, কিন্তু এ যে কলকাতার প্রামাণ্য বাংলা নয়, এ যে পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক ভাষা— এটা পরিষ্কার। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রামাণ্য বাংলার সঙ্গে বাংলাদেশের বহুল প্রচলিত কথ্য ভাষার পার্থক্য মার্কিন এবং ব্রিটিশ ইংরেজির মতো প্রধানত কেবল উচ্চারণের নয়, তার চেয়ে বড়ো পার্থক্য শব্দাবলীর। আঞ্চলিক এবং আরবি-ফারসি শব্দ তাতে অনেক বেশি। এমন অনেক শব্দ আছে, যা লেখার মতো হরফও আমাদের বাংলা ভাষায় নেই। তা ছাড়া, যে-ইসলামী শুদ্ধবাদী চেতনা থেকে 'খোদা' 'আল্লা'য় পরিণত হয়েছেন, সেই চেতনার প্রভাবে বহু আরবি-ফারসি শব্দ এখন এমনভাবে লেখা হচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে তা আর তাবৎ বাঙালির কাছে বোধগম্য থাকবে না। পূর্ববঙ্গীয় ভাষার ব্যাকরণও যথেষ্ট পরিমাণে ভিন্ন ধরনের। বিশেষ করে ক্রিয়াবিভক্তি এবং সর্বনামে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশের ভাষায় ইংরেজির প্রভাবে "ফোন দেওয়া"র অথবা "ধরা খাওয়া"র মতো এমন অনেক প্রয়োগও দেখা যাচ্ছে, যার সঙ্গে প্রামাণ্য বাংলার মিলন ঘটানো শক্ত। এমন কি, ঢাকার ভাষায় পারিভাষিক ও আভিধানিক শব্দের সঙ্গে আঞ্চলিক শব্দের মিলন ঘটিয়ে যেসব বাক্য তৈরি করা হচ্ছে, তা এতোকাল অভাবনীয় ছিলো। (যেমন, তুমি

আজীবন সদস্য হইবা? আমারে রেজিস্ট্রি কইরা বিয়ে করবা? তোমারে খুব সুন্দর লাগে। আপনের নাম কয়েন। কী কইলা ? আয়েন, বসেন ইত্যাদি।) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতা বেড়ে যাওয়া ছাড়া, কমে যাওয়ার কোনো কারণ নেই দেখতে পাচ্ছি না।

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের ভাষায়ও আঞ্চলিকতার ছাপ পড়া খুবই স্বাভাবিক। বস্তুত, সে লক্ষণ এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে। সেখানকার সৃজনশীল সাহিত্যে এখন ক্রমবর্ধমান মাত্রায় বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে— বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, ভাগলপুর, শিলিগুড়ি— দূরদূরান্তের ভাষা এখন সংলাপে আসতে আরম্ভ করেছে। তার ফলে এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের লোকেরা পুরো বুঝতে পারবে কিনা, তাতেও সন্দেহ আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় *জাহান্নাম থেকে বিদায়* নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন শওকত ওসমান। সে উপন্যাসে আরবি-ফারসি উপাদান সহ বেশকিছু আঞ্চলিক শব্দ ছিলো। পাছে পশ্চিমবঙ্গের পাঠকরা সে ভাষা বুঝতে না-পারেন, তার জন্যে তিনি সেসব শব্দের অর্থ বন্ধনীর মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলেন। এ রকমের আর-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ব্রিটিশ ইংরেজি এবং মার্কিন ইংরেজির পার্থক্য থেকে। কয়েক বছর আগে একটি মার্কিন টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ব্রিটিশ টেলিভিশনের একটি জনপ্রিয় সোপ অপেরা— ঈস্ট এন্ডার্স— দেখানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই সোপ অপেরার ভাষা এতো লন্ডনভিত্তিক এবং বহু শব্দের অর্থ এবং উচ্চারণ প্রামাণ্য ইংরেজি থেকে এতো আলাদা যে, মার্কিন টেলিভিশন নেটওয়ার্ক সেই ধারাবাহিক দেখানোর আগে এই সব শব্দের অর্থ দিয়ে একটি তালিকা তৈরি করে এবং সেই তালিকা দর্শকদের মধ্যে বিতরণ করে। কালে কালে দুই বাংলার মধ্যে তাই হবে কিনা, আমার প্রশ্ন এবং আশঙ্কা সেটাই।

এমন কি, ত্রিপুরা, অসম, মেঘালয়, ওড়িষা এবং বিহারে যে-বাঙালিরা বাস করেন, বিশেষ করে ত্রিপুরা এবং অসমে, তার সঙ্গেও কলকাতার ভাষার পার্থক্য দেখা দেবে বলে মনে করাই সঙ্গত। ভারতের এসব রাজ্যের ভাষায় বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দূরে অবস্থিত ত্রিপুরা এবং অসমের ভাষায় বাংলাদেশের ভাষার প্রভাবও যথেষ্ট মাত্রায় পড়তে পারে। তা ছাড়া, এসব জায়গায় যে-সাহিত্য গড়ে উঠবে, তাতে সেখানকার জীবনযাত্রা ক্রমবর্ধমান মাত্রায় স্থান পাবে।

ভাষার পার্থক্য কতোটা হবে, তা নিয়ে আমরা আপাতত কেবল আন্দাজ-অনুমান করতে পারি। কিন্তু সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে যে পার্থক্য দেখা দেবে, সে সম্পর্কে জল্পনাকল্পনা না-করেই বলতে পারি, তা হবে ব্যাপক। কলকাতায় গত দু শো বছরে যে-সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাতে স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্য করি প্রধানত হিন্দু-জীবনের প্রতিফলন। অপর পক্ষে, এখন বাংলাদেশে যে-সাহিত্য রচিত হচ্ছে, তার মধ্যে মুসলিম-জীবন প্রাধান্য পাবে, বলাই বাহুল্য। দেশবিভাগের ঠিক পরে পূর্ববাংলায় হিন্দুদের সংখ্যা ছিলো মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় তিরিশ ভাগ। কিন্তু এখন সে

সংখ্যা দশ ভাগের এক ভাগ। কেবল তাই নয়, ডানপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের ফলে দেশ থেকে যেভাবে হিন্দুরা চলে যাচ্ছেন, তাতে এখনকার তুলনায় হিন্দুদের অনুপাত আরও কমে যাওয়াই স্বাভাবিক। এবং তা হলে, বর্তমানে বাংলাদেশের সাহিত্যে যেটুকু হিন্দুমুসলমানের মিলিত জীবন প্রতিফলিত হচ্ছে, তার পরিমাণ আরও কমে যাবে বলে মনে হয়। মোট কথা, আগামী পঞ্চাশ-একশো বছরে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের দুটি স্বতন্ত্র ধারা প্রবাহিত হবে বলেই ধারণা করি। এবং এই দুই ধারার মধ্যে বাংলাদেশের ধারাই যদি তখন বেশি জোরদার হয়, তা হলেও অবাক হওয়ার কারণ থাকবে না।

এক শো বছর আগে যখন প্রথম বারের মতো বঙ্গদেশ বিভক্ত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা করেছিলেন যে, বঙ্গদেশকে একটি হিন্দু-প্রধান এবং একটি মুসলমান-প্রধান অংশে বিভক্ত করলে কালে কালে দুই বাংলায় অখণ্ড বাংলাভাষা না-ও থাকতে পারে। শেখ মুজিবুর রহমান যখন স্বাধীন পূর্ববঙ্গের নাম দেন বাংলাদেশ, তখন তিনি ঠিক কী ভেবেছিলেন, জানা যায় না। তবে তাঁর মনে হয়তো এমন ক্ষীণ আশা ছিলো যে, কালে কালে সে দেশ হবে তাবৎ বাংলাভাষীদের দেশ। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ যে এক কালে কেবল বাঙালি মুসলমানদের দেশে পরিণত হবে অথবা সেখানে একটা ভিন্ন ধরনের বাংলা ভাষা তৈরি হবে এবং তার ফলে দুই বাংলা স্থায়ীভাবে আলাদা হয়ে যেতে পারে— এটা তিনি নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারেননি।

আপাতত বাংলাদেশের অনেকে এই সম্ভাবনার কথা ভেবে আশঙ্কিত না-ও হতে পারেন। তাঁরা ভাবতে পারেন, ভালোই তো, বাংলাদেশে একটা বাংলাদেশী ভাষা তৈরি হবে! কিন্তু এর ফলে যে-অপূরণীয় ক্ষতি হবে, দূরদৃষ্টির অভাবে সেটা তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁরা হয়তো ভাবতে পারছেন না যে, বাংলাদেশের ভাষা যদি মূল ভাষা থেকে যথেষ্ট মাত্রায় বদলে যায়, তা হলে এ দেশের লোকেরা তাঁদের ঐশ্বর্যমণ্ডিত সাহিত্যে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলবেন। পূর্ব পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পর নানাভাবে পূর্ব বাংলার ভাষাকে মূলধারার বাংলা থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়েছিলো। তার মধ্যে দুটি প্রয়াসের কথা এখানে বলা যেতে পারে— এক. আরবি হরফে বাংলা লেখা এবং দুই. প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ জোর করে বাংলা ভাষায় নিয়ে আসা। পাকিস্তানের নেতারা আশা করেছিলেন যে, এই দুই উদ্যোগ সফল হলে ধীরে ধীরে পূর্ব বাংলার ভাষা পশ্চিম বাংলার ভাষা থেকে আলাদা হয়ে যাবে। এবং কালে কালে পূর্ব বাংলার লোকেরা আর মূল বাংলা সাহিত্য পড়তে পারবেন না অথবা পড়বেন না।

পূর্ব বাংলার লোকেরা অবশ্য এই ষড়যন্ত্রকে পঞ্চাশ-ষাটের দশকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনের পরে তাঁদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি যে-গভীর ভালোবাসা এবং অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে, তা

সব ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলো। গোটা বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁরা নিজেদের শনাক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে এখন বাংলাদেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আবার বাংলা ভাষার পায়ে কুড়ুল মারতে উদ্যত হয়েছেন। এর মধ্যে যাঁরা ইসলামী সক্রিয়বাদী এবং ইসলামী ফাউন্ডেশন অথবা কোনো ইসলামী এনজিও-র অর্থ সহায়তায় নতুন করে আরবি-ফারসি প্রভাবিত বাংলা চালু করতে চেষ্টা করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যটা বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু একদল তথাকথিত "প্রগতিশীল" বুদ্ধিজীবীও আছেন, যাঁরা সজ্ঞানে মূলধারার বাংলা থেকে ভিন্ন চেহারার বাংলা প্রবর্তনের পক্ষে ওকালতি করছেন। এঁদের কেউ কেউ আবার মার্কসবাদী বলেও নিজেদের শনাক্ত করেন। কিন্তু একটু ঠাহর করলেই বোঝা যায়, আসলে এঁরা মার্কসবাদী নন। অন্তরের অন্তস্তলে এঁরা একটা "বাদে"ই বিশ্বাস করেন, সেটা ইসলামী জাতীয়তাবাদ । এই জাতীয়তাবাদকে এই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেন। নিজেদের বাঙালি পরিচয় নিয়ে এঁরা তাই বিব্রত বোধ করেন। প্রকৃত পক্ষে, তাঁদের বাংলাদেশীত্বকেই জোরদার করার জন্যেই তাঁরা বাংলা ভাষার সংস্কার করতে চান।

বাংলাদেশের ভাষায় যদি কালে কালে স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তন আসে, তা হলে সে সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না। সেটা কারো পক্ষে ঠেকিয়ে রাখাও সম্ভব হবে না। কিন্তু কোনো সচেষ্ট ষড়যন্ত্রের ফলে যদি বাংলা ভাষার চরিত্র কৃত্রিমভাবে বদলে দেওয়া হয়, তা হলে তা হবে স্বেচ্ছায় আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার সামিল। সত্য বটে, স্বতন্ত্র চেহারার বাংলা চালু হলে কয়েক দশকের মধ্যেই আমরা আমাদের ঐতিহ্য পুরোপুরি হারিয়ে ফেলবো না। কিন্তু, ধরা যাক, এক শতাব্দী পরে তখনো কি অখণ্ড বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য চালু থাকবে ? অথবা রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র অথবা জীবনানন্দ, এমন কি নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন অথবা শামসুর রাহমানের সাহিত্য কেউ পড়বে ? অথবা পড়লে তার অর্থ সবটা বুঝতে পারবে ?

(*প্রথম আলো*, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬)

২৬

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: গৌরব ও বাস্তব

বাঙালি চরিত্রের মস্ত একটা বৈশিষ্ট্য: ঘরে বসে অসার অহঙ্কার করা। শুনে যতোই খারাপ লাগুক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নিয়ে আমাদের গর্বও আসলে এমনি একটা অসার অহঙ্কার। কারণ, এই দিবসের সঙ্গে বাংলা ভাষার বলতে গেলে কোনো যোগ নেই। জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা-সংস্কৃতি সংস্থা— ইউনেস্কো— একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিশেবে ঘোষণা করে সত্যি সত্যি বাংলা ভাষাকে কোনো বিশেষ মর্যাদা দেয়নি। বাংলার সঙ্গে এ দিবসের একমাত্র যোগাযোগ: একুশে ফেব্রুয়ারি— এই তারিখটার। পূর্ব বাংলায় এই দিনে মাতৃভাষার দাবিতে একটা রক্তক্ষয়ী আন্দোলন হয়েছিলো, সেই ঘটনার প্রতি স্বীকৃতি জানিয়েই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিশেবে নির্বাচিত হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি— এই দিবসের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ এই পর্যন্ত।

পৃথিবীতে এখনো প্রায় সাড়ে ছ হাজার ভাষায় লোকেরা কথা বলেন। কিন্তু এর মধ্যে তিন হাজার ভাষাই প্রধান প্রধান ভাষার চাপে হারিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যার অন্তত আংশিক প্রতিকার করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে। ইউনেস্কার উদ্দেশ্য ছিলো: এ দিন যাতে পৃথিবীর সকল মানুষ মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং মাতৃভাষা যে অমূল্য সম্পদ সে কথাটা উপলব্ধি করেন। তারিখ হিশেবে যাতে একুশে ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত হয়, সে জন্যে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন ক্যানাডার দুজন কৃতী বাঙালি— রফিকুল ইসলাম এবং আবদুস সালাম।

তারপর ২০০০ সাল থেকে ইউনেস্কো প্রতি বছর এই দিনটি উদ্‌যাপন করে আসছে। এই উপলক্ষে প্রতি বছর একটি করে পোস্টার প্রকাশ করে ইউনেস্কো। তা ছাড়া, এই প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে একটি বাণীও দেওয়া হয়। ২০০২ সালের পোস্টারটি ছিলো ভাষার বৈচিত্র্য সম্পর্কে। এই পোস্টারে নানা ভাষার হরফ ছিলো। কিন্তু তাতে কোনো বাংলা হরফ ছিলো না। এই প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক প্রতি বছর যে-বাণী প্রদান করেন, তা করেন ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, চীনা এবং রুশ ভাষায়। এমন কি, আরবি ভাষাতেও এ বাণী প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা— বাংলায় একবারও এই বাণী দেওয়া হয়নি। এ থেকেই বোঝা যায়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ কতো ক্ষীণ।

আমার ধারণা, খোদ বাংলাদেশেও এ দিবসটির প্রতি সত্যিকারের সম্মান দেওয়া হয় না। অথবা এ দিনটি উদ্‌যাপনের পেছনে যে-মহান উদ্দেশ্য ছিলো, তার প্রতিও

কোনো শ্রদ্ধা দেখানো হয় না। বরং এই শ্রদ্ধাবোধ আরও কমে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

ভাষা আন্দোলনের ইতিবাচক ফলগুলোর দিকে যদি নজর দিই, তা হলে প্রথমেই বলতে হয় একদিন রক্ত দিয়ে বাংলাদেশের লোকেরা নিজেদের মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা করেছিলেন। তার প্রথম ফলই হয়েছিলো বাংলা ভাষা সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানদের মনে যে-দ্বিধা এবং বিদ্বেষ ছিলো, তা দূর হয়ে যায় এবং তাঁরা বাংলা ভাষাকে নিজেদের ভাষা হিশেবে ভালোবাসতে আরম্ভ করেন। কেবল তাই নয়, নিজেদেরও তাঁরা শনাক্ত করেন বাঙালি বলে। সেই সচেতনতা থেকেই— বদরুদ্দীন উমরের ভাষায়— মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাঙালি মুসলমানরা স্বদেশে ফিরে আসেন। তা ছাড়া, এই আন্দোলনের ফলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিশেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং তার চর্চা অনেক বৃদ্ধি পায়। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ: এই আন্দোলন থেকে যে-ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে, তা-ই শেষ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দেয়। একটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা হিশেবে এখন বাংলাদেশে বাংলা ভাষার চর্চা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায় এবং এ ভাষা হয়তো পৃথিবীর ভাষা-মানচিত্রে কালে কালে বাংলাদেশের ভাষা হিশেবেই টিকে থাকবে।

সে দিক থেকে বিবেচনা করলে ভাষা আন্দোলনের অর্জন অসীম। কিন্তু এর যে কোনো নেতিবাচক ফল হয়নি, তা নয়। ভাষার সঙ্গে জাতীয়তাবাদের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। বাংলাদেশের শতকরা ৯৮ জন লোকের মাতৃভাষাই বাংলা। এ রকম এক-ভাষী জাতির মধ্যে যেমন এক ধরনের ঐক্য এবং সংহতির মনোভাব তৈরি হয়, তেমনি এই পরিবেশে সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর লোকেদের পক্ষে তাঁদের ভাষিক পরিচয় বাঁচিয়ে রাখা শক্ত হয়। তা ছাড়া, এর ফলে জন্ম নিতে পারে এক ধরনের অন্ধ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ। সে রকমের জাতীয়তাবাদের তোড়ের মুখে দেশে কেবল ভাষিক-সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর প্রতি নয়, ধর্মীয় এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতিও অসহিষ্ণুতার মনোভাব দানা বাঁধতে পারে। তাঁদের ওপর অবিচার হওয়ার আশঙ্কাও বৃদ্ধি পায়। যেমন হয়েছিলো, ধরা যাক, হিটলারের জার্মেনিতে। বাংলাদেশেও গত তিন দশকে ভাষিক এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর প্রতি অসহিষ্ণুতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁদের পরিচয়কে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

এই যে অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রতি অবজ্ঞা এবং বিদ্বেষের মনোভাব— বাংলাদেশে এটা প্রকাশ পেয়েছে নানাভাবে এবং গোড়া থেকেই। আমরা সবাই বাংলায় কথা বলি— এই চেতনার বশবর্তী হয়ে ১৯৭২ সালের সংবিধানে আমাদের নাগরিকত্বের নাম দেওয়া হয়েছিলো "বাঙালি"। তার মানে বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা নয়, তাঁরাও এই সংজ্ঞা অনুযায়ী নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতে বাধ্য। তা ছাড়া, স্বাধীনতার পর থেকে অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর প্রতিও সুবিচারের অভাব লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা এবং মগ-সহ অন্যান্য আদিবাসীরা আমাদের বাঙালি

জাতীয়তাবাদের শিকার হয়েছেন। সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে পড়লাম, কিভাবে খাসিয়াদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। এই অত্যাচারের শিকার সকল খাসিয়া, তবে বিশেষ করে খাসিয়া মেয়েরা। স্বাধীনতার পর থেকেই চাকমা-অঞ্চলের একটা বড়ো অংশ বাংলাভাষীরা দখল করে নিয়েছেন। কেবল তাই নয়, সরকারী কাজেকর্মে বাংলার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ায় শিক্ষা, চাকরিবাকরি ইত্যাদিতেও তাঁরা দেশের নাগরিক হিশেবে নিজেদের ন্যায্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন।

বাংলাদেশে তিরিশটিরও বেশি আদিবাসী গোষ্ঠী আছে। এসব গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলেন। নিচের পীঠিকা থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংখ্যা দেখা যাবে।

আদিবাসী ভাষার নাম	ভাষাভাষীর সংখ্যা
চাকমা	২৫২,২৫৮
সাঁওতালী	২০২,১৬২
মার্মা	১৫৭, ৩০১
ওরাওঁ	প্রায় ১০০,০০০
তিপরা	৭৯,৭৭২
গারো	৬৪,২৮০
হাজং	৫০,০০০
মনিপুরী	২৪,৮৮২
মুরোং	২২,১৭৮
মুণ্ডা	১৭,৫০০
রাখাইন	১৬,৯৩২
মালপাহাড়ী	৯,০০০
মালো, গাঞ্জু, খাসিয়া ইত্যাদি	৫০,০০০

উপরের পীঠিকায় যে-সংখ্যা দেখানো হয়েছে, তা ১৯৯১ সালের লোকগণণার হিশেব অনুযায়ী। তখন আদিবাসীর সংখ্যা ছিলো বারো লাখ। এতো দিনে তা কুড়ি লাখে পৌঁছেছে বলে ধারণা করা হয়। এঁদের প্রায় শতকরা পঁচিশ ভাগ বাস করেন খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবনে। কিন্তু দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও আদিবাসীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, বিশেষ করে ময়মনসিং, সিলেট, রাজশাহী এবং রংপুরে। তা ছাড়া, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল ইত্যাদি অঞ্চলেও আদিবাসীদের দেখতে পাওয়া যায়।

আদিবাসীদের ওপর সবচেয়ে অবিচার করা হয়েছে তাঁদের ভাষা শিক্ষার প্রশ্নে। দেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিকের অধিকার তত্ত্বত সমান। কিন্তু বাংলাভাষীরা তাঁদের ভাষা শিক্ষার জন্যে যে-ধরনের আর্থিক আনুকূল্য এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা লাভ করেন, আদিবাসীরা তা পান না। এমন কি, বাংলাদেশে বিহারী নামে পরিচিত যে-জনগোষ্ঠী আছে, তাঁদেরও নিজেদের ভাষা শেখার সুযোগ নেই।

কেবল তাই নয়, এখন ঢাকায় উর্দু ভাষায় মুদ্রণের ব্যবস্থা আছে কিনা অথবা উর্দু বইপত্র পাওয়া যাবে কিনা, সে সম্পর্কেও আমি নিশ্চিত নই।

বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো গোষ্ঠী হলো চাকমাদের। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেন চাকমা ভাষায়। এ ভাষা যথেষ্ট উন্নত এবং এর নিজস্ব লিপিমালা আছে। মগ ভাষারও লিপি আছে। অথচ এই দুই ভাষায় লেখাপড়া শেখানোর কোনো ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ফলে জীবিকার প্রয়োজনে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে চাকমা এবং মগরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় বাংলাকেই প্রধান ভাষা হিশেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। চাকমাদের পরেই সবচেয়ে বড়ো ভাষাগোষ্ঠী হলো সাঁওতালী। সেদিক দিয়ে তাঁদের ভাষাও টিকে থাকার সম্ভাবনা ছিলো অনেক বেশি। কিন্তু বিরাট সংখ্যক লোক সাঁওতালী ভাষায় কথা বললেও সে ভাষা চর্চা করার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ তাঁদের নেই। নেই এ ভাষা শেখার জন্যে সরকারী কোনো সহায়তা। (যেটকু সহায়তা আছে, তা আসে খৃস্টান মিশনারিদের তরফ থেকে।) বস্তুত, সংখ্যালঘু আদিবাসীদের ভাষা সংরক্ষণের জন্যে বাংলাদেশে সরকারী কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। বরং এসব সম্প্রদায়কে বাংলা শিখতে বাধ্য করা হচ্ছে। সাঁওতালরাও তাই নিজেদের ভাষা বিসর্জন দিয়ে বাংলা শিখছেন। কয়েক দশক পরে এ ভাষার অস্তিত্ব থাকবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে কোল এবং মুণ্ডা ভাষার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। এক সময়ে মুণ্ডা ভাষা কতো ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো, তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা ভাষায় মুণ্ডা শব্দের প্রাচুর্য থেকে। অথচ সেই মুণ্ডা ভাষা এখন বাংলাদেশ থেকে লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়েছে। পারভেজ শুভর একটি গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, সাতক্ষীরার একটি অঞ্চলে মুণ্ডাভাষীরা এবং কুষ্টিয়ার মীরপুরের কোল ভাষীরা কেউই প্রায় তাঁদের নিজেদের ভাষায় কথা বলেন না। কমবয়সীরা ধীরে ধীরে নিজেদের ভাষা ভুলে যাচ্ছেন এবং লেখাপড়া শিখছেন বাংলা ভাষায়। কেবল বৃদ্ধবৃদ্ধাদের কেউ কেউ এখনো তাঁদের পুরোনো ভাষা আঁকড়ে ধরে আছেন। তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষা দুটিরও মৃত্যু হবে— অন্তত বাংলাদেশের ঐ দুটি অঞ্চলে। বেদে এবং রাজবংশীরাও এমনি আদিবাসী। তাঁদেরও নিজস্ব ভাষা ছিলো। কিন্তু তাঁরা ইতিমধ্যে সেই ভাষা ভুলে গিয়ে বর্তমানে বাংলাতেই কথা বলেন। একটা ভাষা পৃথিবী থেকে লোপ পাওয়ার অর্থ হলো মানুষের ঐশ্বর্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আংশিকভাবে বিলুপ্ত হওয়া।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেড ইণ্ডিয়ানরা অনেকগুলো ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু এসব ভাষা এখন হারিয়ে যাওয়ার পথে। তেমনি, এস্কিমোদের ভাষাগুলোও লুপ্তির পথে। ১৯৯০ সালের হিশেব থেকে দেখা যায়, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দু লাখ বিরাশি হাজার রেড ইন্ডিয়ান ১৮টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতেন। এসব ভাষাভাষীর সংখ্যা এতো

কম হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সমানাধিকারের ভিত্তিতে এসব ভাষা শেখার সুযোগ পান। তবে কালে কালে ইংরেজির চাপের মুখে এসব ভাষা লোপ যাবে— এ প্রায় ভবিষ্যৎ বাণীর মতো বলা দেওয়া যায়।

ভাষিক সংখ্যালঘুদের জন্যে ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ব্রিটেনেও যথেষ্ট রয়েছে। ওয়েলশ ভাষা একটি ছোটো ভাষা। এই ভাষাভাষীর সংখ্যা এখন ৫০৮,০৯৮। বহু বছর ধরে আস্তে আস্তে এঁদের সংখ্যা কমে যাচ্ছিলো। কিন্তু ২০০3 সালে প্রথম বারের মতো এঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দাবি করা হয়। ওয়েলশ ভাষা শিক্ষা করার খুব ভালো ব্যবস্থা আছে। এ ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। চাকরি-বাকরিতে এই ভাষা জানার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে যে-ভাষা ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, সেই ভাষাই আবার নতুন প্রাণ লাভ করতে আরম্ভ করেছে। এই ভাষার চর্চা বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে রয়েছে ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সহায়তা এবং আর্থিক পৃষ্ঠপোষণা।

একই কথা বলা যায়, ব্রিটেনের অন্যান্য ভাষিক সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে। দৃষ্টান্ত হিশেবে বাংলার কথা বলতে পারি। ব্রিটেনে বাংলাভাষীর সংখ্যা লাখ তিনেকের কিছু বেশি; হিন্দী এবং উর্দুভাষীদের তুলনায় যা অনেক কম। তা ছাড়া, বহু বাঙালি পরিবারে বাংলার কোনো চর্চা নেই। তা সত্ত্বেও স্কুলের চূড়ান্ত পরীক্ষায় বাংলাকে একটি বিষয় হিশেবে বেছে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এ রকম আরও আঠারোটি ভাষা আছে আধুনিক ভাষাসমূহের তালিকায়। (তার মধ্যে পাঞ্জাবী, হিন্দী, গুজরাটি এবং উর্দুও রয়েছে।) স্কুলের চূড়ান্ত পরীক্ষায় বাংলাকে নির্বাচন করে মাত্র হাজার দুয়েক ছাত্রছাত্রী। আর, উচ্চমাধ্যমিক এ লেভেল পরীক্ষায় অংশ নেয় মাত্র শখানেক প্রার্থী। বাংলার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এতো কম হওয়া সত্ত্বেও অনেকগুলো মাধ্যমিক স্কুলে বাংলা পড়ানো হয়। বাংলা পড়ানো এবং বাংলায় পরীক্ষা নেওয়ার জন্যে কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় হয়। কিন্তু তবু তা পড়ানো হয় এবং এ ভাষা জানলে কোনো কোনো চাকরিতে অগ্রাধিকারও দেওয়া হয়।

এ ধরনের সরকারী পৃষ্ঠপোষণা সত্ত্বেও, ইউরোপের প্রায় চল্লিশটি ভাষা এখন হারিয়ে যাওয়ার পথে। দক্ষিণ অ্যামেরিকায় লুপ্ত হতে চলেছে প্রায় পৌনে চার শো ভাষা। এক সময়ে আফ্রিকায় বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর প্রায় দু হাজার ভাষা প্রচলিত ছিলো। কিন্তু ব্যাপক উপনিবেশ গড়ে ওঠার মূল্য দিতে গিয়ে শত শত ভাষা লোপ পেয়েছে। এখন সেখানে চোদ্দো শো ভাষা টিকে আছে; তবে বেশির ভাগই নামে মাত্র। অতীতে জুলু ভাষা ছিলো দক্ষিণ আফ্রিকার একটি বড়ো ভাষা। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে যে-ভাষা, তার নাম আফ্রিকানার। এ ভাষা হলো স্থানীয় ভাষার সঙ্গে সামান্য সমন্বয়ের ফলে উপনিবেশ স্থাপনকারী ডাচদের যে-ভাষা তৈরি হয়েছে, সেই ভাষা। স্থানীয় ভাষাগুলোর বদলে ফরাসি ভাষাও প্রচলিত হয়েছে আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে। তা ছাড়া, নাইজেরিয়ার

মতো দেশে প্রচলিত হয়েছে পিজিন ইংরেজি। খোদ আফ্রিকার ভাষার মধ্যে যে-ভাষাগুলো জোরের সঙ্গে টিকে আছে, সেগুলো কোনো একটি দেশের ভাষা নয়, বরং আন্তর্জাতিক ভাষা। এগুলো হলো: আরবি, সোয়াহিলি আর হাউসা। এরা স্থানীয় ভাষাগুলোকে বিলীন করে দিয়েছে। তবে দুর্দশা সত্ত্বেও এখনো অনেকগুলো স্থানীয় ভাষা শেখার ব্যবস্থা আছে— স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সাম্প্রতিক কালে জাতীয়তাবাদের উত্থানই নয়, বিশ্বায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং নব্য-সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার লাভের ফলেও ইংরেজি, চীনা অথবা আরবির মতো আন্তর্জাতিক ভাষা ক্রমবর্ধমান মাত্রায় গুরুত্ব লাভ করছে। বাংলাদেশও এ ব্যাপারে কোনো ব্যতিক্রম নয়। সেখানে শহরের উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরা এখন বাংলার বদলে ইংরেজি শিখতে চেষ্টা করছে। এরা ইংরেজি স্কুলে লেখাপড়া করতে গিয়ে মৌখিক ইংরেজি ছাড়া সত্যিকার ইংরেজি ভাষা কতোটুকু শিখছে, তা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে; কিন্তু তারা যে বাংলা যথেষ্ট শিখছে না, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। সরকারী কর্মকর্তা-সহ বয়স্ক লোকদের মধ্যেও অনেকে যে-ভাষায় কথা বলেন, তা ভুল ইংরেজি এবং ভুল বাংলার একটা জগাখিচুড়ি।

ইসলামী সাম্রাজ্যবাদ এবং মৌলবাদ প্রসার লাভ করার ফলেও বাংলাদেশে বাংলা ভাষার চর্চা হ্রাস পাচ্ছে। একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিশেবে স্বাধীন হলেও, স্বাধীনতার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের অর্থে বাংলাদেশে মাদ্রাসার প্রসার ঘটেছে মূলধারার স্কুল-কলেজের তুলনায় অনেক বেশি। দাবি করা হয় যে, এসব মাদ্রাসায় বাংলা-ইংরেজি-বিজ্ঞান ইত্যাদিও পড়ানো হয়। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সেখানে আসলে জোর দেওয়া হয় ধ্রুপদী আরবিতে কোরান-হাদিস শিক্ষার প্রতি। এমন কি, মাদ্রাসার ছাত্ররা আধুনিক আরবিও শেখে না। চলতি আরবি তো নয়ই। কিন্তু মৃত ধ্রুপদী ভাষার বদলে জীবন্ত ভাষার চর্চা প্রাত্যহিক জীবনের জন্যে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা না-করে শিক্ষার্থীরা প্রাচীনমুখী শিক্ষা গ্রহণ করছে। এর ফলেও বাংলাদেশের তরুণদের একটা বড়ো অংশ বাংলা ভাষা ভালো করে শেখার সুযোগ পাচ্ছে না।

এমন কি, মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় যে-বাংলা শেখানো হয়, তাও যথেষ্ট নয়। যাঁরা বাংলা শেখানোর দায়িত্বে নিয়োজিত, তাঁরা নিজেরাই কথা বলেন আঞ্চলিক ভাষায় এবং আঞ্চলিক উচ্চারণে। এই শিক্ষকদের অনেকে সঠিক বানানে একটা ছোটো রচনা লিখতে পারবেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং পরীক্ষার মূল্যায়নের পদ্ধতিও খুবই পুরোনো। এমন কি, যে-সব পাঠ্যপুস্তক সরকারী উদ্যোগে লিখিত হচ্ছে, তার ভাষা এবং বানানও অস্থির। অনেক ক্ষেত্রে এই ভাষা হলো পারিভাষিক, আঞ্চলিক, অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ এবং সাধু ভাষার এক অবিশ্বাস্য মিশ্রণ। এর মধ্যে যদি কিছু দেখা যায়, তা হলে তা হলো: ভাষাকে বাংলাদেশীকরণের একটা সক্রিয় প্রয়াস।

তা ছাড়া, বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে যে-সূক্ষ্ম এবং স্থূল সাম্প্রাদয়িকতা লক্ষ্য করা যায়, তা থেকেও ছাত্রছাত্রীরা ভুল শিক্ষা পায়। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের গোড়াতেই যদি থাকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে একটি রচনা, তা হলে অমুসলমানরা সে বিষয় পড়তে কেন আগ্রহী হবে, আমি যুক্তি দিয়ে তা বুঝতে পারিনে। এমন রচনা কি থাকতে পারে না, যা সকল ধর্মাবলম্বী পড়তে পারে এবং তা পড়ে ভাষা শিখতে পারে? বাংলা ভাষার পাঠ্যবই বিশ্লেষণ করলে সন্দেহ হয়, তা ধর্ম শেখানোর বই, না ভাষা শেখানোর। এসব পাঠ্যবইয়ে যেসব গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ নির্বাচিত হয়, তা অনেক ক্ষেত্রেই নিকৃষ্ট মানের। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা কেবল যে ভালো বাংলা শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তাই নয়, বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের অমূল্য ঐহিত্য সম্পর্কেও সচেতন হতে পারে না। এসব পাঠ্য বইয়ে যে ইতিহাস বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়, তা যেমন নির্লজ্জ, তেমনি ন্যক্কারজনক। পাছে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকে, সে জন্যে বলছি: ন্যক্কারজনক শব্দটার মানে হলো— যা থেকে বমি আসে।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই। মাতৃভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ কেবল যে সুস্থ আবেগ প্রকাশের ভাষা শেখে তাই নয়, কোনো শিক্ষা কার্যকরভাবে দিতে হলে তা দেওয়া দরকার মাতৃভাষারই মাধ্যমে। তা ছাড়া, মাতৃভাষা নিয়ে যে গর্ব করতে পারে না, সে নিজের পরিচয়কেই অস্বীকার করে। আমাদের দেশের মাইকেল মধুসূদনরা নিজেরা ভুল করে এই সত্যের দৃষ্টান্তই রেখে গেছেন। এখন নতুন করে ভুল করে সত্যের অনুসন্ধান করার দরকার নেই। আমরা যদি কেবল নিজেদের ভাষাকে ভালো না-বেসে, মাতৃভাষাকেই শ্রদ্ধা জানাতে পারি, তা হলেই বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করা সার্থক হবে। তার জন্যে বাংলার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার চর্চা বৃদ্ধি করা আবশ্যিক। নয়তো, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নিয়ে আমাদের গর্ব হবে নিতান্ত ফাঁপা, অর্থহীন।

(*যুগান্তর*, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬)

২৭

ভাষার চরিত্রহানি

জর্জ বার্নার্ড শ তাঁর টাকাকড়ি রেখে গিয়েছিলেন ইংরেজি ভাষার বানান সংস্কারের জন্যে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময় চলে গেছে। তবু কেউ ইংরেজি বানান সংস্কার করেননি, অথবা করতে পারেননি। তার কারণ, ভাষার পরিবর্তন সম্পর্কে সবাই কমবেশি রক্ষণশীল। কিন্তু এ রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিবর্তন হবে— এটা না-মেনে উপায় নেই। জীবন্ত ভাষা কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে না। নিরন্তর তার মধ্যে ঘটতে থাকে পরিবর্তন। তবে বিবর্তন মাত্রই যে উন্নতি, সে কথা বলা যায় না। বাংলা ভাষায়, বিশেষ করে বাংলা গদ্যে, গত এক শো বছরে যে-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তা সত্যিকার অর্থেই যুগান্তকারী। যুগান্তকারী, কারণ এ সময়ে সাধু ভাষার যুগ শেষ হয়ে চালু হয় চলিত ভাষার যুগ। তাই বলে এই এক শতাব্দীতে বাংলা ভাষা কি কেবলই সামনের দিকে এগিয়েছে ?

বাংলা ভাষায় যুগান্তর আনায় প্রধান ভূমিকা ছিলো রবীন্দ্রনাথের। চলিত ভাষার প্রতি গোড়া থেকেই তাঁর পক্ষপাত ছিলো। একেবারে প্রথম যৌবনে ইউরোপ থেকে যে-চিঠিগুলো তিনি লিখেছিলেন প্রকাশের জন্যে, তা লিখেছিলেন চলিত ভাষায়। ছিন্নপত্রের চিঠিগুলোও। কেবল চিঠি নয়, ১৮৯০-এর দশকে তিনি *গল্পগুচ্ছের* ভাষায় ক্রিয়া-বিভক্তিগুলো সাধু ভাষায় লিখলেও, সর্বনামে পরিবর্তন আনতে আরম্ভ করেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং খ্যাতি যখন তুঙ্গে, তখন প্রমথ চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় তাঁর সব রচনাই তিনি লিখতে আরম্ভ করেন চলিত বাংলায়। পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে তাঁর এই ভাষাই প্রামাণ্য বাংলা হিশেবেই গৃহীত হয়।

রবীন্দ্রনাথ একাই ছিলেন এক শো। তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা দিয়ে তিনি যা কিছু স্পর্শ করেছেন, তাকেই নতুন জীবন দিয়েছেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্রকলা ইত্যাদি সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য নয়, এ কথা পুরোপুরি সত্য বাংলা ভাষা সম্পর্কেও। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে আমরা তাঁর ভাষায় কথা বলি, তাঁর ভাষাতে লিখি এবং তাঁর ভাষাতে চিন্তা করি। বাংলা ভাষার বিবর্তনে যদি ব্যক্তির অবদানের কথা বলতে হয়, তা হলে যে-দুজনের নাম সবার আগে মনে পড়বে তাঁরা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ। তবে সাধু ভাষার যুগ শেষ করে একেবারে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এঁরা দুজনেই ছিলেন অসামান্য শক্তির অধিকারী। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছিলেন। বহুজনের অবদানে ভাষায় যে-ধীর পরিবর্তন আসে, তাঁদের আনা পরিবর্তন সে প্রকৃতির নয়। তাঁরা বাংলা ভাষায় বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য, এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মতোন দুজন শিল্পী। তাঁদের পথ অনুসরণ করে আমরা বাংলা ভাষাকে অনেক উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। কিন্তু

বাংলা ভাষায় গত পঞ্চাশ বছরে যে-নেতৃত্ব লক্ষ্য করছি, তা মধ্যম শ্রেণীর লোকেদের। তার ফলে বাংলা ভাষা তার ঊর্ধ্বগতি অক্ষুণ্ন রাখতে পারছে কিনা, আমাদের প্রশ্ন সেটাই।

চলিত রীতির বাংলায় কেবল ক্রিয়া-বিভক্তি এবং সর্বনামগুলোই সাধু ভাষা থেকে ভিন্ন নয়। সাধু ভাষার অনেক শব্দও চলিত ভাষায় অচল। তাই সাধু ভাষার যুগ শেষ হওয়ার ফলে অসংখ্য শব্দ অপ্রচলিত শব্দ হিশেবে অব্যবহার্য হয়ে গেছে। তা ছাড়া, সাধারণভাবে বলা যায়, চলিত ভাষার চরিত্রও তরল। এই দুই লক্ষণ মিলে বাংলা ভাষার প্রকাশক্ষমতা কমেছে বলেই ধারণা হয়। সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের মতো অতুলনীয় শিল্পীর হাতে বাংলা ভাষা সরল হয়েও, তার সৌন্দর্য এবং প্রকাশক্ষমতা বজায় রাখতে পেরেছিলো। কিন্তু তাঁর পরে অসংখ্য সাধারণ লেখকের হাতে পড়ে চলিত রীতির বাংলা ভাষা অতীতের অর্জনকে ধরে রাখতে পেরেছে কিনা, তা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন করা যেতে পারে। অন্তত সাম্প্রতিক কালের বাংলা গদ্য— বিশেষ করে খবরের কাগজের গদ্য পড়ে এ কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

কলকাতার খবরের কাগজের ভাষা পড়লে, বিশেষ করে সে ভাষার পদক্রম দেখলে, ধারণা হয় যে, এলিয়ে-পড়া সেই গদ্যের কোনো মেরুদণ্ড নেই। তিনবার কাশলেন রাজ্যপাল— এটি কোনো সংবাদ-শিরোনামে আমি পড়িনি, কিন্তু বেশির ভাগ শিরোনামই এ রকম। "কোর্টে আত্মসমর্পণ করতে ফোন নেতার"— এ বাক্যটি আমার বানানো নয়, পত্রিকা থেকেই উদ্ধৃত করেছি। একবার পড়ে এর অর্থ উদ্ধার করতে হলে রীতিমতো প্রতিভার প্রয়োজন। "সরকারী গাড়িতেই বেশি দূষণ, মানলেন সুভাষ", "চাপে পড়েই দেশে ফেরার প্রস্তাব দাউদের" ইত্যাদি বাক্য অথবা অনুবাক্য দুর্বোধ্য হওয়ার কারণ পদক্রমের সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন। কাব্যে এ ধরনের পদক্রম সব সময়ই চলে। গদ্যেও বৈচিত্র্য বাড়ানোর জন্যে মাঝে-মাঝে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সেটাই বারবার ব্যবহার করলে তা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়। আচার দিয়ে খাদ্যকে আমরা সুস্বাদু করতে পারি। কিন্তু শুধু আচার খাদ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

কেবল শিরোনাম নয়, অনেক সময় বাক্যগঠনেও শৈথিল্য লক্ষ্য করি। যেমন, "কাশ্মীর সমস্যার সঙ্গে দাউদ প্রত্যর্পণের বিষয়টিকে সরাসরি যুক্ত না করলেও, সুযোগ পেলেই আন্তর্জাতিক মহলকে বিদেশ মন্ত্রক যা বোঝানোর বুঝিয়ে দিয়েছে।"— বাক্য হিশেবেই এটি ত্রুটিপূর্ণ— এর অর্থ হয় না। কিন্তু কলকাতার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলোয় এ ধরনের বাংলা লেখা হচ্ছে। আর-একটি অসাধারণ জিনিশ লক্ষ্য করি সংখ্যার সঙ্গে টা, টি, জন ইত্যাদি সংখ্যাচক বিভক্তি ব্যবহার না-করার প্রবণতা। ফলে "নিহত ৩, আহত ২", "৫ পুলিশ বরখাস্ত"-এর মতো অদ্ভুত প্রয়োগ লক্ষ্য করি। এটা ইংরেজি, বাংলা নয়। বর্তমান কলকাতার পত্রিকায় যে-ভাষা ষাটের

দশক থেকে গড়ে উঠেছে, এক কথায় বললে, তার প্রকাশক্ষমতা সীমিত। সে গদ্যের চরিত্র উচ্ছ্বাসপূর্ণ, ফেনানো, কাব্যিক। শব্দ ব্যবহারের কথা বললে তাতে ক্রমবর্ধমান হিন্দীর প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়।

কলকাতার টেলিভিশনেও এ ধরনের ভাষায় বাংলা খবর শুনতে পাই। খবরের কাগজের তুলনায় টেলিভিশনের ভাষা সাধারণত মুখের ভাষার আরও কাছাকাছি হতে পারে। কিন্তু সে ভাষাকে ক্রমশ নিম্নগামী হতে দেখে বিষণ্ন না-হয়ে পারিনে। বিলেতের টেলিভিশনে দেখতে পাই, নাট্যানুষ্ঠান অথবা সোপ অপেরায় একেবারে সাধারণ মানুষের ভাষাও ব্যবহৃত হয়। এমন কি, খবরের মধ্যেও যখন সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকার থাকে, তাতেও শোনা যায় এ ভাষা। কিন্তু মূল খবরের ভাষা হলো প্রামাণ্য চলিত ভাষা। তার উচ্চারণও প্রামাণ্য— আঞ্চলিক নয়। ডকুমেন্টারি সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। পোশাকের সঙ্গে তুলনা করে বলতে পারি, বাড়িতে লুঙ্গি পরা যায়, কিন্তু বাইরে যেতে হলে প্যান্ট-শ্যর্ট পরতে হয়। একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তার ওপর টাই না-হোক অন্তত একটা কোট চাপাতে হয়। আর চাকরির সাক্ষাৎকারে যেতে হলে স্যুট পরে যেতে হয়। খবরের ভাষা— তা লেখ্য মাধ্যম, অথবা ইলেট্রনিক মাধ্যম যাতেই হোক না কেন— তাকে খানিকটা আনুষ্ঠানিক ভাষা হতে হয়। প্রবন্ধের ভাষা হতে হয় সবচেয়ে ফর্ম্যাল। শিবনারায়ণ রায় অথবা মুনীর চৌধুরীর মতো লেখকরা প্রবন্ধের ভাষায় সেই আনুষ্ঠানিকতা অনেকটাই বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু সংবাদ মাধ্যম ভাষাকে অতি তরল করে দিয়েছে।

চলিত বাংলা প্রথম প্রচলিত হয়েছিলো কলকাতাতেই। এই বিবর্তনকে গ্রহণ করার ব্যাপারে পূর্ব বাংলা ছিলো পিছিয়ে। এখন চরিত্রহানির যুগেও কলকাতা সামনে এগিয়ে আছে, ঢাকা আছে খানিকটা পিছিয়ে। কিন্তু ঢাকা যে কলকাতাকে অনুসরণ করে একই পথে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে বিশেষ সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের শিরোনামেও সংখ্যাবাচক এবং তারিখবাচক বিভক্তি লোপ পেয়েছে। তবে ঢাকার ভাষা এখনো কলকাতার মতো অতোটা "আধুনিক" হতে পারেনি। বাংলাদেশের খবরের কাগজের ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাতে কলকাতার দোষগুলো— কাব্যিক পদক্রম, অতি-চলিত শব্দ (স্ল্যাং), সংখ্যাবাচক বিভক্তি লোপ— ইত্যাদি তুলনামূলকভাবে কম হলেও এগুলো ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। তা ছাড়া, ঢাকাই সংবাদপত্রের ভাষায় আছে সংস্কৃত ও আভিধানিক পরিভাষা, আরবি-ফারসির অত্যধিক ব্যবহার এবং আঞ্চলিক শব্দ ও প্রয়োগের ছড়াছড়ি। তবে এক কথায় বলা যায়, ঢাকার পত্রিকার ভাষা কলকাতার মতো ফেনানো নয়; তাতে সাধু ভাষার প্রভাব এখনো খানিকটা রয়ে গেছে এবং পদক্রম এখনো অতোটা এলিয়ে পড়েনি। কিন্তু ঢাকার সংবাদ মাধ্যমও কলকাতার মতো "আধুনিক" হয়ে উঠতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ— যাঁরা বাংলা গদ্যকে নির্মাণ করেছিলেন, তাঁরা দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার ছিলেন না। খবরের কাগজ পড়েও তাঁরা বাংলা শেখেননি। বরং তাঁদের ভাষা শিখেই প্রভাবিত হয়েছেন খবরের কাগজের রিপোর্টার। বস্তুত, সংবাদপত্র চিরকাল প্রামাণ্য ভাষাকে অনুসরণ করেছে— সংবাদপত্র প্রামাণ্য ভাষা গড়ে তোলেনি।

আমার আশঙ্কা হচ্ছে: লেখাপড়া থেকে আরম্ভ করে সবকিছু যখন নিম্নমুখী, তখন ভাষাও উল্টো পথে চলতে শুরু করবে। অর্থাৎ যোগ্য লেখকরা ভাষাকে নতুন পথ দেখাবেন না, বরং মাঝারি সাংবাদিক ভাষাকে অধঃপথে নিয়ে যাবেন। খবরের কাগজের এই ভাষা সব ধরনের ভাষাকেই ধীরে ধীরে প্রভাবিত করবে। খবরের কাগজের ভাষা দিয়ে নব্য ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাস লিখবেন। সংবাদপত্রের ভাষাকেই অনুসরণ করবেন শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষ। গুরুগম্ভীর শব্দ এবং সমাসবদ্ধ পদ উধাও হয়ে যাওয়ার ফলে বাংলা ভাষার যে-প্রকাশক্ষমতা, পৌরুষ এবং সৌন্দর্য ছিলো, তা হ্রাস পাবে। এলিয়ে-পড়া এবং কাব্যিক পদক্রমই প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হবে। এর দরুন সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রবন্ধের ভাষা।

খবরের কাগজী মেরুদণ্ডহীন ভাষা দিয়ে কোনো মতে একটা খবর যদি বা প্রকাশ করা যায়, একটা প্রবন্ধ, বিশেষ করে কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়ে, লেখা যায় না। আমার ধারণা, বঙ্কিমচন্দ্রের আরও কিছুকাল বেঁচে থাকা প্রয়োজন ছিলো। অতো কম বয়সে মরে গিয়ে তিনি আমাদের ভাষাকে মেরে গেছেন। তিনি যেমন বাংলায় গল্প লেখার অসাধারণ ভাষা নির্মাণ করেছিলেন; তেমনি প্রবন্ধের ভাষাও তাঁর হাত ধরেই প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলো। এমন কি, তিনি যখন তাঁর ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলো লিখেছেন, তখনো বুদ্ধিদীপ্ত ভাষাকে তরল করে ফেলেননি। স্থূলতারও আশ্রয় নেননি। বরং শব্দচাতুর্য দিয়ে পাঠকের মন রাঙিয়েছেন। প্রবন্ধের একটা ঋজু এবং দৃঢ় কাঠামোও তিনি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধে যেমন বিষয়বস্তু সম্পর্কে তথ্য এবং বিশ্লেষণ থাকতো, তেমনি তার মধ্যে দেখা যেতো তাঁর একেবারে নিজস্ব স্টাইল।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় পরিবর্তন এনেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়েও বেশি। তিনি তাকে যে-সরলতা এবং সৌন্দর্য দান করেছিলেন, সেটাই অতঃপর অন্য লেখকরা গত আশি নব্বুই বছর ধরে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তিনি সাহিত্যের অন্যান্য ধারার প্রভূত উন্নতি করলেও, আমার ধারণা, পরোক্ষভাবে প্রবন্ধ সাহিত্যকে দুর্বল করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধকে যে-কাঠামো এবং দৃঢ়তাপূর্ণ ভাষা দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে অনেকটাই দুর্বল করে ফেলেছিলেন। তাঁর চলিত রীতির গদ্য এবং ব্যক্তিগত ও কাব্যিক প্রবন্ধ লেখার স্টাইল দিয়ে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে উন্নতির পথ থেকে বিচলিত করেছিলেন। তবে অসামান্য প্রতিভাবান লেখক হিশেবে তিনি তাঁর ভাষা এবং স্টাইল দিয়ে যা পেরেছিলেন, কম ক্ষমতাশালী লেখকের জন্যে তা ছিলো

চোরাবালিতে পা দেওয়ার মতোন। বাংলা আনুষ্ঠানিক ভাষা এখন সেই চোরাবালিতেই ডুবে যাচ্ছে।

প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, কলমের ভাষাকে মুখে দিলে মুখে কালি লেগে যায়। তাঁর এ কথার মধ্যে সত্য আছে ঠিকই, কিন্তু এর পুরোটা সত্য নয়। তিনি নিজেও সত্যিকার মুখের ভাষায় লিখতে পারেননি। অথবা তিনি যে-ভাষায় লিখেছিলেন, তা সম্পূর্ণ বর্জন করে তিনি প্রতিদিন কথাবার্তা বলতে পারেননি। আসলে মানুষ এক-একটা পরিবেশে এক একটা ভাষায় কথা বলে। পরিবার-পরিজনের মধ্যে প্রতিদিন যে-কাজের ভাষা ব্যবহৃত হয়, বন্ধুদের সঙ্গে মননশীল আলোচনায় সে ভাষা চলে না। একটা খবর যা দিয়ে বলা যায়, সে ভাষায় একটা তত্ত্ব আলোচনা করা যায় না। যে-ভাষায় গল্প লেখা যায়, তা দিয়ে দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করা সম্ভব নয়।

সাম্প্রতিক কালে বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো শিল্পী আমাদের পথ দেখাচ্ছেন না। সাধারণ পাঠকও এখন আর প্রামাণ্য সাহিত্য পড়েন না। স্কুল-কলেজেও ভাষা শিক্ষার মান নিচে নেমে গেছে। সাধারণ মানুষ যা এখনো মাঝেমধ্যে পড়েন, তা হলো সংবাদপত্র। ফলে সংবাদপত্রের ভাষাকেই তাঁরা আদর্শ ভাষা হিশেবে গ্রহণ করছেন। সৎ সংবাদপত্র চিরদিনই একটা সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে। আমার বিশ্বাস, বাংলা ভাষার মান যখন লক্ষণীয়ভাবে নেমে যাচ্ছে, সেই সংকটের সময়ে সংবাদপত্রের উচিত ভাষাকে আবার খানিকটা শক্তি দেওয়া; আনুষ্ঠানিকতা দেওয়া; এবং বানানকে প্রামাণ্য রূপ দেওয়া।

(*দৈনিক স্টেটসম্যান*, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬)

২৮
স্বাধীনতার লাভ লোকসান

প্রতিদিন যেসব নতুন ঘটনা ঘটে, তার প্রতিবেদন থাকে খবরের কাগজে। সেসব ঘটনার প্রতিটি আলাদা, তাদের চরিত্রও আলাদা। কিন্তু বছর ঘুরে গেলে সেই আলাদা-আলাদা ঘটনাগুলো মিলে একটা কোলাজ তৈরি হয়। তার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে একটা সামগ্রিক প্রবণতা। সেই প্রবণতা, সেই প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করা ইতিহাসকারের কাজ। সেই সামগ্রিক ঘটনাবলীর মূল্যায়নও ইতিহাসের অংশ। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পর যাঁদের জন্ম হয়েছে, তাঁদের বয়স এখন ৩৫। আর, লড়াই করে যাঁরা দেশকে স্বাধীন করেছিলেন তাঁরা এখন বৃদ্ধ— অনেকেই মৃত। একটা মূল্যায়ন করার জন্যে সময়ের যে-দূরত্ব প্রয়োজন, তা ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে। স্বাধীনতা আসায় কি পেয়েছি, কি পাইনি— তার হিশেব খানিকটা মেলানো এখন সম্ভব। খানিকটা বলছি এই জন্যে যে, কিভাবে পাকিস্তান গড়ে উঠলো দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এবং তারপর কিভাবে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উত্থানের ফলে আবার পাকিস্তান ভেঙে গেলো, দূর থেকে তাকালে সেটা প্রায় জ্যামিতিক ধারাবাহিকতার মতো লক্ষ্য করা যায়। অপর পক্ষে, বাংলাদেশ হবার ফলে যেসব লাভ-লোকসান হয়েছে, সেগুলো এখনো অতোটা স্পষ্ট নয়, তার কারণ আমরা তারই মধ্যে এই মুহূর্তে ডুবে আছি।

স্বাধীন দেশ হিশেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশই একটা অসাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনা। তাবৎ বিশ্বে আমরা এখন বাংলাদেশ নামক একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিশেবে পরিচিত। এই স্বাধীন দেশ গড়ে ওঠার ফলে এই অঞ্চল এবং এই অঞ্চলের জনগণের উন্নতির বহু পথ খুলে গেছে— রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি— প্রতিটি ক্ষেত্রে। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা প্রায় নজিরবিহীন উন্নতি লক্ষ্য করেছি। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি আসেনি আমাদের অযোগ্যতা এবং দুর্নীতির ফলে। এমন কি, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে। মোট কথা, স্বাধীনতা থেকে যে-ফল আমরা পেয়েছি, তার সবটাই অমৃত ফল নয়, তার মধ্যে হলাহলও আছে।

স্বাধীনতা লাভের ফলে আমরা যে একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক হতে পেরেছি— এটা যেমন সবচেয়ে বড়ো লাভ; তেমনি স্বাধীনতা লাভের ফলে আমাদের পরিচয় বদলে গেছে অথবা আমাদের পরিচয় আমরা স্বেচ্ছায় বদলে নিয়েছি— এটাকে আমার মনে হয়েছে সবচেয়ে বড়ো লোকসান। আমরা বহু মূল্যের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছিলাম বাঙালি হবো বলে কিন্তু স্বাধীনতা লাভের মাত্র কয়েক বছর পরেই আমরা মুসলমান হয়েছি। এখন কেবল সাধারণ মুসলমান নয়, তালেবান হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। এই পরিণতি হবে জানলে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের প্রাণ দিতেন

কিনা, মুসলমান-অমুসলমান সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতেন কিনা, সন্দেহ হয়। জাপানের নাগরিক হতে হলে প্রথমেই প্রার্থীকে তার পুরোনো নাম বদলে একটা জাপানী নাম নিতে হয়। আত্মপরিচয়ের বিনিময়ে আত্মসম্মানবিশিষ্ট কেউ জাপানের নাগরিক হতে চাইবেন কিনা, আমার জানা নেই। কিন্তু আমি চাইবো না। আমার ধারণা মুক্তিযোদ্ধারা তালেবান রাষ্ট্র গঠনের জন্যে সংগ্রাম করতেন না। স্বাধীনতার এটা সবচেয়ে বড়ো বিষফল।

তবে ক্ষমতা দখলের খেলায় আমাদের পরিচয় পাল্টে গেলেও, রাজনৈতিক কোনো অগ্রগতিই হয়নি, তা নয়। পাকিস্তানী আমলের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছিলো ফৌজী শাসনে। গণতন্ত্র আদৌ তার শিকড় গাড়তে পারেনি সেখানকার উষর মাটিতে। সেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত জিয়াউর রহমান এবং হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ পাকিস্তানী ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে বাংলাদেশে ফৌজী একনায়কত্ব চালিয়েছিলেন প্রায় পনেরো বছর। কিন্তু এ দেশের সেনাবাহিনী যেহেতু দূর থেকে আসেনি, বরং গড়ে উঠেছে আমাদেরই আত্মীয়স্বজন দিয়ে, সে জন্যে তা আইয়ুবী নির্যাতনের চেহারা নিতে পারেনি। অথবা স্থায়ীও হতে পারেনি। সেনাবাহিনী এখনো দেশের শাসনব্যবস্থায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, গত পনেরো বছর ধরে শিশু গণতন্ত্র হাঁটি-হাঁটি পা পা করে চলতে শুরু করেছে, যদিও দলগুলো এখনো চলে নেতার মর্জিমাফিক। নেতৃত্ব গড়ে ওঠে বংশীয় ধারায়। কাজেই এ দেশের গণতন্ত্র এখনো কার্যত নির্বাচিত একনায়কত্ব। এ দেশের রাষ্ট্রপতির চাকরিও নির্ভর করে ক্ষমতাসীন দলের একজন ব্যক্তির ওপর। কোনো রাষ্ট্রপতি দলতন্ত্রের ঊর্ধ্বে উঠে খানিকটা নিরপেক্ষতার ভান করলেও তাঁর চাকরি চলে যায়। তবে এই একনায়কত্ব সত্ত্বেও কোনো নেতা সাধারণ নির্বাচনকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারছেন না। নির্বাচনের মাধ্যমেই তাঁদের ক্ষমতায় যেতে হয়। কারচুপি করে যাতে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায়, তার জন্যে তাঁদের কলকাঠি নাড়তে হয়। তা ছাড়া, যতো দুর্বল হোক গণতন্ত্র, তাকে উল্টে দিয়ে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করছে না অথবা দখল করতে পারছে না। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া গণতন্ত্র নয়, কিন্তু গণতন্ত্রের প্রথম ধাপ। সবাই যে এই পদ্ধতি মেনে নিয়েছেন— এটা নিঃসন্দেহে স্বাধীনতার একটা ইতিবাচক দিক।

এই অমূল্য রাজনৈতিক লাভ ছাড়াও প্রশাসনিক দিক দিয়েও আমাদের পরিবর্তন এসেছে। স্বাধীনতার আগে এবং তারপরের এক দশক আমাদের প্রশাসন কাঠামো এতো বিস্তৃত অথবা স্তরবিশিষ্ট ছিলো না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা এখন ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে, উপরে-নিচে ডালপালা মেলেছে। একটা জনবহুল দেশের জন্যে সেটার প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তার ফলে এখন প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে— সরকারের সবচেয়ে ধামা-ধরা সমর্থকের পক্ষেও তা বলা

অসম্ভব। বরং স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত প্রশাসনের কাছ থেকে যে-কাজ পাওয়া যেতো, এখন তার অনেকটাই পাওয়া যায় না, অথবা অতো সহজে পাওয়া যায় না। বরং স্তর বৃদ্ধির ফলে এখন কাজ সম্পন্ন হওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার গতিও হয়েছে মন্থর।

সম্পদের তালিকায় বিশ্বের তাবৎ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান একেবারে নিচের দিকে হলেও, পর পর গত পাঁচ বছর পৃথিবীর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশ সবার সেরা বিবেচিত হয়েছে। (সেরা কথাটার কী অপব্যবহার!) দুর্নীতির এই বিষাক্ত হাওয়া দেশ অথবা সমাজের একটি ক্ষুদ্র কোণে সীমাবদ্ধ থাকেনি। অফিস-আদালতের চত্বরেও নয়। তা ছড়িয়ে পড়েছে সবচেয়ে বড়ো পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে একেবারে সবার পিছে সবার নিচে যে আছে, তার মধ্যেও। সব পেশায়— সব মানুষের মধ্যে। এক সময়ে রাজনীতি ছিলো সমাজসেবার মতো, একটা মহৎ কাজ। এখন রাজনীতি মানে দুর্নীতি এবং বাহুবল। আগে চিকিৎসকের কাজ ছিলো মানুষের সেবা করা। এখন সেটা হলো মানুষের দুর্গতি ভাঙিয়ে ব্যবসা করার সর্বজন-প্রশংসিত প্রশস্ত রাজপথ। আইন রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকেরা এখন আইনের প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কেবল টাকা কামাই করার কাজে শশব্যস্ত। বাংলাদেশের পুলিশ বিভাগ সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে। অথচ আইন বলবত করা এবং দুর্নীতি দমন করাই পুলিশের কাজ। তা ছাড়া, আদালতও, বিশেষ করে নিম্ন আদালতগুলো, দুর্নীতির ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি। আর বড়ো আদালত রাজনীতির ছোবলে কালিমা-লিপ্ত হয়েছে।

প্রশাসনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি বেড়েছে দু ভাবে। প্রথমত, অফিসের বড়ো সাহেব থেকে আরম্ভ করে একেবারে অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত কেউই এখন উপরি পাওনা / অনুগ্রহ লাভ / রাজনৈতিক ফয়দা ছাড়া কোনো কাজ করেন না। মিশরে ঘুসের একটা সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি আছে। সব কাজের জন্যে সেখানে এক-একটা নির্দিষ্ট ঘুসের অঙ্ক ঠিক করা আছে। সরকারী মাশুলের সঙ্গে সেটাও দিতে হয়। দিনের শেষে অফিসের সবাই সেই ঘুস আনুপাতিক হারে ভাগ করে নেয়। কিন্তু ভালো দিক হলো এই যে, দিনের শেষে কাজটাও সম্পন্ন হয়। ফলে যার কাজ সেও সন্তুষ্ট হয়। তার কোনো অভিযোগ থাকে না। বাংলাদেশে ঘুসের এ রকম কোনো স্বীকৃত পদ্ধতিও নেই। এমন কি, ঘুস দিলেও কাজ হবে— তার কোনো নিশ্চয়তাও নেই।

দুর্নীতির দ্বিতীয় এবং সম্ভবত প্রধান কারণ: রাজনৈতিক প্রভাব। মন্ত্রী, যন্ত্রী, সন্ত্রিরা— সবাই প্রভাব খাটান। সবার হাতেই টেলিফোন। আগে টেলিফোন যখন সর্বত্রগামী ছিলো না, তখন অন্তত থানা, ইউনিয়ন ইত্যাদি পর্যায়ে কর্মকর্তাদের তোয়াজ করে অথবা টাকাপয়সা দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যেতো। কিন্তু এখন গ্রামীণ ফোনের দৌলতে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামও রাজনৈতিক প্রভাবের আওতায়

এসেছে। কেবল মন্ত্রী নন, সাংসদ, ক্ষমতাসীন দলের কর্মী, দালাল এবং চাঁদাবাজ— সবাই ফোনাফুনিতে পারদর্শী। থানায় একটা মামলা নেওয়া হবে কিনা, সেটাও সাংসদ এবং তাঁর চামচাদের মর্জির ওপর নির্ভর করে। ওদিকে প্রশাসনের অনেক কর্মচারীই যেহেতু দুর্নীতিগ্রস্ত সে জন্যে তাঁরা এই রাজনৈতিক টাউট এবং চেলাদের ফোন অগ্রাহ্য করতে পারেন না। সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না নিজেদের বিবেক-বিবেচনা অনুযায়ী। বরং যে-কর্মকর্তা রাজনৈতিক প্রভাব যতো বেশি স্বীকার করে নেন, তাঁর উন্নতি ততো দ্রুত গতিতে হয়। কেউ ভিন্ন পথে চলতে চাইলে তাঁকে ওএসডি হতে হয়। ব্যাচ-মেইটদের পেছনে পড়ে থাকতে হয়। এমন কি, ক্ষেত্রবিশেষে চাকরি হারাতে হয়। সুতরাং নিতান্ত অবিবেচক না-হলে সব কর্মকর্তা বাঁধাপথেই চলেন। বাংলাদেশে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে হয়— এটা ঐ সর্বগ্রাসী দুর্নীতিরই প্রত্যক্ষ ফলাফল। এটা স্বাধীনতার সুফল নয়, অবাঞ্ছিত কুফল। কোন্ তথাকথিত নিরপেক্ষ বিচারপতিকে দিয়ে ভোট কারচুপির পথ পরিষ্কার হবে— সেই হিশেব করে বাংলাদেশে বিচারপতির অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। দুর্নীতির এমন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করেন রাজনীতিকরা! কে বলে বাঙালিরা মেধাবী নন? উর্বর মস্তিষ্কবিশিষ্ট লোক নন ?

বাংলাদেশে যে-জিনিশটার অস্তিত্ব বলতে গেলে লোপ পেয়েছে, তা হলো আইনের শাসন। ষাটের দশকে আমরা ছিলাম ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে। তার ওপর সেই শাসনের চরিত্র ছিলো সঙিন-উঁচানো। তা সত্ত্বেও তখন দেশে আইন-আদালত ছিলো। অপরাধ হলে তার বিচার হতো। জীবন এবং মালের নিরাপত্তাও ছিলো। এমন কি, পত্রপত্রিকায় ধর্মীয় রক্ষণশীলতা-সহ নানা বিষয়ে লেখা যেতো। রক্ষণশীলতার দুর্গে হামলা চালালে অথবা সরকারের সমালোচনা করলে লোকে প্রগতিশীল বলে প্রশংসা করতো।

মানুষ খুন করেও শাস্তি না-পেতে পারে। এমন কি, প্রাণদণ্ড-প্রাপ্ত অপরাধীও বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে পারে। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীরা বহাল তবিয়তে জেলখানায় জামাই আদরে না-থাকলেও অন্তত খেয়ে-পরে বেঁচে থাকে। এর মধ্যে সাধারণ খুনী থেকে আরম্ভ করে এমন খুনীও আছে যারা দেশের নির্বাচিত সরকার-প্রধানকে হত্যা করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। আবার প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী বিদেশে অবস্থান কালেই তার দেশে ফেরার পথে লাল গালিচা বেছানোর জন্যে তার দণ্ডাদেশ রাষ্ট্রপতি মওকুফ করে দেন— এমন ঘটনাও ঘটে। কেবল তাই নয়, মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্তকে দণ্ড দিতে যে-প্রশাসন ব্যর্থ হচ্ছে, সেই একই প্রশাসন আবার চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী অথবা চরমপন্থীকে নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে হত্যা করে। এভাবে ন্যূনতম মানবাধিকার পর্যন্ত লোপ পায়।

দেশের বেশির ভাগ লোক অবশ্য খুনখারাপি নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হন ছোটোখাটো অপরাধ থেকে। তারও কোনো বিচার হয় না। বিচার হলেও ন্যায্য বিচার হয় না। ন্যায্য বিচার হলেও শাস্তি হয় না। শোনা যায়, এখন টাকা দিয়ে জামিন নিশ্চিত করা যায়। এমন কি, মামলার রায়কে প্রভাবিত করা যায়। ক্ষমতাসীন দলের হাতের পুতুল হওয়ায় উচ্চ আদালত সেই বিচারকের ক্ষমতাকে স্থগিত রাখার আদেশ দিয়েছে— এমন দৃষ্টান্ত এর আগে কোথাও স্থাপিত হয়নি। রাজনীতি দিয়ে বিচার-ব্যবস্থাকে এতো প্রভাবিত করা যাচ্ছে বলেই ক্ষমতাসীন দল বিচার-ব্যবস্থাকে প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে আলাদা করার দাবিকে নানা কৌশলে ঠেকিয়ে রাখে। আবার সেই দল বিরোধী দলে পরিণত হলে তখন বিচার-ব্যবস্থাকে স্বাধীন করার দাবি জানায়। বিচার বিভাগের এ হেনো সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উচ্চ আদালতে এখনো মাঝেমধ্যে এক-একটা স্বাধীন রায়ের কথা শোনা যায়, এমন কি সরকারের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে।

আর্থিক দিক দিয়েও বাংলাদেশ কিন্তু অনেকটা অর্জন করেছে। প্রবৃদ্ধির পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়েছে। আর ব্যক্তির কথা বিবেচনা করলে বাংলাদেশের কয়েক লাখ পরিবার রীতিমতো ধনী হয়েছে। বস্তুত, স্বাধীনতার ননী-মাখন তাঁরাই নিঃশেষে শোষণ করেছেন। তবে এ কথা বোধহয় স্বীকার করতে হবে যে, ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানও বৈদেশিক সাহায্যের কল্যাণে আগের তুলনায় খানিকটা উন্নত হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে এও স্বীকার না-করে উপায় নেই যে, এ দেশে শিল্পায়ন এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ যতোটা হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো, তার তুলনায় সামান্যই হয়েছে। এই সীমিত বিকাশের কারণ: সর্বব্যাপী দুর্নীতি, দলবাজ ট্রেড ইউনিয়ন এবং অস্থিতিশীল রাজনীতি।

ব্যবসায়ীরা চিরকালই টাকা করার ধান্ধায় ছিলেন। মানুষকে ঠকিয়ে বাড়তি মুনাফা করাই তাঁদের কাজ। কিন্তু আমাদের দেশে সৎ ব্যবসায়ীও আগে ছিলেন।

লাভ করলেও, অন্তত লোভে তাঁরা বিবেক বিসর্জন দিতেন না। অপর পক্ষে, এখনকার ব্যবসায়ী ব্যস্ত ভেজাল মেশাতে। সিন্ডিকেট করে জিনিশের দাম বেঁধে দিতে। কিভাবে কম কষ্টে রাতরাতি বড়ো লোক হওয়া যায়, ঠিকাদার থেকে আরম্ভ করে দোকানদার পর্যন্ত সবারই সেই একই স্ট্র্যাটিজি। এক কথায়, মানুষ টাকার জন্যে এখন কেবল সততা নয়, মনুষ্যত্ব এবং বিবেক ধুয়ে-মুছে ফেলে দিয়ে পাগলের মতো ছুটছে। টাকা দিয়ে এখন সবাইকেই কেনা যায়। কেবল এক-একজনের এক-একটা দাম। কারো একটু বেশি, কারো কিছু কম।

সামাজিক দিক দিয়ে আমাদের লাভ বেশি হয়েছে, নাকি লোকসান, তা অবশ্য বিতর্কের বিষয়। শিক্ষার হার লক্ষযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে— এটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পরিবর্তন। সেই সঙ্গে আর-একটা অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবর্তন হলো স্ত্রীশিক্ষার বিকাশ। যে দেশে পঞ্চাশ বছর আগেও বেশির ভাগ পরিবারে স্ত্রীশিক্ষাকে মনে করা হতো অগ্রহণযোগ্য এবং লোকাচারবিরোধী, সেই দেশে স্ত্রীশিক্ষার এই বিকাশকে অসাধারণ অগ্রগতি না-বলে উপায় নেই। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে মেয়েরা এখন ছেলেদের চেয়ে ভালো ফলাফল করছে। কিন্তু এই অগ্রগতি সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান নিচে নেমে গেছে বলেই অনেকে ধারণা করেন। এটা আদৌ ইতিবাচক নয়।

স্ত্রীশিক্ষা বিকাশের ফলে মহিলারা এখন নানা পেশার ছোটো-বড়ো নানা পদে কাজ করছেন। আগে যেখানে কয়েকটা মাত্র পেশা খোলা ছিলো মেয়েদের জন্যে, এখন সেখান প্রায় সব পেশাতেই তাঁদের দেখতে পাওয়া যায়। এবং তাঁরা এসব কাজে যোগ্যতারও পরিচয় দিয়েছেন। দুর্নীতিও তাঁদের মধ্যে পুরুষদের চেয়ে কম বলে মনে হয়। স্বাধীন উপার্জন করার ক্ষমতা লাভ করায় সমাজ এবং পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের কণ্ঠ জোরালো হয়েছে। ইউনিয়ন থেকে সংসদ পর্যন্ত সব স্তরের রাজনীতিতে তাঁদের নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে। যে-পুরুষ সমাজ এক সময়ে 'স্ত্রীবুদ্ধি' বলে মেয়েদের মননশীলতাকেই প্রশ্ন করতেন, এখন সেই পুরুষকুল নারীনেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। তাঁদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং ক্ষমতা যেমনই হোক, দেশে পর পর দুজন মহিলা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ফলে সামগ্রিকভাবে নারীনেতৃত্বের প্রতি পুরুষদের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। যে-নারীকে পুরুষরা এক কালে মেয়েমানুষ বলে হেয়জ্ঞান করতেন, সেই নারীদেরই এখন তাঁরা 'ম্যাডাম ম্যাডাম' করে তাঁদের অনুগ্রহ লাভের জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন। একে বিশেষ ইতিবাচক পরিবর্তন বলে বিবেচনা করতে হবে।

সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রেও উন্নতির অনেক লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সাহিত্য, সঙ্গীত, থিয়েটার, সিনেমা— প্রতিটি ক্ষেত্রে। স্বাধীনতা উন্নতির যে-পথ খুলে দেয়— সেই পথ ধরেই এসব বিকাশ ঘটেছে। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ঢাকায় মঞ্চ ছিলো না।

নাটকের অভিনয় ছিলো ব্যতিক্রমী ব্যাপার। এখন ঢাকায় অনেকগুলো থিয়েটার গোষ্ঠী হয়েছে। তার চেয়েও বড়ো কথা— ঢাকায় রীতিমতো উচ্চমানের অভিনয় হচ্ছে। অভিনয়ের প্রয়োজনে ভালো নাটকও লেখা হচ্ছে। এমন কি, টেলিভিশনের কল্যাণেও অনেক নাটক লেখা হচ্ছে। থিয়েটারের দিক দিয়ে ঢাকা কলকাতাকে ছাড়িয়ে না-গেলেও টেলিভিশন নাটকের দিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেছে। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত সিনেমা-শিল্প ছিলো নিতান্ত শিশুতোষ। বিশেষ করে পশ্চিবঙ্গে যেখানে সত্যজিৎ রায়ের মতো পরিচালক বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র তৈরি করছিলেন, সেখানে বাংলাদেশের সিনেমা রূপকথার জগতে বিরাজ করছিলো। কিন্তু এখন সিনেমার বিকাশ অনেকটাই ঘটেছে। তারেক মাসুদ, হুমায়ূন আহমেদ, তানভীর মোকাম্মেল প্রমুখ ভালো ছবি নির্মাণ করতে এগিয়ে এসেছেন। শ্যামল ছায়া, চন্দ্রকথা, মাটির ময়না এবং লালসালুর মতো ছবি এখন তৈরি হচ্ছে। মুখ ও মুখোশ থেকে বাংলাদেশের সিনেমা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে।

সঙ্গীতেও অনেক উন্নতি হয়েছে। এর সঙ্গে সামাজিক উন্নতিরও যোগ রয়েছে। এক সময়ে মুসলিম সমাজে গান-বাজনার চর্চা বলতে গেলে নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু এখন নিতান্ত মৌলবাদী ছাড়া সবাই গানকে মেনে নিয়েছেন। সুযোগ-সুবিধে এবং ভালো শিল্পীর সংখ্যাও অনেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সামগ্রিকভাবে সঙ্গীতের মানও উন্নত হয়েছে। এর একটা প্রমাণ এই যে, বাংলাদেশের রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, পল্লীগীতি, এমন কি, আধুনিক গান এখন পশ্চিমবাংলায়ও সমাদৃত হচ্ছে। উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে বাংলাদেশ অবশ্য এখনো পিছিয়ে আছে। তার কারণ, এই ক্ষেত্রে অতো কম সময়ের মধ্যে উন্নতি করা কঠিন। প্রসঙ্গত নাচের কথাও বলা যায়। যে-মুসলিম সমাজে গানই ছিলো ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ, সে সমাজে মেয়েদের নাচের কথা ভাবাও যেতো না। এখন শহরের শিক্ষিত পরিবারের মেয়েরা নাচতে পারে— এ কথা শুনলে বিস্ময়ে হতবাক হওয়ার কারণ থাকে না।

পাকিস্তানী আমল থেকেই সাহিত্যের উন্নতি শুরু হয়েছিলো। কিন্তু তখন প্রকাশের সুযোগ এবং শিক্ষার হার এখনকার তুলনায় অনেক কম থাকায় সে বিকাশ হয়েছিলো সীমিত পরিমাণে। এখন প্রযুক্তির উন্নতির ফলে প্রকাশনা-শিল্পে বলতে গেলে বিপ্লব ঘটে গেছে। কেবল বই নয়, পত্রপত্রিকার সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। এতো ছোটো একটা দেশে এতোগুলো দৈনিক পত্রিকা— প্রায় কল্পনাই করা যায় না। এসব পত্রপত্রিকার প্রয়োজনে নাম-করা কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার না-হলেও, কতো যে কলাম লেখক তৈরি হয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এ ধরনের বেশির ভাগ খবরের কাগুজে লেখা না-লিখলেও ক্ষতি হতো না। কিন্তু পত্রিকার ভরাট করার জন্যে লিখতে হয় এসব কলাম লেখকদের। এই প্রায় সংখ্যাহীন রচনার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই দুচারটা ভালো লেখাও প্রকাশিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে শিক্ষার মাধ্যম এবং সরকারী ভাষা যেহেতু বাংলা, সে জন্যে নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর একটা প্রধান কারণ পাঠ্যপুস্তক এবং পরিভাষা। তা ছাড়া, পত্রপত্রিকার প্রয়োজনে এখন এন্তার লেখা হচ্ছে এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে লেখা হচ্ছে। ফলে ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি না-হলেও, প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক ধারণা আগে যা ইংরেজি শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হতো, এখন তা লেখা হয় বাংলা দিয়ে, যদিও বেশির ভাগ কষ্ট করে বুঝে নিতে হয়। কতোগুলো সুন্দর শব্দও তৈরি হয়েছে। কোনো কোনো আঞ্চলিক শব্দও এখন লিখিত ভাষায় সর্বজন স্বীকৃত না-হোক, সর্বজনবোধ্য শব্দে পরিণত হয়েছে। কোনো কোনো শব্দের অর্থ বদলে যাচ্ছে। যেমন 'জব্দ' শব্দটি। চিরকাল এর অর্থ ছিলো কাউকে বেকায়দায় ফেলা, নাজেহাল করা ইত্যাদি। কিন্তু এখন অনেক পত্রিকায় লক্ষ্য করছি এর অর্থ দাঁড়িয়েছে পুলিশ কর্তৃক কোনো কিছু আটক করা। 'বিধায়' বলে কোনো শব্দ স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত জানতাম না। কিন্তু এখন বিধায় একটি বহুলব্যবহৃত শব্দে পরিণত হয়েছে। মুখের ভাষাতেও শব্দটার ব্যবহার লক্ষ্য করেছি।

বাংলা ভাষার ব্যবহার আগের তুলনায় অনেক বাড়লেও, বেশির ভাগ শিক্ষিত লোক ভুল বানানে, ভুল ব্যাকরণে কোনো মতে নিজের মনের কথা প্রকাশ করতে পারেন। শুদ্ধ বানানে এবং শুদ্ধ ব্যাকরণে একটি চিঠি লিখতে পারেন— এমন লোকের সংখ্যা দেশে শিক্ষার হারের তুলনায় অনেক কমে গেছে। আগে গ্রাম থেকে এসে সবাই মোটামুটি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা শিখতেন। এখন কর্মকর্তা, সাংসদ, মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে শিক্ষকরা পর্যন্ত প্রামাণ্য ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা মিশিয়ে এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলেন। এমন কি, বেতার-টেলিভিশনের মতো একটা মাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময়েও তাঁরা শুদ্ধ উচ্চারণে প্রামাণ্য বাংলা বলতে পারেন না।

গত তিন দশকে মানুষের গড় আয়ু আগের তুলনায় অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। অর‍্যাল সালাইনের মতো স্পল্পমূল্যের কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বহু লোকের প্রাণ রক্ষায় সাহায্য করেছে। এমন কি, টিকা দান সম্পর্কে সচেতনতাও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধি থেকে জীবনযাত্রার মান এবং চিকিৎসা-সুযোগ বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। (এর সঙ্গে কোনো অলৌকিক শক্তির যোগাযোগ কল্পনা করার মানে নেই।) পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কেও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারের আকার কতো বড়ো হবে— সে ব্যাপারে অনেক নারী এখন তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন। এও নিঃসন্দেহে উন্নতির সূচক।

অপর পক্ষে, সমাজের দিকে আর-একটু গভীরভাবে তাকালে খুশিতে আট-খানা হবার উপায় থাকে না। এক সময়ে শিক্ষক এবং অধ্যাপকরা ছিলেন সমাজের চোখে আদর্শ মানুষ। এখন সেই আদর্শ মানুষেরা তাঁদের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে অসৎ পথে টাকা করছেন। তাঁদের অনেকে ক্লাস নেন না। যাঁরা ক্লাস নেন, তাঁরা ক্লাসে না-পড়িয়ে টিউটরিয়াল হোমে পড়ান। একটা চাকরির দায়িত্ব পুরো পালন না-করেই আর-একটা উপরি চাকরি জুটিয়ে নেন। এমন কি, পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারেও সততা পালন করেন না।

শুধু শিক্ষক-অধ্যাপক নন, সাংবাদিক, আইনজীবী, পেশাদারদের মতো বুদ্ধিজীবী বলে যে-শ্রেণী একদিন সমাজে পরিচিত ছিলো, সমাজবিবেকের কণ্ঠস্বর ছিলেন যাঁরা, তাঁরাও এখন তাঁদের বোধ এবং মননশীলতার পণ্য দিয়ে বাণিজ্য করছেন। সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব পুরোপুরি ভুলে গেছেন তাঁরা; অথবা ভুলে যাওয়ার ভান করছেন। কোনো নীতি অথবা আদর্শের প্রতি তাঁদের আনুগত্য নেই— বেশ্যার মতো তাঁদের দ্বার সবার জন্যেই অবারিত। দরদস্তুর ঠিক থাকলেই হলো। যখন দেশে দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মাত্র চার-পাঁচজন, তখন তোফাজ্জল হোসেনের মতো সাংবাদিক জেল খেটেছিলেন। তাঁর পত্রিকা নিষিদ্ধ হয়েছিলো। এখন সম্পাদকের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্যে ক্যাকুলেটর প্রয়োজন হয়, কিন্তু কোনো সম্পাদক কারারুদ্ধ হন না। খুব কম বুদ্ধিজীবীই সরকারী রক্তচক্ষুর শিকার হন। কারণ তাঁরা আপোশ করার জন্যে তৈরি থাকেন সব সময়। তাঁরা বন্দী স্ব-আরোপিত সেন্সর এবং প্রলোভনের কারাগারে।

৬০-এর দশকে বাঙালিয়ানা যখন তুঙ্গে পৌঁছেছিলো, তখন বুদ্ধিজীবীরা অনায়াসে ধর্মীয় গোঁড়ামির কঠোর সমালোচনা করতে পারতেন এবং করতেনও। সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী আন্দোলনে মানুষ রাস্তায় নামতো। আমীর হোসেন চৌধুরীর মতো মানুষ তাতে প্রাণও দিয়েছিলেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত হলেও, তখনো পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র ছিলো না। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে যে-বাংলাদেশের জন্ম, সেই বাংলাদেশ এখন কেবল মুসলমান-প্রধান দেশ নয়, কার্যত ইসলামী দেশ। অমুসলমানরা সেই দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। হিটলারের আমলের ইহুদীদের মনে করিয়ে দেন তাঁরা। সেই দেশের জন্মের বিরুদ্ধে যারা এক সময়ে অস্ত্র ধারণ করেছিলো, সেই রাজাকারদের নেতারা এখন পতাকা উড়িয়ে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। সেই রাজাকার-নেতারা এখন দেশের আইনের থেকেও ফতোয়াকে বড়ো বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। আইন-আদালত তুলে দিয়ে মসজিদ-রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানান। তার থেকেও দুঃখের বিষয়— সমগ্র বুদ্ধিজীবী সমাজ আমিনীদের সেই দর্পিত উক্তি বিনা প্রতিবাদে শুনে যান।

ধর্মের নামে এমন উগ্রবাদ বঙ্গদেশে কখনো ছিলো না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইতিহাসে দেখা গেছে ধর্মের ব্যাপারে বাঙালিরা সহনশীল। বাংলার হিন্দুধর্ম

ভারতীয় হিন্দুধর্ম থেকে আচার-উৎসবে অনেকটাই ভিন্ন। বাঙালির বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম থেকে অনেকাংশে আলাদা। আর বাংলার ইসলাম মধ্যপন্থী, গুরুমুখী— আরব দেশের ইসলাম থেকে যথেষ্ট আলাদা। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রো-ডলারের প্লাবনে ইসলামের সেই সহনশীলতা ধুয়ে-মুছে বঙ্গোপসাগরে নেমে গেছে। সেই সঙ্গে লুপ্ত হয়েছে মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই— এই চিরন্তন সত্য। এ দেশে মানুষের জন্যে ধর্ম নয়, ধর্মের জন্যে মানুষ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসার ফলে আমরা নিঃসন্দেহে কট্টরপন্থার অধীনতা গ্রহণ করেছি। স্বাধীনতার বহু লাভের মধ্যে এই আদর্শ বিসর্জন সবচেয়ে বড়ো লোকসান।

(*যুগান্তর*, ২০০৭)

২৯
শাদা-কালো

ভালো, নয়তো মন্দ— এক রকম ঢালাওভাবে আমরা অনেক সময় সব কিছুর মূল্যায়ন করি। কিন্তু পৃথিবীতে বেশির ভাগ জিনিশই হয় ভালো, নয় মন্দ নয়। বেশির ভাগ জিনিশেরই কিছুটা ভালো, কিছুটা মন্দ। কারো ভালোর পরিমাণ বেশি, কারো বা মন্দের। কারো উভয়ই প্রায় সমান। একেবারে নির্ভেজাল কুচকুচে কালো, অথবা একেবারে খাঁটি ঝকঝকে শাদা বলে কিছু নেই। বেশির ভাগটাই শাদা আর কালোর মাঝখানে— ধূসর, যা ঠিক শাদাও নয়, কালোও নয়। চাঁদও পুরো রুপোলি নয়, তারও কলঙ্ক আছে। আমরা তো পাপীতাপী— বেশির ভাগটাই আমাদের কালো, কিন্তু মহামানবদের দিকে একটু ভালো করে তাকালেও দেখতে পাবেন, তাঁদেরও সীমাবদ্ধতা ছিলো। তাঁদের চরিত্রেও ছিলো কালিমার দাগ। সেটা যারা দেখতে পায় না, তারা সেই মহামানবদের ভক্ত নয়, অন্ধ ভক্ত।

বাঙালিদের চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই অন্ধত্ব। তাঁরা সব ব্যাপারেই খুব জোরালো মনোভাব পোষণ করেন। যাকে ভালো বলেন, তাঁর সবকিছু ভালো। তাঁর চোদ্দো পুরুষ ভালো। যাকে খারাপ বলেন, তারও চোদ্দো পুরুষ খারাপ। কেবল তাই নয়, তাঁরা যাকে খারাপ বলে মনে করেন, আপনারও তাকে খারাপ বলে মেনে নিতে হবে। যতোক্ষণ আপনি তা না-নিচ্ছেন, ততোক্ষণ তাঁরা আপনার "ভ্রান্তধারণা" ভাঙানোর জন্যে জোর চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। একটা উদাহরণ দিতে পারি। অতীতে যাঁরা বাঙালিদের শাসন করেছেন এবং যাঁদের সামনে তাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী মোশায়েবি করেছেন, সেই শাসকদের নিন্দায় তাঁরা এখন পঞ্চমুখ। এমনভাবে তাঁরা নিন্দা করবেন যে, অতীতের সব খারাপ জিনিশের, সব অমঙ্গলের জন্যেই তাঁরা দায়ী। কেবল তাই নয়, তাঁদের যে অসংখ্য দোষ ছাড়া কোনো গুণ ছিলো না, সে বিষয়ে বাঙালিরা একেবারে একমত হবেন। বস্তুত, তাঁদের মধ্যে উদারতার মনোভাব খুব দুর্বল।

আমাদের সাহিত্যেও এই মনোভাব জোরালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শরৎচন্দ্রের এক নায়ক আছে, যে জমিদার-নন্দন। চেহারা কার্তিকের মতো। পাড়ায় একবার মাস্তানরা এসেছিলো, সে একাই লাঠি দিয়ে তাদের লোপাট করে তাড়িয়ে দিয়েছে। খুব ভালো ছাত্র সে। আবার সে কলেজের ফুটবল-দলের ক্যাপ্টেন। ক্রিকেট দলেরও ক্যাপ্টেন। গান গায় চমৎকার। এখানে শেষ হলেও হতো। কিন্তু শরৎচন্দ্রের কল্পনাশক্তি দুর্বল ছিলো না। তাঁর নায়ক সেতারও বাজায় ভালো। অর্থাৎ সে নায়ক বলে তার সবই উৎকৃষ্ট। সবটাই তার শাদা। অপর পক্ষে, আমাদের ভিলেনরা কেবল নায়কের প্রতিপক্ষ নয়। তারা ভয়ানক গুণ্ডা। চরিত্রহীন। বর্বর। এমন কি, তাদের

চেহারাও কুৎসিত। এই যে মনোভাব, তা আধুনিক নয়, নিরপক্ষ নয়, একপেশে; কিন্তু এই মনোভাবই প্রাচীন কাল থেকে আমাদের সংস্কৃতিতে প্রবলভাবে চলে এসেছে। সে জন্যেই রাবণ কেবল রামের প্রতিপক্ষ নন, তিনি দশ মাথাওয়ালা রাক্ষস। রামের সব ভালো, রাবণের সব খারাপ।

বছর বারো আগে আমি শেখ মুজিবকে নিয়ে একটি ছোট্টো লেখা লিখেছিলাম। তাতে বলেছিলাম যে, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের জন্মদাতা। এবং নেতা হিশেবে তাঁর এমন ক্যারিজমা ছিলো যে, তিনি বাংলাদেশকে জন্ম দিয়ে তাকে ঠিকমতো লালনপালন করে বড়ো করেও তুলতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু বাংলাদেশ-বিরোধী এবং বিদ্রোহী সেপাই-এর হাতে তিনি নিহত হন বলে সে কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। আমি সেই সঙ্গে এও লিখেছিলাম যে, শেখ মুজিব প্রশাসক হিশেবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি যতো বড়ো নেতা ছিলেন, ততো বড়ো প্রশাসক ছিলেন না। আলোচনার শেষে তাঁর দেহাবশেষ রেসকোর্সে নিয়ে আসা উচিত বলে আমি লিখেছিলাম, "আপনি কবে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে আসবেন, সেই দিনের অপেক্ষায় আছি।"

আমার ধারণা, আমার সে লেখায় শেখ মুজিবের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাই আমি প্রকাশ করেছিলাম, যদিও তাতে আদৌ কোনো চাটুকারিতা ছিলো না। বরং, আমার বিবেচনায়, তাতে ছিলো শেখ মুজিবের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন। কিন্তু আমার সেই লেখা পড়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র— তার মানে সম্ভবত আমার ছাত্রের ছাত্র— আমাকে একটা চিঠি লেখেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, আমার মতো দুমুখো চামচার কোনো প্রয়োজন নেই। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলার ঘরে ঘরে লাখ লাখ মুজিব-সেনা তৈরি হচ্ছে।

আমার ওপর এই ছাত্রের রাগের কারণ, আমি কেন শেখ মুজিবের সবটাই ভালো বলতে পারিনি। তিনি যেহেতু জাতির পিতা, সুতরাং তাঁর কোনো সীমাবদ্ধতা, তাঁর কোনো খুঁত থাকবে কী করে? তিনি হবেন, সকল কালিমা-মুক্ত। দেবতার মতো। এই মনোভাবকেই আমি বলি শাদা-কালোর মনোভাব।

আরও একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি আমার নিজের পরিবার থেকে। আমার বাবা একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রধান শিক্ষক হিশেবে তাকে সবচেয়ে সফল গ্রামের স্কুলে পরিণত করেন ১৯৬০-এর দশকে। ফি বছর সে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নাম থাকতো মেধা তালিকায়। কিন্তু আমার বাবাকে তাঁর বাবা লেখাপড়া শেখাতে চাননি এবং বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন বলে তাঁকে নিজে কষ্ট করে মানুষ হতে হয়েছিলো। তিনি গর্ব করে বলতেন, তিনি দোকানদারের সহকারী হিশেবে কাজ করেছেন। অন্যের নারকেল পেড়ে দিয়ে জীবিকা উপার্জন করেছেন এবং স্কুলের বেতন দিয়েছেন। অর্থাৎ দু বেলা খাওয়া, পরা এবং লেখাপড়ার জন্যে রীতিমতো

সংগ্রাম করেছিলেন। তারপর নিজে শিক্ষিত হয়ে, তিনি শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেন সমগ্র এলাকায়। সংক্ষেপে, তিনি চাষী পরিবারের সন্তান হলেও নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং অন্যদের শিখিয়েছিলেন। তিনি স্বগঠিত মানুষ। তাঁর এ রকমের পরিচিতি দিয়ে আমি একটি প্রবন্ধ লিখি তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে। যাতে তারা তাঁর কথা জানতে পারে। বড়ো হওয়ার জন্যে উৎসাহ পায়। কিন্তু তাতে আমার একেবারে আপনজনেরা দারুণ ক্ষুদ্ধ এবং ক্রুদ্ধ হন আমার প্রতি। কারণ, আমার বাবাকে আমি খান বাহাদুর হিশেবে চিত্রিত করলাম না কেন ? তিনি যখন অতো সফল মানুষ, তখন তাঁর চোদ্দো পুরুষ সফল হবে না কেন ?

বেশির ভাগ বাঙালির মনোভাবই এ রকম। ভালো হলে তার কোনো সীমা থাকবে না। আবার খারাপ হলেও তা সীমা ছাড়িয়ে যাবে। যেমন, কেউ একটা বিষয় ভালো করে জানে না— এ কথা বোঝানোর জন্যে তাঁরা বলেন: "ও কী জানে!" কেউ অপ্রীতিকর কিছু করে থাকলে, তার সম্পর্কে বলেন: "ওর মতো বদমাশ হয় না।" (আসলে অতো ভদ্র ভাষায় নয়, একটা গাল দিয়ে বলেন। সেটা স্ত্রীর ভ্রাতাসূচক হতে পারে; এমন কি, কারো পিতৃপরিচয় ঠিক নেই, তেমন ইঙ্গিতপূর্ণও হতে পারে।) কেউ ভালো মানুষ বোঝাতে হলে, তাঁরা বলেন, "তাঁর মতো ভালো মানুষ হয় না।" অথবা "অমুক ব্যক্তি দেবতার মতো।" (দেবতাদের যে-গল্প পড়ি, তাতে তাঁদের মতো হলে, তাকে ভালো মানুষ বলা যায় কিনা, সেটা বিবেচনা করার বিষয়। উল্টো, মনে হয় দেবতাদেরই ভালো মানুষের মতো হওয়া উচিত।) মোট কথা, বাঙালিদের চোখে সব কিছুই হয় উত্তম, নয়তো অধম। মাঝারি বলে কিছু নেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কর্তাভজা নামে একটি সম্প্রদায় বঙ্গদেশের একটা অঞ্চলে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো। এখন সেই সম্প্রদায় প্রায় লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু নানা নামে আমরা এখনও কর্তার ভজনা করি, কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন করি। যিনি যখন ক্ষমতায় থাকেন, তখন তাঁরই পদসেবা করি। তাঁর অন্ধ প্রশংসায় কেবল পঞ্চমুখ নয়, রাবণের মতো দশমুখ হই। তাঁর আগে যিনি ক্ষমতায় ছিলেন তিনি তখন নিকষ-কালো ভিলেনে পরিণত হন। সাধারণ সৌজন্যও দেখাই না তাঁর প্রতি। বস্তুত, কর্তাদের সম্পর্কে আমাদের প্রশংসা এবং বিনয় প্রায় অতলান্ত সমুদ্রের মতো। কর্তা মা-বাপ, আর আমরা সবাই ...-এর বাচ্চা।

বাঙালিদের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক মনোভাবেও এই শাদা-কালোর মনোভাবকে আরও জোরদার করেছে। বেশির ভাগ বাঙালির কাছে আত্মীয়রা ধোয়া তুলসি পাতার মতো, শতকরা এক শো ভাগ পূত-পবিত্র, শাদার শাদা। অপর পক্ষে, আত্মীয়ের প্রতিপক্ষে যে-অনাত্মীয় আছেন, তাঁর মতো খারাপ মানুষ ভূভারতে নেই। কিন্তু আমি আত্মীয় বলে কাউকে খোলা চেক দিতে রাজি না, পারিও না। কারণ, আমার বিবেচনায়, আমার আত্মীয়দের কেউ কেউ ভালো, বেশির ভাগ মাঝারি আর দু-একজন নিকৃষ্ট

মানুষ। দু পায়ে হাঁটলেও অন্য জন্তুদের সঙ্গে এই শেষ শ্রেণীর বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। এভাবে দেখলে জগৎ এবং জীবনকে মোটামুটি নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব। রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়েছে বলে তার মধ্যে কোনো খাদ থাকতেই পারে না; আর আবু জাফর গান রচনা করে থাকলে— ও আবার কী লিখবে— আগে থেকে এ ধারণা করা ঠিক নয়। বস্তুত, জগৎ এবং জীবনকে নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে সঠিকভাবে দেখতে হলে ঐ মাঝারি— ঐ ধূসর রঙটা ভালো করে দেখার ক্ষমতা দরকার। আমাদের চরিত্রেই সেই ক্ষমতারই অভাব।

(*যুগান্তর*, ২০০৬)

৩০

প্রেমের প্রাদুর্ভাব ও প্রতিকার

প্রস্তাবনা

ভালোবাসা নামক রোগে আক্রান্ত হয়েন নাই, এমন ব্যক্তি ত্রিভুবনে আছেন কিনা, তাহা লইয়া বিতর্ক থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু ইহা যে সুমরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বের আকাশে, বাতাসে, অন্তরীক্ষে ইথার তরঙ্গের মতো বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাশূন্যেও বিচরণ করিতেছে কিনা, তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে অসম্ভব নহে। ইহার ফাঁদ সর্বত্র পাতা আছে— কে কোথায় ধরা পড়ে, কেহই জানে না। সৌভাগ্যক্রমে শিশু এবং বৃদ্ধ — যাহাদের রোগ প্রতিরোধক শক্তি সীমিত, তাহারা সাধারণত এই রোগে আক্রান্ত হয় না। তবে ভীমরতি নামক উপব্যাধি থাকিলে বৃদ্ধরাও এই পীড়ার শিকার হইতে পারেন। এবং বার্ধক্যে এই রোগ দেখা দিলে বেশি বয়সের হাম রোগের আক্রমণের মতো— তাহা নিদারুণ হইয়া থাকে। মোট কথা, এই ভয়ানক ব্যায়রাম বিশ্বের আনাচে-কানাচে মহামারীর আকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, সিনেটর-প্রেসিডেন্ট, ক্রেতা-বিক্রেতা, মেথর-মুচি— কেহই ইহার আকস্মিক হামলা হইতে রেহাই পাইয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। পাইলে নিশ্চয় গিনিস বুক অব রেকর্ডসে তাহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিত।

একটি-দুটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা আরও হৃদয়গ্রাহ্য হইতে পারে। দীর্ঘ কাল আগে নহে: মার্কিন মুল্লুকের রাষ্ট্রপতি কিল্টন মহাশয় এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। প্রেমের অমৃত তুলিবার জন্য পুরুষরা যেসব অস্ত্র ব্যবহার করে, তিনি তাহার অধিক— দুর্মূল্য সিগার পর্যন্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি লেজে-গোবরে হইয়াছিলেন। ব্রিটেনের এক রাজাও এই রোগাক্রান্ত হইয়া বাদশাহী ছাড়িয়া আজীবন এক বিধবার পদসেবা করিয়াছিলেন। বস্তুত, এই রোগের প্রকোপে এতদ্রূপ পদস্খলনের ঘটনা প্রায়শ শ্রুতিগোচর হয়।

অবাক হইতে হয় যে, এই রোগের ফলে অনেকের সাড়ে সর্বনাশ হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা ইহাকে ভালো বাসা অর্থাৎ ভালো অনুভব করা বলিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ নামক একজন বাঙ্গালি কবি তাঁহার তরুণ বয়সে এই কথাটির মৃদু প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভালোবাসা এমন যন্ত্রণাদায়ক, তাহা সত্ত্বেও লোকে কেন ইহাকে ভালোবাসা বলে! কিন্তু তাঁহার এই প্রতিবাদ আন্তরিক ছিলো বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কারণ পরবর্তী কালে তিনি আবার "ভালোবাসা ভালোবাসা" বলিয়া গলা ফাটাইয়া এন্তার গান করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে, প্রেমের পীড়ায় পিষ্ট হইয়া দারুণ ক্লেশ

হইলেও ভিতরে ভিতরে হৃদয়ে ইহা এক প্রকার সুখের সুড়সুড়ি দিয়া থাকে। সেই কারণে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও জানিয়া-শুনিয়াও এই বিষ পান করিবার ব্যাপারে প্রবল আপত্তি করেন না। বিষপান করিয়া তাহা লইয়া আবার ইনাইয়া-বিনায়াই গান করেন।

সমস্যার তীব্রতা ও ব্যাপ্তি

মোদ্দা কথা, সমস্যাটি ব্যাপক এবং ভয়াবহ। তাবৎ বিশ্ব এই ব্যাধির খপ্পরে পড়িয়া আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছে। অনেকে মাথায় হাত দিয়া হাহাকার করিতেছে। মলিন বিষণ্ণ মুখে ফ্যা ফ্যা করিয়া আকাশের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া কি যেন খুঁজিতেছে। নৈশকালে শয্যায় ছটফট করিতেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই রোগের কোনো কার্যকর চিকিৎসা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। বসন্ত, ওলাউঠা, ধনুষ্টঙ্কার, এমন কি কোনো কোনো কর্কট রোগেরও টিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রেমরোগ ঠেকাইয়া রাখিবার কোনো টিকা অদ্যাবধি উদ্ভাবিত হয় নাই। মনে হয়, বৈজ্ঞানিকদের সেই রূপ টিকা আবিষ্কার করিবার সত্যিকার সদিচ্ছাও নাই। তাজ্জব হইতে হয় এই ভাবিয়া যে, কুকুর-বিড়ালের মতো ইতর প্রাণীর রোগ নিরাময়ের জন্য গবেষণার এক শেষ হয়, অথবা শত শত কোটি মুদ্রা ব্যয়ে পুরুষত্বহীনতার ঔষধ আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত গবেষণা হইতেছে। কিন্তু যে-প্রেম রোগে আক্রান্ত হইয়া পুরুষত্বহীনতার বিষয়ে বীর পুরুষরা বিশেষ সচেতেন হইয়া উঠেন, খোদ সেই রোগ হইতে যাহাতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহা লইয়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয় না।

এমন কি, এই রোগের হেতু কি এবং ইহা কিভাবে বিস্তার লাভ করে তাহা লইয়াও এ যাবৎ সর্বজনস্বীকৃত কোনো মতবাদ বা থিওরি প্রচলিত নাই। ভূত তাড়াইবার, পরীক্ষা পাশের, শত্রুর ক্ষতি করিবার তাবিজ এবং মাদুলি— ধর্মব্যবসায়ীদের দক্ষিণা দিলে সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রেমরোগ আরোগ্য করিবার মতো কোনো তাবিজ অথবা মাদুলি পাওয়া যায় না। যেগুলি পাওয়া যায়, তাহা রীতিসমত উপায়ে গ্রহণ করিলেও কাহারও রোগমুক্তি হইয়াছে বলিয়া প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য অথবা নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এই নিদারুণ ব্যাধির অভিজ্ঞতা হইতে গৃহীদের তো কথাই নাই, মুনীঋষি এবং মহাপুরুষরাও— কেহই রেহাই পান নাই। কোনো কোনো মহাপুরুষের উপর ইহার প্রভাব বরং অধিক বলিয়া ধারণা হয়। বরঞ্চ ইহার কুফল হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা ভালোবাসা হইতে যোজন যোজন দূরে থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, শারীরিক প্রয়োজন হইলে সারিয়া ফেলো। অর্থাৎ পুত্রার্থে সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়া বাঞ্ছনীয়। (আধুনিকা নারীবাদীরা রাগ করিবেন না; কিন্তু মনু মহাশয়

পুত্রার্থেই লিখিয়াছেন, কন্যার্থে লেখেন নাই— আমার অপরাধ লইবেন না।) তাঁহারা এই কথাও বলিয়াছেন যে, বিবাহ না-করিলে পাতক হইতে হইবে। যাঁহারা সন্তান উৎপাদনের বিষয়ে আগ্রহ প্রদর্শন করেন না, বিধানদাতাদের মতে, তাঁহারা অতিশয় নিন্দনীয়। কেবল মনু মহাশয় নহেন, বস্তুত সকল ধর্মপ্রবর্তকই এইরূপ দৈহিক প্রক্রিয়ার বহির্ভূত কোনো মানসিক বিকারের— অর্থাৎ প্রেমের— অকুণ্ঠ নিন্দা জ্ঞাপন করিয়াছেন। অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন অধিক জমির প্রয়োজন, তেমনি অধিক সংখ্যক সন্তান জন্মদানের জন্যে অনেকগুলি গর্ভ সংগ্রহ করিবার ব্যাপারেও ধর্ম উদারভাবে অনুমতি দিয়াছে। কিন্তু প্রেম? তওবা! সাফ দিলের উপর এসব হইল শয়তানের আছর। (কোনো কোনো ধর্মে বিবাহের সর্বোচ্চ সংখ্যা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার, কোনো কোনো ধর্ম এতো উদার যে, সংখ্যা নির্ধারিত করিয়া বিবাহের মতো মহৎ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা হানি করে নাই। বরং কোনো কোনো ধর্মে অর্থ এবং দৈহিক সামর্থ্য থাকিলে যতগুলি ইচ্ছা ক্রীতদাসী সংগ্রহ করিয়াও বিনোদনের ব্যবস্থা জোরদার করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রেমরোগ হইতে সর্বদা দূরে থাকার কথা শাস্ত্রে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে কথিত হইয়াছে।)

অনেকের ধারণা, পুরুষরাই এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়েন। কিন্তু তাঁহারা কোন আক্কেলে এই উক্তি করেন, বোঝা যায় না। কারণ, কলিকালে নারীরাও এই রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায়শ বিশেষ কাবু হয়েন বলিয়া শোনা যায়। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এই রোগের প্রকোপে হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন, তাঁহারা আর কিছু না-পাইলে তাঁহাদের বস্ত্র বৈদ্যুতিক পাখার সঙ্গে কণ্ঠে প্যাঁচাইয়া আত্মহত্যা পর্যন্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু শাস্ত্রাদেশ মানিয়া নারীরা গৃহপালিত জন্তুদের মতো গৃহাভ্যন্তরে বন্দী থাকিলে এই অনাহূত ঝামেলা হইতে অনায়াসে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। (অসূর্যম্পশ্যাদের এই সব উৎপাত ছিলো না। কিন্তু সেই সুখের সত্যযুগ বহু কাল বিগত হইয়াছে।) মোট কথা, ধর্মে লিঙ্গভেদের প্রতি প্রবল জোর দেওয়া হইলেও এই রোগ লিঙ্গভেদ করে না। এই রোগ সার্বজনিক।

রোগ লক্ষণ

এই ব্যাধি হইলে মনের মধ্যে হা-হুতাশ আরম্ভ হয়। বিশেষ একজনের প্রতি অতীব আকর্ষণ ও মনোযোগ দেখা দেয়। তাহার নয়নের সহিত একবার নয়ন মিলাইতে, তাহার সহিত অর্থহীন বাক্যালাপ করিতে, তাহার মনোযোগ লাভ করিতে হৃদয় অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া, তাহার স্পর্শ লাভ করিবার জন্য (এমন কি তাহার সঙ্গে দেহ-মন অভিন্ন করিবার জন্য) হৃদয় আই-ঢাই করিতে থাকে। (জনৈক বৈষ্ণব কবি লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া এই ইচ্ছাকে প্রতি অঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গের ক্রন্দন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কথাটা অসঙ্গত নহে। ইচ্ছাটা কতকটা ঐ রকমই হয় বটে। কিন্তু তিনি মধ্যযুগে যাহা অমন অসংকোচে বলিতে পারিয়াছেন, তথাকথিত

আধুনিক রুচিবশত আমি তাহা বলা হইতে নিবৃত্ত থাকিলাম।) এই বিশেষজনটি দৃষ্টির আড়ালে গমন করিলেই হৃদয়ের অভ্যন্তরে হাহাকার আরম্ভ হয়। ইহার যথার্থ নাম বিরহ। অতিশয় কঠিন রোগ। এতই কঠিন যে, ইহার শেষ দশা হইল মৃত্যু। কিন্তু সে কথা এখানে থাকুক।

যাহার প্রতি এই অদ্ভুত এবং অহেতুক আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তাহার কোনো মন্দ দিক এই সময়ে দৃষ্টিতে আইসে না। পঙ্গু-পায়ে তাহার খোড়াইয়া চলাকেও এই সময়ে ভারতনাট্যমের মতো মনোহর মনে হইতে পারে। তাহার ত্বকের বর্ণ কৃষ্ণ হইলেও অতঃপর সেই রঙকেই বিশ্বের সর্বোত্তম রঙ বলিয়া ধারণা জন্মে। ধূসর মেঘ, ঘোলাটে জল, সবুজ পাতা— সব কিছুকেই তখন সেই রঙ বলিয়া ভ্রম হয়।

এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আচার-আচরণ এবং প্রত্যাহিক ব্যবহার এই সময়ে আমূল বদলাইয়া যায়। এই চন্দ্রে-পাওয়া ব্যক্তিরা এই সময়ে এমন এক-একটা অদ্ভুত কাজ করিয়া বসেন যাহা অন্য সময়ে কখনোই করিবার কথা ভাবিতেন না। অথবা নিদেন পক্ষে সেই কর্মকে হাস্যকর মনে হইত। বস্তুত, এই আচরণকে পাগলামি বলিলে অত্যধিক বলা হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে, এই পাগলামি যে করে, তাহার নিজের নিকট ইহাকে খুবই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

জনপ্রিয় ধারণা হইল যে, ইহা হৃদয়ঘটিত রোগ। কিন্তু হৃদরোগবিশেষজ্ঞরা ইহাকে আদৌ হৃদরোগ বলিয়া স্বীকার করেন না। কেন করেন না, তাঁহারা ভালো বুঝেন। সাধারণত এই রোগে আক্রান্ত হইলে অনেকে তাঁহাদের হৃদয়ে একটা কেমন কেমন চিনচিনে বেদনা অনুভব করেন। ফলে কখনো কখানো বুক চাপিয়া ধরেন। হৃদয়ে হামলা হইলে অর্থাৎ হার্ট অ্যাটাক হইলে যেমন কেহ চাপিয়া ধরে— তেমন। এতদ্ব্যতীত, এই রোগ হইলে মধ্যে মধ্যে হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়িয়া যায়। ইহাকে হৃদরোগের ভাষায় ট্যাকি কার্ডিয়া বলা হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন হইতে থাকে। আর প্রায়শ নিজের অনিচ্ছায় এবং অজ্ঞাতে ফোঁস ফোঁস করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িয়া থাকে। এই সব লক্ষণ হইতে সাধারণ মানুষের ধারণা হইতেই পারে যে, ইহার সহিত হৃদরোগের অন্তরঙ্গ যোগাযোগ রহিয়াছে। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞরা এই কথা স্বীকার করেন না।

অনেকে বলেন, ইহা মনের রোগ। হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞদের ইহাতে কোনো আপত্তি নাই। তবে হৃদরোগ হইলে অস্ত্রোপচার করিয়া তাহার চিকিৎসা করা যায়। মুশকিল হইল, মনটা শরীরের কোন স্থানে অবস্থিত, বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও তাহা কেহই জানে না। সুতরাং চিকিৎসকগণ প্রেমরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের দেহের সেই স্থানে খোঁচাইয়া কোনো পদার্থ বাহির করিয়া বায়প্সি করিয়া পরীক্ষা করিবেন, তাহার উপায় নাই। তাহা না-হইলে জীন-প্রযুক্তি অথবা ঐ ধরনের কোনো অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি দিয়া হয়তো ইহার কথঞ্চিৎ প্রতিকার সম্ভব হইত। হৃৎপিণ্ডের অবস্থান এবং তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যাদি ডাক্তারগণ ভালো করিয়া জানেন। সেই হেতু

কাটাকুটি করিয়া তাঁহারা ব্যর্থ অথবা আংশিক বিগলিত হৃৎপিণ্ডকে মেরামত করিতে পারেন। কিন্তু মনের অবস্থান না-জানায় শৈল্যচিকিৎসার দ্বারা প্রেমরোগ ভালো করিবার কোনো পন্থা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, হৃদয়ের নয়, এই রোগ প্রকৃত পক্ষে মস্তিষ্কের। কারণ, মানুষ মস্তিষ্কের সাহায্যেই প্রেমিক/প্রেমিকার ধ্যান করিয়া থাকে। এই ব্যাধিকে অতএব অনেকে মস্তিষ্ক বিকার বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা কমবেশি পাগল। ইলেক্ট্রিক শক দিয়া পাগলামির চিকিৎসা অনেক সময় সাফল্যের সঙ্গে হইয়া থাকে। কিন্তু প্রেমরোগ হইয়াছে চিকিৎসকগণ এই রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে সেই পাগলকে ইলেক্ট্রিক শক দিবার বিধান দেন না। বরং অভিভাবকরা প্রচণ্ড ধমক দিলে অথবা প্রেমিক/প্রেমিকা বিশ্বাসঘাতকতা করিলে এই বিকার প্রশমিত হয়।

অনেকে বলেন, এই রোগ এক প্রকারের জ্বর। শরীরের কোনো স্থানে কোনো বিকার ঘটিলে, সংক্রামক রোগ হইলে অথবা ভাইরাসের আক্রমণ হইলে যেমন দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, প্রেম রোগে আক্রান্ত হইলে তেমনি মনের উত্তাপ বাড়িয়া যায়। মুশকিল হইলো: জ্বর হইলে তাপ-কাঠি দিয়া উত্তাপের পরিমাপ করা যায়। কিন্তু প্রেমজ্বর হইলে তাহা মাপিবার মতো কোনো থার্মোমিটার অদ্যাবধি বাজারে ছাড়া পায় নাই। আবিকৃত হইয়াছে বলিয়াও শোনা যায় নাই। তাহা ছাড়া, সাধারণ জ্বর প্যারাসিটামলে দ্রুত কমিয়া যায়, কিন্তু প্রেমজ্বরের তেমন কোনো বটিকা নাই। রোগাক্রান্তের মস্তকে ঘটি ঘটি জল ঢালিলেও এই জ্বরের উপশম হয় না। অবশ্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গাধার পৃষ্ঠে চড়াইলে ক্ষেত্র বিশেষে কিছু উপকার জন্মে। কিন্তু ইহা পরীক্ষিত সত্য নহে।

মোট কথা, মর্মঘাতী এবং ক্রমবর্ধমান প্রেমরোগের সফল অথবা ব্যর্থ— কোনো রকম চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নাই। অতএব, এই ব্যাধির ব্যাপারে ঔষধের কোম্পানিগুলির কি অধিকতর সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে? এই পীড়ার জুতসই একটি বটিকা— এমন কি, তিক্ত স্বাদের কোনো তরল মিকশ্চার বাহির হইলেও তাহা যে লোকে লাইন লাগাইয়া কিনিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহের তেমন অবকাশ আছে বলিয়া সমাজসচেতন কোনো ব্যক্তিই মনে করিবেন না। কারণ, প্রেমে পড়িলে তাহাকে বেশ কষ্টকর অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে হয়। অনেক সময়ে রীতিমতো হৃদয়বিদারক বলিয়াও মনে হইতে পারে। অতএব এই রোগের ঔষধ যতোই তিক্ত হউক, যতোই দুর্মূল্য হউক, যতোই দুর্লভ হউক, লোকে তাহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টার ত্রুটি রাখিবে না। কিন্তু গলদ একেবারে গোড়ায়। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ভেজস কোম্পানিগুলি এই রূপ একটি ঔষধ আবিষ্কারের নিমিত্ত উদ্যোগী হইবার কোনো লক্ষণ দেখাইতেছে না। আমার বিবেচনায় সকলে মিলিয়া এখন মাননীয় গবর্নমেন্টের দরবারে দরখাস্ত দিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। কিন্তু একমাত্র আমার

বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে না-পারিলে এই বিষয় বিবেচনা করিবার নিমিত্তে অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় নাগরিক কমিটি গঠন করা হউক— এই বিষয়ে স্বদেশ হিতৈষীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: কোন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গভর্ণমেন্ট বাহাদুর প্রেমের প্রতিকারের নিমিত্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন, তাহা কবে বাস্তবায়িত হইবে এবং সাংসদ মহোদয় ও তাঁহাদের তাবেদারগণ ঐ অর্থের কতোটা অনর্থ করিবেন এবং তাহার ফলে প্রেম-ব্যাধির সম্ভাব্য ঔষধ কতোটা কার্যকর হইবে, তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। ইতিমধ্যে এই রোগে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিতেছে। তাহাদের কি বলিয়া সান্ত্বনা দেওয়া হইবে? ভাবিয়া আমি কোনো কূলকিনারা দেখিতেছি না। কি করিব? কি বলিব? ইতিবাচক একমাত্র যাহা মনে পড়িতেছে, তা অতি প্রাচীন কালের এক বিখ্যাত কবির উক্তি। ইহা একটি প্রাকৃত ভাষার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই কবির উক্তিই একমাত্র ভরসা। প্রেমরোগ থেকে আরোগ্য লাভ করিবার পর নিজের অভিজ্ঞতা দিয়া এই কবি বলিয়াছেন যে, প্রেম চলিয়া যায়।

পিশুনজনের জল্পনায়, হায়, প্রেম চলে যায়,
প্রণয়ের কোমল কুসুম যায় ঝরে
অদর্শন প্রখর খরায়,
অতিদর্শনের বন্যা এসে
প্রেমের প্রবীণ বৃক্ষ তাকেও উপড়ায়—
এমন কি, একেবারে অকারণে প্রণয়ের মহীরুহ কুপোকাত হয়।)

(*প্রথম আলো*, ২০০৭)

৩১
পাশবিক ভাষা

দাবি আদায়ের জন্যে ঘেরাও এখন একটা জনপ্রিয় পদ্ধতি। কিন্তু মানুষের কাছ থেকে পশুরাও যে এ কৌশল শিখে ফেলেছে, সেটা জানা ছিলো না। সেদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম ভালো মানুষের মতো। কোনোদিকে তাকাইনি। কারো সঙ্গে তর্কে যাইনি। এমন কি, অনিচ্ছায়ও কাউকে ধাক্কা দিইনি। রীতিমতো ভদ্রলোক। তারই মধ্যে আমাকে হঠাৎ ঘিরে ধরলো একদল পশু। আমার চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো: আমি খুব ভীতু। পালিয়ে বাঁচার শিক্ষায় বিশ্বাসী। তাই প্রথমেই দৌড় দেওয়ার কথা মনে হলো। কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম পশুরা যে-দুর্ভেদ্য দেয়াল তৈরি করেছে, তাতে পালানো অসম্ভব। তাই মুখে সাহসের হাসি ফুটিয়ে পশুদের জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার?"

চারদিক থেকে হুহুঙ্কার শোনার জন্যে তৈরি হলাম। কিন্তু মানুষের মতো সবাই মিলে তারা এক সঙ্গে হৈচৈ করে উঠলো না। তাদের মধ্য থেকে— বুঝতেই পারছেন কে হতে পারে!— হ্যাঁ, শেয়াল পণ্ডিত! সে এগিয়ে এসে কথা শুরু করলো আমার সঙ্গে। যেভাবে সে কথা বললো তাতে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। একদম মানুষের মতো নয়!— তার বক্তব্য সে পেশ করলো বিনয়ের সঙ্গে, ভদ্র ভাষায়, অনুচ্চ কণ্ঠে এবং যুক্তি দিয়ে। সে বললো, মানুষ যেভাবে উঠতে বসতে নিরীহ পশুদের চরিত্রহানি করছে, তাতে তারা আর স্থির থাকতে পারছে না। এর প্রতিকার চায় তারা। মানুষের মধ্য সবাই যে ভালো নয়, তারা তা জানে। কিন্তু খারাপ লোকেদের নিন্দা করতে গিয়ে মানুষরা পশুদের সঙ্গে তাদের কেন তুলনা করে— এটা তারা একেবারেই বুঝতে অক্ষম। কিছু বলার আগেই আমার ঘুম ভেঙে গেলো। বুঝতে পারলাম আগের দিন চিড়িয়াখানায় গিয়ে পশুদের দেখে নিশ্চয় এ কথা আমি অবচেতন মনে ভেবে থাকবো। রাতের বেলা সেটাই স্বপ্ন হয়ে ফিরে এসেছিলো আমার কাছে।

কেউ অকল্পনীয় অনাচার অথবা নির্যাতন করলে, নিন্দা করে আমরা বলি পাশবিক। অনেক সময় পশু বা জানোয়ার বলেও গাল দিই। কদিন আগে মাদ্রাসার এক শিক্ষকের অত্যাচারের একটি কাহিনী পড়লাম এক দৈনিক পত্রিকায়। দশ বছরের একটি বালিকাকে এক শোরও বেশি বেত্রাঘাত করে এই হুজুর বীরত্বের অভূতপূর্ব নজির স্থাপন করেছেন। পত্রিকা এই খবরের শিরোনাম দিয়েছে: পাশবিক। মাদ্রাসার এই শিক্ষক— যাকে অনায়াসে বলতে পারি শিক্ষককুলের কলঙ্ক— ঐ পত্রিকার মতে তিনি পশুর মতো আচরণ করেছেন। কিন্তু খবরটা পড়ার পর হুজুরের কীর্তি বর্ণনার জন্যে ঐ শব্দটাকে মোটেই প্রযোজ্য বলে মনে হলো না। কারণ কোনো পশু মানুষের সঙ্গে এমন অমানুষের মতো আচরণ করে না।

পশু শব্দটার বিশেষণ হলো পাশবিক। তার মানে পশুর মতো অথবা পশুর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। সব পশু কি খারাপ নাকি ? ধরা যাক, একটা গরু ? খারাপ ? কিন্তু পাশবিক শব্দটি যেভাবে আমরা ব্যবহার করি, তাতে পশুদের প্রতি আমাদের বিদ্বেষই প্রকাশ পায়— বর্ণবিদ্বেষের মতো। পাশবিক কথাটার কদর্থ করি আমরা। আমরা পশুর ভালো গুণগুলি বেমালুম ভুলে গিয়ে কেবল খারাপ দিকটাই বোঝাই এ শব্দ দিয়ে। এটাকে আর যা-ই বলি, মানবিক সুবিচার বলতে পারিনে। কারণ আমাদের পরিচিত অনেক পশুই আমাদের ক্ষতি করা তো দূরের কথা, আমাদের খুবই উপকার করে। তা ছাড়া, কোনো পশু কি সত্যি সত্যি মাদ্রাসার ঐ হুজুরের মতো এমন নিষ্ঠুর ? মানুষের সঙ্গে দূরের কথা, কোনো পশু কি অন্য একটা পশুর সঙ্গেও এমন নির্মম আচরণ করে? যদি করার কোনো প্রমাণ না-থাকে, তা হলে বড়ো জোর বলা যেতে পারে হুজুরের ব্যবহার অমানুষের মতো। কিন্তু এর মধ্যে পশুকে টেনে এনে পশুদের হেয় করার কোনো যুক্তি আছে ?

যে-পশুদের আমরা ঘনিষ্ঠভাবে জানি যেমন, কুকুর, বেড়াল, গরু, ছাগল, গাধা, ঘোড়া, হাতি, বানর— নিঃসন্দেহে তারা এই হুজুরের মতো দয়াহীন অথবা হিংস্র নয়। সামান্য খাদ্যের বিনিময়ে গরু, ছাগল, ঘোড়া, কুকুর ইত্যাদি মানুষের যে অশেষ উপকার করে কোনো মানুষ তা অন্য মানুষের জন্যে সাধারণত করে না। ধরুন, উট। নিজেই নিজের খাদ্য জোগাড় করে খায়। তারপর মানুষদের পিঠে করে মরুভূমি পাড়ি দেয়। যেমন, গাধা। গাধার মতো ভারবাহী এবং প্রভুভক্ত জীব অতি বিরল। কিন্তু নির্বোধ এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে আমরা গাধা বলে গাল দিই।— এটা মানুষের কেমন ন্যায়বিচারের নমুনা ঠিক বোঝা যায় না। তেমনি, যে-খচ্চর সারাদিন আমাদের আবর্জনা টেনেটেনে ক্লান্ত হয়, সেই খচ্চরকেও আমরা টেনে আনি আমাদেরই ভাই-বেরাদারদের ছোটো করার জন্যে। অতি বদমায়েশ ব্যক্তি হলে কেবল খচ্চর বলে তৃপ্তি পাইনে, বলি: তিলে খচ্চর। যে-শুয়োর আত্মত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত রেখে নিজের অতি সুস্বাদু মাংস মানুষের ভক্ষণের জন্যে রেখে যায়, সেই শুয়োর বলে গাল দিলে সেটা যে-কোনো মানুষেরই গায়ে খুব লাগে। আর, শুয়োরের বাচ্চা বললে তো কথাই নেই। বাচ্চারা স্বভাবতই সরল, নিরীহ এবং নিষ্পাপ— আচ্ছা, ভেবে দেখুন জন্তুর নামের সঙ্গে বাচ্চা কথাটা জুড়ে দিয়ে গালটাকে আরও তীব্র করে তোলা কি ঠিক?

সবচেয়ে দৃষ্টিকটূ দৃষ্টান্ত গরুর। গরু মানুষের সবচেয়ে উপকারী জন্তু— নিঃসন্দেহে। গরুর দুধ গরুকে বঞ্চিত করে মানুষ খায়। এবং সে দুধ যেমন সুস্বাদু, তেমনি পুষ্টিকর। দুধ থেকে মুখরোচক কতো খাবার তৈরি হয়! গরু দিয়ে চাষ করি। গরুর গাড়িতে চড়ি। যে-গরুর দুধ খেয়ে বড়ো হয়েছি, সেই গরু বুড়ো হলে নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করে তার মাংস খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলি। একে নির্ভেজাল নেমকহারামি না-হলেও অন্তত দুধ-হারামি না-বলে আর কী বলা যায়! এমন কি, এ হলো কৃতঘ্নতা! নয় কি ? তারপরও মানুষকে পশুর থেকে শ্রেষ্ঠ বলি কী করে ? চক্ষুলজ্জা বলে কি কোনো বস্তু নেই আমাদের ?

আমার ধারণা পশুদের প্রতি এ আমাদের এক রকমের পাশবিক মনোভাব। পাশবিক না-হোক অমানবিক নিঃসন্দেহে। তাই এই নির্যাতিত এবং শোষিত পশুদের যতো দেখি ততোই তাদের প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি জেগে ওঠে। যেমন, কুকুর। তার প্রভুভক্তির কোনো তুলনাই চলে না অন্য কিছুর সঙ্গে। তা সত্ত্বেও একজন অতি বিশ্বস্ত মানুষকে যদি বলি, তুমি ভাই কুকুরের মতো, তাতে সে খুশি না-হয়ে প্রচণ্ড রাগ করবে। সম্পর্ক রাখবে কিনা, সন্দেহ হয়! কারণ কুকুর বললে কাউকে নিতান্তই ঘৃণার সঙ্গে হেয় করা হয়। কেউ একটা কথা মেনে না-নিয়ে ক্ষুদ্ধভাবে বারবার প্রতিবাদ করলে কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করছে বলে তার নিন্দা করা হয়। আর কুকুরের অথবা কুত্তার বাচ্চা বললে একটা খুনোখুনিও হয়ে যেতে পারে। অথচ প্রভুভক্তির মাপে একজন মানুষ কখনোই সারময়-সন্তানদের মতো আন্তরিক হতে পারে না। মানুষ বরং প্রভুর প্রতি বেইমানী করে হরহামেশা। মীর জাফর অথবা মুশতাকের মতো লোকের কোনো অভাব নেই মনুষ্যকুলে। বস্তুত, মানুষ এমন অকৃতজ্ঞ এবং প্রভুবিনাশী যে, আমার ধারণা, কোনো কুকুরকে মানুষের সঙ্গে তুলনা করে গাল দিলে সে কুকুর ক্ষোভে-দুঃখে আত্মহত্যা করবে। নিদেন পক্ষে, অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে তারস্বরে প্রতিবাদ করবে। মানুষের মতো কুকুর! ছি, ছি, কুকুর-কুলাঙ্গার!

আরও একবার গরুর কথা ভাবুন। বুদ্ধিহীন হলে আমরা তাকে বোকা বলি। নির্বোধ হলে মূর্খ বলি। তবে তার চেয়েও নির্বোধ হলে সেই মানুষকে গরু অথবা বলদ বলে গাল দিই। তাতেও মন না-ভরলে তখন বলি গোমূর্খ। তা ছাড়া, একেবারে আত্মত্যাগী মানুষকে প্রশংসা না-করে বরং কলুর বদল বলে গাল দিই। এ ছাড়া, গবুচন্দ্র, গবেট ইত্যাদি বলেও আমরা মূর্খ মানুষদের বর্ণনা দিয়ে বেচারা গরুদের অপমান করি। গোয়ার এবং মূর্খ হলে তাকে অনেক সময় আমরা বলি ষাঁড়। মাথায় মগজের অভাব রয়েছে— এই অপমানজনক উক্তি করতে চাইলে আমরা সেই মগজকে গোবরের সঙ্গে তুলনা করি। বিশেষ করে ষাঁড়ের গোবর বললে আরও ছোটো করা হয়। কী অন্যায়, ভেবে দেখুন! গোবর থেকে চমৎকার সার তৈরি হয়। গোবর দিয়ে তৈরি হয় জ্বালানিও। এমন কি, কোনো কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা গোবর খেয়ে অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে। সেই বহু গুণান্বিত গোবরের এমন অবমূল্যায়ন— একে ন্যায্য বলে মনে করা শক্ত।

আরও দু-একটা জন্তুর কথা ভেবে দেখা যাক! মানুষের মধ্যে যারা দুষ্ট, তাদের আমরা বাঁদর বলে গাল দিই। চেহারা কুৎসিত হলে তাকেও আমরা বাঁদরের সঙ্গে তুলনা করে থাকি (আমার বন্ধুরা যেমন পেছনে আমাকে বলে থাকেন)! অতি অগ্রহণীয় ব্যক্তিকে উল্লুক বলে গাল দি। নিতান্ত নিরীহ বাঁদরকে এভাবে ছোটো করার কোনো অর্থ হয় না।

বাঙালিদের চোখে মেয়েদের গোল মুখ অর্থাৎ চাঁদবদন হলো সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। (কোন মানদণ্ডে— একমাত্র মূর্খরাই তা বলতে পারেন।) তাই কারো মুখ একটু লম্বা হলে অমনি তাকে ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করি। বাঙালি পুরুষদের দারুণ

আকর্ষণ মেয়েদের কালো চোখের প্রতি। (বিধাতা জানেন কেন!) তাই নিতান্ত বাজে এবং কটা চোখ হলে সেই নারীকে সামনে না-হলেও অন্তত পেছনে বিড়ালাক্ষী বলে বিদ্রূপ করি। অতি মূর্খ হলে তাকে আমরা হস্তিমূর্খ বলে গাল দিই। অথচ হাতির পিঠে চড়ে আমরা মহারাজা না-হলেও, অন্তত জমিদার হিশেবে গর্ব করি। মুরুব্বির জোরে কেউ লাফালে অর্থাৎ তেজ দেখালে তাকে ভেড়ার সঙ্গে তুলনা করি। এমন কি, কাপুরুষ বোঝাতেও ভেড়া বলি। অতি তুচ্ছ বোঝাতে হলে বলি: বেড়াল-কুকুরের মতো। কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং নির্বোধ বলে কাউকে গাল দিতে চাইলে তাকে ছাগলের সঙ্গেও তুলনা করি। রাম-ছাগল অথবা গাধা বললে ততোধিক নির্বোধ বোঝানো হয়। পাঁচজনের সঙ্গে একত্রে চললে আমরা নিন্দা করে তাকে গড্ডালিকায় গা ভাসানো বলি। মোট কথা, মানুষের যে-কোনো খারাপ দিক জ্যান্ত করে বোঝানোর জন্যে আমরা তাদের তুলনা করি উপকারী বা নিরীহ জন্তুদের সঙ্গে।

কিন্তু বাঙালি শক্তের ভক্ত। তাই উপকারী জন্তুদের নিন্দা করলেও, যেসব জন্তু হালুম করে তাদের ওপর আক্রমণ করে— যেমন বাঘ এবং সিংহ, তাদের প্রতি বাঙালিদের প্রচুর ভক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, সাহসী এবং দৃঢ় চরিত্রের লোক হলে তাকে বলা হয়, বাঘের মতো। অথবা বাঘা। বাঘা যতীন যেমন। তার চেয়েও এক কাঠি সরেস হলে, তাকে তুলনা করা হয় সিংহের সঙ্গে। এই দুই শক্তিশালী এবং নরঘাতী পশুর প্রতি তাদের ভক্তি এতো প্রবল যে, এদের নামের সঙ্গে বাচ্চা কথাটা জুড়ে দিলে সেই ব্যক্তির আরও বেশি গৌরব প্রকাশ পায়— যেমন বাঘের বাচ্চা, সিংহের বাচ্চা, সিংহশাবক। শিয়াল হালুম করে আক্রমণ করে না। আবার মানুষের ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকারও করে না। তাই শিয়াল কথাটা প্রায় নিউট্রাল। শিয়াল বলে গাল দিলে কাউকে প্রশংসা করা যায় না ঠিকই, কিন্তু খুব ছোটোও করা হয় না। কেউ বেশি চালাক অথবা কূটবুদ্ধির অধিকারী বোঝাতে হলে আমরা তাকে শিয়ালের সঙ্গে তুলনা করি। শেয়াল পণ্ডিত অথবা শেয়ালের মতো ধূর্ত বলে বর্ণনা দিই। হালুম করে আক্রমণ না-করলেও ফোঁস করে আক্রমণ করে সাপ। সাপ একটা ব্যতিক্রম। সাপকে মানুষ খুবই ভয় করে বটে, কিন্তু সাপের সঙ্গে তুলনা দিয়ে কোনো মানুষকে প্রশংসা করার রীতি নেই। বরং কেউ অপ্রত্যাশিতভাবে রাগ করে উঠলে বলি ফোঁস করে ওঠা। তেমনি অত্যন্ত খারাপ শত্রুকে বলি কালকূট। দুমুখো সাপও মানুষের চরিত্রজ্ঞাপক।

মোট কথা, বাংলা ভাষা যেমন অযৌক্তিকভাবে নারীদের ছোটো করে দেখে, নিরীহ পশুদেরও দেখে তেমনি ছোটো চোখে। বিবেকবান ব্যক্তিদের উচিত সবাই মিলে এর একটা প্রতিকার করা। এ ব্যাপারে সহায়তা ও সহযোগিতা করার জন্যে পশুক্লেশ নিবারণী সভাগুলোর কাছে আবেদন করা উচিত। সেটা যতো দ্রুত হয়, ততোই পশুদের জন্যে ভালো। আমরাও বিবেককে তা হলে সাফ রাখতে পারি।

(*যুগান্তর*, ২০০৬)

৩২
বিদ্যা ও বিশ্বাস

মনে মনে আমরা কতোগুলো জিনিশ আগে থেকেই ধরে নিই। যেমন, উচ্চশিক্ষিত একজন মানুষ ভদ্র হবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করি। একজন ধার্মিক লোক সৎ হবেন— এও আমরা আগে থেকেই ভেবে রাখি। কিন্তু কার্যকালে আমাদের ধারণা যে সব সময়ে সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী একজন লোক হয়তো অসভ্যের মতো আচরণ করেন। মস্ত উপাধিধারী একজন বিজ্ঞানী হয়তো কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন। অনেক সময়ে তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা অশিক্ষিত লোকের চেয়েও বেশি মূর্খতার পরিচয় দেন। আমরা তখন দুঃখ করে বলি— উপাধি থাকলেও অমুক লোকটি আসলে মূর্খ। এটা কী করে সম্ভব ? ছেলেবেলা (অথবা তসলিমা নাসরীনের ভাষায় মেয়েবেলা) থেকে আরম্ভ করে ষোলো-সতেরো-আঠারো (সেশন জটের ওপর নির্ভরশীল) বছর ধরে অনেক পড়ালেখা করে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মুখস্থ করে প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় (নকলের যুগে তৃতীয় শ্রেণী কি এখনো আছে?) শ্রেণীতে পাশ করে তারপর এক-একজন অশিক্ষিতের মতো আচারণ করে কী করে? অতো বছর যে গদ্যে-পদ্যে এতো শ্লোক আওড়ালো, তার কি কোনো আছরই হলো না কঠিন হৃদয়ের ওপর? এ জন্যেই ধর্মগ্রন্থে সম্ভবত বলা হয়েছে, এদের কানে (আসলে হৃদয়ে) তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরা তোতা পাখির মতো পড়া মুখস্থ করে, কিন্তু তাদের দিলে তা কোনো আঁচড় কাটে না। ডিগ্রি আর বিদ্যা আসলে ভিন্ন বস্তু। বিদ্যা আর বিশ্বাসও আলাদা।

একটা উদাহরণ দিই। অনেক বছর আগে এক শিশু-বিশেষজ্ঞের কাছে অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক বিদেশ থেকে উচ্চ উপাধি নিয়ে এসেছিলেন শিশু-চিকিৎসায়। সামান্য জ্বর এবং সেই সঙ্গে পেটের অসুখ। শিশুটির বয়স আড়াই বছর। ওষুধ দিলেন। বলেন, খাওয়ান আর আল্লাহ্ আল্লাহ্ করেন। উদ্বিগ্ন বাবা আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতেই পারি, কিন্তু সে উপদেশ ডাক্তারের কাছ থেকে প্রত্যাশা করিনি। তাঁর কাছে গিয়েছিলাম দোয়ার জন্যে নয়, দাওয়াইয়ের জন্যে। আল্লাহ্-আল্লাহ্ ছাড়াই দুদিনের মধ্যে শিশুটির পেটের অসুখ ভালো হলো। জ্বরও কমে গেলো। কিন্তু গায়ের তাপমাত্রা নেমে গেলো ৯৬ ডিগ্রিতে। বিচলিত হয়ে ডাক্তারকে ফোন করলাম। ডাক্তার বললেন, গায়ে একটু বেশি কাপড়চোপড় পেঁচিয়ে রাখুন আর আল্লাহ্ আল্লাহ্ করুন। কিন্তু ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন না। স্যালাইন দেওয়ার কথাও বললেন না। তারপর সারা রাত ধরে যমে মানুষে যে টানাটানি হলো, সে কথা এখানে অবান্তর। উচ্চশিক্ষা যে ডাক্তারকে মানুষ করতে পারেনি, সেটাই বড়ো কথা।

আমাদের দেশে শিক্ষার হার এখন আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় উচ্চশিক্ষা ছড়িয়েছে অনেক বেশি। অপরিকল্পিত শিক্ষার ফলেই দেশে এতো শিক্ষিত বেকার। এতো শিক্ষিত বেকার বলেই চারদিকে এতো চাঁদাবাজ, এতো রাজনৈতিক "নেতা-কর্মী" (অর্থাৎ টাউট), এতো হাইজ্যাকার, এতো সন্ত্রাসী। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এতো দুর্নীতি এবং অপরাধ। কয়েক মাস আগে এক ভূমি রেজিস্ট্রোরের এজলাশে যেতে হয়েছিলো কপালের ফেরে। নিজের চোখে দেখলাম অন্তত পঁচিশ জন লোকের ভিড়ের মধ্যে মহামান্য রেজিস্ট্রার সাহেব হাত বাড়িয়ে ঘুস নিলেন। এ রকমের চোখের চামড়াহীন ঘুসখোর আমি জীবনে দেখিনি। কিন্তু ভদ্রলোক এমএ পাশ। বুঝলাম, শিক্ষা তাঁর মনে সততার কোনো ছাপ এঁকে দেয়নি। সাধারণ লজ্জার মনোভাবও নয়। এর থেকে বেশ্যারও চক্ষুলজ্জা বোধ হয় বেশি থাকে।

আমাদের দেশে সর্বোচ্চ চাকুরে থেকে আরম্ভ করে চৌকিদার পর্যন্ত তাবৎ লোকই বোধ হয় কমবেশি দুর্নীতিগ্রস্ত। এখন প্রাইমারিতে চাকরি পেতে হলেও এমএ পাশ করতে হয়। কাজেই অনুমান করি চৌকিদার সাহেবও কোনো পাশ দিয়ে থাকবেন। কিন্তু এই লাখ লাখ শিক্ষিত লোকের মধ্যে নীতির, মূল্যবোধের, সততার, সত্যবাদিতার, দয়ার, দাক্ষিণ্যের, ত্যাগের কোনো অস্তিত্ব নেই। অথবা থাকলেও তাঁদের বিদ্যার তুলনায় তা এতোই কম যে, তা অনুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে দেখতে হয়।

অথচ এখন থেকে কয়েক দশক আগেও শিক্ষার সঙ্গে আদর্শবাদের একটা যোগ ছিলো। দেশের লোকেদের শিক্ষিত করবেন— এই মহান ব্রত নিয়ে একজন শিক্ষক হতেন। ছাত্রদের মধ্যে আদর্শ প্রচার করতেন। এখন প্রথমেই শিক্ষা-ব্যবসায় নামবেন বলে ঘুস দিয়ে তথাকথিত শিক্ষক চাকরি জোগাড় করেন। টিউটরিয়াল হোম খোলেন। আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে একই সঙ্গে দু-তিন দল ছাত্রছাত্রীকে পড়ান। ক্লাসে না-পড়িয়ে বাড়িতে পড়ান। নিজের ছাত্রদের প্রশ্ন বলে দেন। ছাত্রদের পরীক্ষার খেয়া পার হবার উপায় বাৎলে দেন। কিন্তু শিক্ষা দেন না। সত্য কথা বলতে শেখান না। সৎ হওয়ার আদর্শ দেখান না তাদের। সমাজসেবার আদর্শ উচ্চারণও করেন না। বরং দফায় দফায় পড়িয়ে কিভাবে শিক্ষা-বাণিজ্য করা যায় নিজেই তার জ্বলজ্যান্ত এবং অনুকরণীয় আদর্শ তুলে ধরেন শিক্ষার্থীর সামনে।

আগে সমাজসেবকরা রাজনীতিক হতেন। শিক্ষিত লোকেরা রাজনীতিক হতেন। গান্ধীজী, জিন্নাহ, নেহেরু, আবুল কালাম আজাদ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষ বসু, ফজলুল হক, শ্যামাপ্রসাদ, হরেন মুখোপাধ্যায়— সবাই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। সবাই দেশসেবা করেছেন, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে জমি-জমা কেনেননি। শিল্প-বাণিজ্যের মালিক হয়ে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেননি। বরং দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্যে তাঁরা বিখ্যাত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করেছিলেন দেশের কাজে। এমন কি, ব্যারিস্টারিও ছেড়ে দিয়েছিলেন দেশের কাজ করবেন বলে। ফজলুল হকও দয়ার

জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। হরেন মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সবার আগে ইংরেজিতে পিএইচডি করেছিলেন। তিনি জীবনযাপন করতেন অতি সাধারণ গরিব মানুষের মতো। মারা যাওয়ার সময় আঠারো লাখ টাকা দান করে যান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর হাসপাতালে। এখনও অনেক রাজনীতিক এমএ পাশ, পিএইচডি পাশ। কিন্তু রাজনীতি আর দুর্নীতি এখন প্রায় সমার্থক। যে-যতো বড়ো রাজনীতিক, তাঁর ততো প্রতিপত্তি। যতো বেশি প্রতিপত্তি, ততো বেশি দুর্নীতি। রাজনীতি মানে কোটি কোটি টাকা। রাজনীতি মানে অন্যের গলা কাটা। এখন শিক্ষার সঙ্গে আদর্শের কোনো সম্পর্ক নেই। শিক্ষা আর নীতিহীনতার এখন নিত্য সহবাস।

(*যুগান্তর*, ২০০৬)

৩৩
কতো টাকা চাই ?

লিও তলস্তয়ের একটি গল্প আছে, যার নাম: একজন মানুষের কতো জমি চাই ? পেহম নামে একজন জমিহীন লোকের খুব লোভ ছিলো জমির জন্যে। ভাগ্যক্রমে একটু একটু করে খানিকটা জমি পেয়েও গেলো সে। কিন্তু তার আরও জমি চাই। শেষে অপরিচিত একটি এলাকায় গিয়ে সে অঞ্চলের মালিকদের খুশি করে অনেক জমি পাওয়ার অঙ্গীকার পেলো সে। এই মালিকদের মোড়ল পেহমকে বললেন, ঠিক আছে, তুমি সারা দিনে যতোটা জায়গা বেড় দিয়ে আসতে পারবে, সবটাই তোমার হবে। পরের দিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা শুরু করলো সেই লোকটি— একটা টিলার মাথা থেকে। বেশ খানিকটা দূরে দূরে চিহ্ন দেওয়ার জন্যে সে সঙ্গে নিলো একটা কোদাল। অনেক লোভ তার। কখনো হেঁটে, কখনো দৌড়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেলো সে। দারুণ ক্লান্ত হয়ে সে দুপুরের পর রুটি খেলো। একটু শক্তি পেয়ে আবার চললো পুরো দমে। তারপর যখন মনে পড়লো, যেখান থেকে সে যাত্রা শুরু করেছিলো, সেখানে ফিরে যেতে না পারলে এ জায়গার একটুও তার হবে না, তখন ক্লান্ত দেহ নিয়ে সে আবার পেছনের দিকে ছুটতে আরম্ভ করলো। ও দিকে, সূর্য ধীরে ধীরে ঢলে পড়ছে দিগন্তের দিকে। লোকটিও প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। তারপর সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু যখন মিলিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখন সে ফিরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো যেখানে একটা টুপি রেখে সে যাত্রা শুরু করেছিলো ঠিক সেখানে। যে-এলাকা সে বেড় দিয়ে এসেছিলো, সেই বিস্তীর্ণ এলাকা তারই, একান্ত তারই হয়ে গেলো। ভৃত্য এসে তাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। রক্ত বমি করে সে ত্যাগ করলো তার শেষ নিশ্বাস। কোদাল দিয়ে ভৃত্য তার জন্যে ছ ফুট লম্বা একটি কবর খুঁড়লো। সেই ছোট্টো জায়গাটুকুই কাজে লাগলো পেহমের।

সত্যি আমাদের দেশে চারদিকে মানুষ যেভাবে পাগলের মতো জমি কিনছে, সৎ-অসৎ উপায়ে মানুষের গলা কেটে; বিবেক বিসর্জন দিয়ে টাকা করছে, তাতে অনেক সময়ই আমার তলস্তয়ের এই গল্পটা মনে পড়ে। কতো জমি চাই আর! কতো টাকা চাই! দশ লাখ, বিশ লাখ, পঞ্চাশ লাখ! আর কতো চাই ? ছেলেবেলায় বাবার মুখে একজনের কথা শুনেছিলাম যে, তিনি নাকি লা—খপতি। বাবার বলার মধ্যে সম্ভ্রমের চিহ্ন ছিলো, আর আমার চোখে ছিলো বিস্ময়ের দৃষ্টি। এখন লাখ টাকা খুব বেশি টাকা নয় বাংলাদেশে, ঠিকই। ধরলাম আগের লাখ টাকা এখন কোটি টাকা। এবং একজন এক কোটি টাকার কম হলে কিছুতেই নিরাপদ বোধ করতে পারছেন না। ঠিক আছে: অতএব আমাদের উচ্চাশার সীমানা এক কোটিতে বেঁধে দিচ্ছি। না, তার চেয়েও বেশি— দশ কোটিতে বাঁধছি।

কিন্তু বাস্তবে কী দেখতে পাচ্ছি? মানুষের কল্যাণের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ডাক্তার রোগীর গলা কাটছেন। অন্য ডাক্তারদের সঙ্গে সিন্ডিকেট করে সেই গলা-কাটা রোগীদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা কামাই করছেন। বালি দিয়ে বাড়ি তৈরি করে ঠিকাদার কোটি কোটি টাকা সঞ্চয় করছেন। দলের হয়ে অন্যের গলা কাটছেন রাজনৈতিক টাউট— কেবল টাকার জন্যে। চাঁদাবাজ আর সন্ত্রাসী বিনা মূলধনে কেবল পেশী দেখিয়ে কামাই করছে অঢেল অর্থ। সরকারী কর্মকর্তারা বেতনের বদলে কাজ করছেন উপরির জন্যে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সবচেয়ে ভালো ফলাফল করে সেই প্রার্থী শুল্ক বিভাগে কাজ চান, নয়তো চান আয়কর বিভাগে। কারণ সেখানেই সবচেয়ে বেশি টাকা। জ্ঞান বিতরণের কথা ভুলে গিয়ে প্রাইভেট পড়িয়ে অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তথাকথিত শিক্ষা-ব্যবসায়ী টাকা করছেন। সমাজসেবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, স্রেফ টাকা করার লক্ষ্য নিয়ে রাজনীতিতে নামছেন অসংখ্য লোক। এবং, একবার ক্ষমতায় যেতে পারলে কাড়ি কাড়ি টাকা আনেন রাজনীতির সদর রাস্তা দিয়ে।

আমাদের একজন ফৌজী রাষ্ট্রপতিকে বলা হতো যে, এতো বড়ো পৃথিবীতে তাঁর নাকি মাত্র দুটি দুর্বলতা ছিলো— নারী আর অর্থ। দুটিই নাকি তিনি বেসুমার সংগ্রহ করেছিলেন। তবে তাঁর নারীর সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তিনি যে শত শত কোটি টাকা জমিয়েছিলেন— তা নিয়ে কোনো বিতর্ক ছিলো না। তখন তাঁকে আমার প্রায় পরম পূজনীয় এক অতিমানব বলে মনে হতো। কিন্তু এখন শুনতে পাচ্ছি যে, তিনি নাকি এখনকার দেশনায়ক/নায়িকাদের তুলনায় অপোগণ্ড মাত্র। নাক টিপলে দুধ বের হয়।

এসব দেখে-শুনে সবাই এখন এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, রাজনীতির মতো লাভজনক ব্যবসা আর নেই। এমন কি, আপনি যদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারেন, তা হলেও আপনার কোটিপতি হওয়ার গ্যারান্টি থাকবে। সাংসদ হলে, কোটি-কোটিপতি। তার থেকেও বড়ো কোনো রাঘব বোয়াল হলে আপনি দেশটার একটা বড়ো অংশই গিলে খেতে পারবেন। এমন লাভজনক ব্যবসা হাতে রাখার জন্যে তাই ক্লিনিকে গিয়ে রাজনীতিকরা বিবেক ফেলে দিয়ে এবং নীতির মুঁড়িঘণ্ট ধুয়ে-মুছে-চেটে-পুটে খেয়ে সব কিছু করতে তৈরি থাকেন।

এই ব্যবসা করার জন্যে বেশি কিছু লাগেও না— প্রথমেই দরকার স্লোগান দেওয়ার লোক— যাদের ধরা যাক আমরা নাম দিলাম— পদাতিক সৈন্য। সহজেই তাদের ভাড়া করা যায়। যে টাকা দেবে, তার হয়ে এরা জিন্দাবাদ অথবা ধ্বংস হউক বলবে। তারপরে দরকার লাঠিয়ালদের সাঁজোয়া বাহিনী। তারপর খুনীদের কম্যান্ডো বাহিনী। তারপর সরকারী কর্মকর্তার আর্টিলারি। এই কর্মী বাহিনীর বেশির ভাগই জলের মতো (পানি বললাম না, কারণ তাঁরা নর্দমার দুর্গন্ধওয়ালা নোংরা জল— পান করার উপযুক্ত নয়)। তাঁরা জলের মতো, কারণ যে-পাত্রে রাখিবেন, এই মাল সেই

পাত্রের আকার ধারণ করিবেন। যে-দল ক্ষমতায় আসুক সেই দলেরই ভাড়াটে সৈন্যের কাজ করিবেন। এসব বিল্ট-ইন ব্যবস্থা ছাড়া, দলের লোকেদের চাকরি দিয়ে আপনি প্রাইভেট আর্মিও গঠন করতে পারেন। লোকবল ছাড়া আপনার ব্যবস্থা করতে হবে প্রচারের জন্যে। এসবের ম্যানেজ করতে পারলে সামনের বার, ইনশাল্লাহ, আপনি ক্ষমতায় আসতে পারবেন। এবং আসতে পারলে আপনার এতো টাকা হবে যে, আপনি নিজেই তার খেই হারিয়ে ফেলবেন। বোধ হয়, মরার সময়ে সন্তানদের সঠিক হিসেব দিয়ে যেতে পারবেন না।

কিন্তু কথা হচ্ছে, টাকা এলে সুখ-শান্তি আসবে কি ? সরি! সেটার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারছেন না। আপনার পরিবার ভেঙে যেতে পারে। মানসিক শান্তি চলে যেতে পারে। দৈহিক পরিশ্রমে আপনি কাতর হতে পারেন। টেনশনে আপনার হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে। কিন্তু আপনার শত শত কোটি টাকা কেউ আটকাতে পারবে না।

কদিন আগে লন্ডনের এক রেস্টুরেন্টে বসে কবি এবং বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এতো টাকা দিয়ে এই কোটিকোটিপতিরা কী করবেন? এতো টাকা কোন কাজে লাগবে? তিনি সংক্ষেপে বললেন, ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী মরার পর গুপ্তস্থানের লোমগুলোও কামিয়ে নিতে হয়। অর্থাৎ ওগুলোও সঙ্গে যাবে না— টাকা তো নয়ই!

বলতে পারেন: আপনার আর কতো টাকা চাই ?

(*যুগান্তর*, ২০০৬)

৩৪

মৃত্যুর পর শান্তি আছে ?

মরে শান্তি আছে কিনা, আমার পক্ষে বলা শক্ত। কারণ, আমি এখনো পুরোপুরি মরে যাইনি। স্বচক্ষে মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থাটা দেখার অভিজ্ঞতা তাই হয়নি। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে একটা কথা হলপ করে বলতে পারি— শান্তিতে মরার উপায় নেই। আজ হাঁটতে বেরিয়ে কথাটা মনে হলো। দেখি উল্টো দিক থেকে পেল্লায় দুটো ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি আসছে। ঘোড়া দুটো যমজ কিনা, খবর নিয়ে দেখিনি। কিন্তু দেখতে হুবহু একই রকম। দুটি বিশাল এবং খুব-সুরাত কালো ঘোড়া। ঘোড়া দুটো পারতো পক্ষে জোরেই দৌড়াচ্ছে। কিন্তু গাড়িগুলো আটকা পড়েছে তাদের পেছনে। ভাবলাম, গাড়িওয়ালারা ঘোড়া দুটো আর ঘোড়ার গাড়ির চালককে অভিশাপ দিতে দিতে যাচ্ছেন নিশ্চয়। ঘোড়ার গাড়ি কাছাকাছি এসে গেলো। দেখলাম অনেক যাত্রী যাচ্ছেন না তাতে চড়ে, যাচ্ছেন একজন মাত্র যাত্রী। আর, অভিশাপ দিলেও তাঁর পক্ষে শোনার উপায় নেই। আসলে, ভদ্রলোক অথবা ভদ্রমহিলা শেষ যাত্রা করছেন শান-শওকতের সঙ্গে। আর তো গাড়িতে চড়া হবে না!— তাই মনের সুখে গাড়িতে চড়ে নিচ্ছেন।

কিন্তু এই সুখটুকু পাওয়ার জন্যে এই যাত্রীকে হয়তো কয়েক বছর ধরে অন্তেষ্টিক্রিয়ার খরচ বাবদ অনেক টাকা সঞ্চয় করতে হয়েছে। মরাটা এই মড়ার দেশে সত্যি সত্যি খরচসাপেক্ষ এবং কঠিন ব্যাপার। সে জন্যে এ দেশে দুটো ব্যবস্থা আছে। প্রথমত বেশির ভাগ লোকই সহজে মরতে চান না। তাঁরা বেশ দেরি করে মরেন— বয়স যখন প্রায় আশি হয়, তখন। (বাংলাদেশের মতো কোনো উন্নয়নশীল দেশ হলে আগেই মরে হাড় জুড়াতে পারতেন।) সব সময়ে এই ব্যবস্থাটা অবশ্য নিজের ওপর নির্ভর করে না। আর দ্বিতীয় ব্যবস্থা হলো, অন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্যে বীমা গ্রহণ করা। পেনশানের টাকা আর বীমার অর্থ দিয়ে শেষে ঘোড়ায় চড়ার সুখটুকু পেতে কোনো অসুবিধে নেই। তা ছাড়া, আপনার শেষযাত্রার আয়োজন করার জন্যে প্রত্যেকটা এলাকায় অন্তত একটা করে সমাধিস্থ করার দোকানও আছে। তাদের ব্যবসা ভালোই চলে! আর রোজ রোজ এই কাজের প্রশিক্ষণ নেওয়ায় তারা সুচারুভাবে কাজটা সম্পন্নও করেন। আপনি চাইলে আপনাকে বৈদ্যুতিক চুলোয় কয়েক মিনিটের মধ্যে ছাই করে দেবে। সেই ছাইয়ের ওপর আত্মীয় এবং বন্ধুরা ফুলও দেবে দরাজ হাতে। ছাই হতে না-চাইলে আপনি মাটির তলায় গিয়ে কৃমির খাদ্যও হতে পারেন। মোট কথা, আপনার শেষটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।

কয়েক বছর আগে আমার এক ভাইপো আর তার স্ত্রীর সামনে আলাপ হচ্ছিলো রান্নাঘরটাকে কিভাবে আরও সাজানো যায়, তা নিয়ে। গিন্নি বললেন, তিনি তিন হাজার পর্যন্ত ব্যয় করতে রাজি আছেন। ভেবে পেলাম না, তিনি অতো টাকা পাবেন কোথায়। কারণ সারাজীবন চাকরি করেও আমি ব্যাংকে তিন হাজার পাউন্ড সঞ্চয় করতে

পারিনি। তা-ও সবকিছু ধুয়ে-মুছে যদি তিন হাজার পাউন্ড জোগাড়ও হয়, সেটা রান্নঘরের পেছনে (অথবা সামনে) ব্যয় করা কি ঠিক হবে? এর থেকেও জরুরী কিছু ঘটলে তখন কী হবে? কিছু কাল আগে আমার হৃদয়ের ওপর একটা হামলা হয়ে গেছে। কাজেই চিন্তাটা আমার মাথায় ঘুর-ঘুর করছিলো সারাক্ষণ। তাই বললাম, মরলে কবর দেওয়ার টাকা হবে কিনা, তার ঠিক নেই, তুমি আছো রান্নাঘরের জন্যে তিন হাজার টাকা খরচের পরিকল্পনায়! না, আমার জীবন অথবা মরণের চেয়ে রান্নাঘরের প্রতি তাঁর বেশি অগ্রাধিকার রয়েছে, কসম করে বলতে পারি, সেটা ঠিক নয়। তবে রান্নাঘরটা একটু ভদ্রস্থ করার চিন্তাটা তাঁর মাথায় অনেক দিন থেকেই আছে।

পোড়ালে খরচ কম হবে কিনা, সেটা অনেকবার ভেবে দেখেছি। কিন্তু বন্ধুবর (ডক্টর) শফিউল্লাহ আর প্রখ্যাত বেতারপ্রচারক নুরুল ইসলাম তাঁদের পোড়ানোর অসিয়ত করে গিয়েছিলেন বলে, তাঁদের বেশ সামাজিক নিন্দা হয়েছিলো। (সান্ত্বনা এই যে, তাঁরা সেটা শুনে যেতে পারেননি।) সুতরাং ভেবেচিন্তে ঐ বিকল্পটা মনে মনে বাদই দিতে হয়।

আমি অত্যন্ত অসামাজিক জীব। বন্ধু-বান্ধব বলতে গেলে নেই— চৌধুরী দম্পতি ছাড়া। খরচ কোথা থেকে আসবে— এ ছাড়াও একটা দুশ্চিন্তা চৌধুরী সাহেবকে বিব্রত করে। যেহেতু আমাকে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে দেখা যায়নি, সুতরাং তাঁর আশঙ্কা আমাকে সমাধিস্থ করার জন্যে কেউ আসবে না। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানও করা সম্ভব হবে না। অতএব টাকা থাকলেই সমস্যার সুরাহা হচ্ছে না। কিন্তু কথাটা তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করার জন্যে বলেননি। বলেছেন, সিরিয়াসলি। আমি তাঁর কথা শুনে সিরিয়াসলি হেসেছি। কারণ, আমি মরলে আমি টের পাবো বলে আপাতত আমার মনে হচ্ছে না। আমি মরে গেলে, সেটা চৌধুরী সাহেব-সহ আর যারই সমস্যা হোক না কেন, আমার সমস্যা অন্তত নয়— আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।

মরে যাওয়ার আগের দিন মাইকেল মধুসূদনকে এসে দুজন পাদ্রী বলেছিলেন, ভায়া, তুমি তো মরেই খালাস! কিন্তু আমাদের সমস্যার কথাটা ভেবে দেখেছো কি? ধম্মকম্ম কিছুই করলে না, আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে, তোমাকে সমাহিত করার বিষয়টা নিয়ে ঝামেলা হতে পারে। আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে মাইকেল ভয় পেয়েছিলেন কিনা, তা কোথাও লেখা নেই। কিন্তু তিনি অকাতরে যে-কথাটা বলেছিলেন, তা লেখা আছে। তিনি বলেন, দেখা ভাই, আমি মরার পর তোমরা আমাকে গোরস্থানে কবর দেবে, নাকি তোমাদের বাড়ির সামনে, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কেবল দেখো আমার হাড়গুলোর শান্তি যেন বিনষ্ট না-হয়। এর পর মাইকেল আর বেশি কথা বলতে পারেননি। পরের দিনই সমস্যার বোঝা বন্ধুদের কাঁধে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্তে বিদায় নেন।

সত্যি সত্যি ঝামেলা হলো, তাঁকে সমাধিস্থ করার ব্যাপার নিয়ে। দেশের সবচেয়ে বড়ো কবি, কয়েকজন মাত্র বাঙালি ব্যারিস্টারের মধ্যে একজন। রীতিমতো

বিশিষ্ট লোক। কিন্তু তাঁকে কবর দেওয়ার অনুমতি দিলেন না কলকাতার বিশপ। একটা ইংরেজি পত্রিকাও তাঁর মৃত্যুর খবরটা ছাপলো না। অথচ আঠারো বছর বয়সে হিন্দু কলেজের একজন সাধারণ ছাত্র হিশেবে তিনি যখন খৃস্টান হয়েছিলেন, তখন ছোটো লাট তাঁকে দুর্গে রেখে খৃস্টান হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। বড়ো সবগুলো কাগজে খবরও ছাপা হয়েছিলো ফলাও করে। নেই বলেই ধারণা হয়, কিন্তু সত্যি যদি পরকাল থাকে, তা হলে মাইকেল নিশ্চয় মহা বিরক্ত হয়ে ভেবেছিলেন: এ কি এ ঝামেলা এই পরকালে এসে! দেখতে পাচ্ছি, মরেও শান্তি নেই!

মাইকেল পর্যন্ত যেতে হবে না। বাড়ির কাছেই আহমেদ শরীফ মারা গেলেন। মরার সময়েও মানুষের উপকার করার সদিচ্ছাটা তিনি ছাড়তে পারেননি। তাই নিজের দেহটা মাটি চাপা দিয়ে একেবারে মাটি করতে রাজি ছিলেন না। দান করে গেলেন ছাত্ররা যাতে কেটেকুটে দেহের অলিগলির জ্ঞান লাভ করতে পারে, তার জন্যে। কিন্তু তাঁর সেই প্রাণহীন দেহটাকে নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। সারা জীবন তিনি অনেক বিতর্ক করেছিলেন। ইচ্ছা থাকলেও তিনি অবশ্য এই বিতর্কে যোগ দিতে পারলেন না। বোধ হয় শান্তিতে থাকতে চেয়েছিলেন। আবু সয়ীদ আইয়ুব ভাগ্যবান। তাঁর দেহটা নিয়ে কোনো বিতর্ক হয়নি। তিনি শান্তিতেই দেহদান করতে পেরেছিলেন। অতি সম্প্রতি শান্তি ভঙ্গ না-করার নজির রেখে গেছেন হুমায়ুন আজাদ। ইসলামী সন্ত্রাসীরা তাঁর গলা কেটেও তাঁকে মেরে ফেলতে পারেনি। কিন্তু তিনি যখন দূরদেশে গিয়ে কিছুক্ষণ ফুর্তি করে চিরশান্তিতে থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন ধর্মান্ধরা তাঁকে সমাধিস্থ করার ব্যাপারে ঝামেলা পাকাবে বলে হুমকি দিয়েছিলো। এই কাপুরুষদের আজাদ কখনো পরোয়া করেননি। পরকাল থাকলে সেখান থেকেও হয়তো এক হাত দেখে নিতেন। কিন্তু শাহাদাত বরণ করার পর তিনি আর শান্তি ভঙ্গ করতে চাননি। জীবনে শান্তি চেয়েও পাননি, কিন্তু মৃত্যুর পরে শান্তি চেয়েছিলেন। তাঁর নীরবতা থেকে মনে হয়, পেয়েও ছিলেন।

৩৫
যেন ঐ দেশেতে মরি

ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে প্রবাস হলো মৃত্যুর মতো: ভয়ানক। কিন্তু এখন শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত বাঙালিরা একটা গানের যে-লাইনটা বারবার গাইতে চান, সেটা হলো: "আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন ঐ দেশেতে মরি।" সবকিছুর বিনিময়ে ছোটোবড়ো প্রায় সবাই দেশত্যাগ করে "ফরেইনে" যেতে চান এবং সেখানেই বাকি জীবন সুখে থাকতে চান। এই দোষে আমিও দোষী। তার জন্যে প্রায়শ্চিত্তও করতে হয় নিত্যদিন। যাঁরা দেশে আছেন, তাঁরা যে কতো সুখে আছেন, সেটা অনুভব করতে পারবেন একমাত্র বিদেশে থাকার কষ্ট হাড়ে-হাড়ে টের পেলে, তার আগে পর্যন্ত নয়। যে-ভদ্রমহিলারা দেশে জীবনেও নিজের হাতে রান্না করেননি, ঘর পরিষ্কার করেননি, বরং সময় কাটানোর সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন, তাঁরা, কী আশ্চর্য, প্রবাসে মরার ফুরসুত পান না। তাঁদের সোনার হাতে সোনার কাঁকন কন্‌কন্ করে না। তার বদলে পেতলের খুন্তি খন্‌খন্ করে। হাতে বারবার ক্রীম লাগানো সত্ত্বেও তাঁদের সুন্দর হাতের পর্শে দেহমনে রোমাঞ্চ লাগে না, বরং কুলিদের মতো কঠিন হাতের খরখরে স্পর্শে শরীর শিউরে ওঠে।

স্বামীরাও মহারাজ সেজে বসার-ঘরে সোফায় বসে হুকুম দেন না, অথবা দিতে পারেন না। মনুষ্যত্ব থাকলে তাঁরা স্ত্রীর সহায়তায় এগিয়ে আসেন। মনুষ্যত্ব না-থাকলে স্ত্রীর শাপে ভস্মীভূত হন। দেশে থাকলে যে-সাহেবরা কেবল বন্ধুদের সঙ্গে পরনিন্দা করে আর টিভি দেখে সময় কাটাতেন, সেই প্রবাসী সাহেবরাই অনেকে নিজ হাতে রান্না করেন। তরকারি কুটে দেন। থালা-বাসন ধুয়ে দেন। খাবার দেন টেবিলে। কাপড় ধোয়ায় এবং সে কাপড় বাইরে নেড়ে দেওয়ায় সাহায্য করেন। কাপড় শুকালে ইস্তিরি করেন। তা ছাড়া, সপ্তাহে অন্তত একদিন ঘর ঝাড়ু দেন। হ্যাঁ, এখানে ভ্যাকুয়াম ক্লীনার আছে, ঠিকই, কিন্তু সেই ভ্যাকুয়াম ক্লীনার ঠেলে-ঠেলে ঘর পরিষ্কার করতে বেশি কষ্ট, নাকি ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা বেশি কষ্টের, সেটা ভুক্তভোগীর কাছে বিতর্কের বিষয়। ঘরের আবর্জনা বিনব্যাগে ভরে তার মুখ বন্ধ করে বাইরে রেখে আসা ইত্যাদিও করতে হয় নিয়মিতভাবে। টয়লেট সাফ করা, এমন কি, কমোড পরিষ্কার করার জন্যে বাইরে থেকে সুইপার আসে না। হয় সাহেবকে, নয় বিবি-সাহেবকেই করতে হয়।

হঠাৎ পানির ট্যাপ নষ্ট হলে কে সারবে সেটা? প্লাম্বার ডাকলে নিদেন পক্ষে ষাট-সত্তর পাউন্ড লাগে। একটা আলো জ্বলছে না— লাইন খারাপ হওয়ায়। সেটা মেরামত করতে গেলে এক শো পাউন্ডও লাগতে পারে। কাল ড্রেইন আটকে গিয়েছিলো। সেটা কে পরিষ্কার করলো? আগামী কাল দরজার একটু কব্জা খুলে

গেলে সেটা কে মেরামত করবে ? এ রকমের তাবৎ কাজ নিজেদেরই করতে হয়। সে জন্যে নিতান্ত আনাড়ি না-হলে প্রত্যেক সাহেবেরই একটা ডি. আই. ওয়াই-এর বাক্সো থাকে। ডি. আই. ওয়াই. মানে ডু ইট ইওরসেল্ফ। নিজে করার বাক্সো। তাতে থাকে মিস্তিরিগিরি, প্লাম্বিং, ইলেকট্রিকের কাজ থেকে আরম্ভ করে সব ধরনের কাজ করার মতো যন্ত্রপাতি। বইও পাওয়া যায় এসব কী করে করতে হয়, তার সবক নেওয়ার জন্যে। এসব বইয়ে সচিত্র উপদেশ দেওয়া থাকে।

ঘরের কাজ ছাড়া, বাইরেরও কাজ থাকে। বাগানের ঘাস কাটা, সেই ঘাস বস্তায় বন্দী করে বাইরের বিনে রেখে আসা, বাগানে ফুলের গাছ থাকলে পানি দেওয়া-সহ তার পরিচর্যা করা, গাড়ি ধোয়া, বাড়ির সামনের রাস্তা পরিষ্কার করা, বরফ পড়লে সেই বরফ কোদাল দিয়ে সরিয়ে ফেলা— এসবই আপনার নিজেকেই করতে হবে। সাহায্য করার কেউ নেই। তাই করতে হবে একদিন নয়, প্রতিদিন।

তা ছাড়া আছে টাকা কামাই করার জন্যে চাকরি করা। দেশ থেকে উচ্চডিগ্রি নিয়ে এসে বিদেশে অড জব— তার মানে— ছোটোখাটো কাজ অনেকেই করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের পিএইচডি ডিগ্রিওয়ালা একজন শিক্ষক অনেক বছর লন্ডনের পাতাল রেল চালিয়েছেন। কাজটা আদৌ অপমানজনক নয়। বেতনও ভালো। কিন্তু ভদ্রলোক যে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, সে বিদ্যা আর কাজে লাগাতে পারলেন না।

বেশির ভাগ স্ত্রীদেরও চাকরি করতে হয়। কারণ অনেক সময় স্বামী এমন আয় করেন না, যা দিয়ে স্বচ্ছন্দে অথবা সসম্মানে বেঁচে থাকা যায়। সুতরাং বেগম সাহেবকে এগিয়ে আসতে হয় বেচারা স্বামীকে সাহায্য করার জন্যে। তা ছাড়া, পাশের বাসায় ভাবীরা থাকেন না। সুতরাং আড্ডা দিয়ে সময় কাটানোর উপায় নেই। আপনজনদের থেকে দূরে একাকী ঘরের মধ্যে বসে টিভি দেখে কতো আর সময় কাটানো যায়। অনেক বিবি সাহেব তাই জীবনের একঘেয়েমি কাটানোর জন্যেই একটা কাজ জুটিয়ে নেন, যদি করার মতো যোগ্যতা থাকে। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা না-থাকলে কাজও জোটানো যায় না। তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এ রকমের অনেক ভদ্রমহিলা তাই বাড়িতে বসে কোনো কম্পেনির জন্যে কাপড়-জামা সেলাই করেন। বাঙালি মহিলারা কেউ কেউ খাবার রান্না করেও দোকানে সরবরাহ করেন। অনুমান করি, এসব বাড়িতে খাওয়ার কোনো দরকার হয় না। কারণ ঘ্রাণে যদি কেবল সিকিভোজনও হয়, তা হলেও এতো খাবারের সুগন্ধে পেট ফুলে ঢেকুর ওঠার কথা। তা ছাড়া, আর-একটা সুবিধে আছে— এসব বাড়িতে চুরি হতে পারে না। কারণ বাড়ির ধারে-কাছে এলেও দুর্গন্ধে দৌড়ে পালানোর পথ পাবে না চোর বেচারা।

যাঁরা অফিসের কাজ পান, তাঁদের কাজটাও খুব সহজ নয়। কারণ, কাজ মানে কেবল অফিসে যাওয়া নয়। অফিসে গিয়ে আর্দালিকে চা নিয়ে আসার আদেশ দেওয়াও নয়। আর্দালি বলে কিছু থাকে না এ বিদেশে। কাজে কাজেই সাহেবই

আর্দালি, আর্দালিই সাহেব। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ— এ দেশে কাজ মানে কাজ, ফাঁকিবাজি নয় মোটেই। সুতরাং কাজ করতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠলে অবাক হতে পারেন, কিন্তু অবিশ্বাস করতে পারেন না। দেশে কাজের একটা ইনসেন্টিভ থাকে— উপরি পাওনা। প্রবাসেও উপরি পাওয়া থাকে, তবে কর্মস্থানে নয়, বাড়িতে। বাড়িতে এসে সেই উপরি পাওনা উপভোগ অথবা ভোগ করতে হয়— আপনি যেভাবে নেন, তার ওপরে নির্ভর করে। হ্যাঁ, সারাদিন বাইরে কাজ করে এসে আবার সন্ধ্যায় বাড়িতে উপরি কাজ করতে হয়। অফিসের কাজ সবেতনে, বাড়ির কাজ বেঁচে থাকার জন্যে, বিনা বেতনে।

এসব সত্ত্বেও, ফরেইন বলে কথা! ফরেইনে থাকাটা এমন যোগ্যতা যে, আপনি বৃদ্ধ হলেও দেশে গিয়ে তরুণী ভার্যা জোটাতে পারবেন। তা ছাড়া, দেশে আসার পথে তীর্থটাও সেরে আসতে পারবেন। তার মানে আপনার ইহকাল এবং পরকাল— উভয় কালেই ভাগ্যে আছে স্বর্গীয় অপ্সরা— যদি কিনা একবার ফরেইনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। তাই, দোহাই, হতাশ হবেন না, আদম-ব্যাপারীর সঙ্গে যোগাযোগটা বজায় রাখবেন, প্লীজ!

(*যুগান্তর*, ২০০৬)

৩৬

গানের ভিতর দিয়ে

আমরা যখন কথা বলি তখন গলা ওপরে তুলি, আবার কখনো খাদে নামাই। কোনো শব্দ লম্বা করে বলি, কোনোটার ওপর ঝোঁক দিই। মোট কথা, একটা ভাব প্রকাশের জন্যে কতোগুলো অর্থবোধক শব্দই যথেষ্ট নয়। ঠিকমতো ভাব প্রকাশ করতে হলে শব্দের সঙ্গে গলার ওঠা-নামার দরকার হয়। একই শব্দ দিয়ে নানা অর্থ প্রকাশ করতে পারি নানাভাবে সেই শব্দ উচ্চারণ করে। যেমন, ধরা যাক, দুটি শব্দ— "মনে আছে?" মাত্র দুটি শব্দের এই কথা দিয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে পারি— মনে আছে? প্রেমিকা অথবা প্রেমিককে অতীতের একটা ঘটনা অথবা কথা মনে করিয়ে দিতে পারি। সেই মনে করানোর সঙ্গে দুঃখ থাকতে পারে, ক্ষোভ থাকতে পারে, অভিমান থাকতে পারে, বিস্ময় থাকতে পারে, প্রেম থাকতে পারে, ভালো লাগা থাকতে পারে। কাজের লোককে তার কাজের কথা নতুন করে মনে করিয়ে দিয়ে সাবধান করে বলতে পারি: মনে আছে? এমন কি, একজনের প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি, হ্যাঁ, মনে আছে। এই সব বিচিত্র অর্থ প্রকাশ পায় কেবল গলার ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে, বাচনভঙ্গি থেকে।

বস্তুত, কেবল শব্দাবলী নয়, ভাব এবং আবেগ প্রকাশের একটা প্রধান বাহনই হলো গলার ওঠা-নামা। আমরা গলা খাদে নামিয়ে গুরুগম্ভীর আদেশ দিই। গলা উঁচু করে গাল দিই। অনুরোধ করি। গান হলো সেই ওঠা-নামারই সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি। এর মধ্য দিয়ে আমরা মনের এমন কতোগুলো কোমল অনুভূতি প্রকাশ করতে পারি, অন্য কোনো উপায়ে যা পারিনে। গান আমাদের নিয়ে যায় এমন এক জগতে যেখানে আমরা অন্য কোনো উপায়ে পৌঁছতে পারিনে। বাঞ্ছিতজন অনেক সময়ে গানের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকেন। সুর দিয়ে তাঁর চরণ ছুঁতে পারি, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারিনে।

মনে আছে, অনেক বছর আগে, প্রথম যৌবনে এক রাতের বেলায় একটা গান শুনে অভিভূত হয়েছিলাম— সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার কোলে। পরের দিন আমার এক বন্ধু এলো আমার সঙ্গে আড্ডা দিতে। তাকে বললাম, জানো, গত রাতে কী এক আশ্চর্য গান শুনেছি। তুমি কখনো শুনেছো এ গান? এই বলে আমি গীতবিতান বের করে গানটা তাকে পড়ে শোনাতে চেষ্টা করলাম।

> সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার কোলে,
> যাক না গো সুখ জ্বলে।

এ পর্যন্ত পড়ে আমার সন্দেহ হলো: ঠিক গান পড়ছি তো! নাকি, ভুল করে অন্য কোনো গান পড়ছি? রাতের বেলায় যে-গান কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আমাকে

অনির্বচনীয় এক জগতে নিয়ে গিয়েছিলো, সে কি এই গান ? পড়ে শোনাতে গিয়ে অন্তত তা তা মনে হলো না। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন যে, বাল্যকালে একদিন যখন পড়ছিলেন: জল পড়ে, পাতা নড়ে; তখন জল পড়ের সঙ্গে যেই জোড়া লাগলো পাতা নড়ে, অমনি ছন্দের দোলায় তাঁর মন নেচে উঠলো। বস্তুত কবিতার ছন্দ এবং ভাষাও গদ্যের সীমানা পেরিয়ে আমাদের অনির্বচনীয় আনন্দলোকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ছন্দ আর কাব্যিক ভাষার সঙ্গে সুরের মিলন ঘটলে তা আমাদের নিয়ে যায় আরও ঊর্ধ্বলোকে। সে জন্যেই রাতের বেলায় সুরের ছোঁয়ায় যে-অনুভূতি এসেছিলো হৃদয়-মন-দেহ জুড়ে আমার সমগ্র সত্তায়, সুরহীন কবিতা মনের গভীরে সেই অনুভূতি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলো। বন্ধুকে আর তেমন নিবিড় করে আমার অনুভূতিটা তুলে ধরতে পারলাম না।

উইলিয়াম র‍্যাডিচি তাঁর একটি লেখায় রবীন্দ্রনাথের গান অনুবাদ করার প্রসঙ্গে কবিতা আর গানের পার্থক্যের কথা বলেছেন চমৎকার একটি উপমা দিয়ে। তিনি লিখেছেন: সুরবর্জিত গান হলো পাখাহীন প্রজাপতির মতো। নগ্ন, সৌন্দর্যহীন। সুতরাং গান অনুবাদ না-করাই ভালো।

গানের এই অসাধারণ প্রকাশ ক্ষমতার কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও বার বার বলেছেন, এমন কি গান দিয়েও বলেছেন।

> গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি,
> তখন তারে চিনি
> আমি তখন তাকে জানি।

কখনো বলেছেন, গানে গানে আমার বন্ধন, আমার সীমানা ছিন্ন করো।

আমাদের জীবন যতোই জটিল হচ্ছে, আমরা যতোই বস্তুর পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, গান আমাদের জীবন থেকে ততোই দূরে সরে যাচ্ছে। আগের তুলনায় প্রযুক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে— ঘরে রেডিও থাকে, টিভি থাকে, হাইফাই থাকে, সিডি থাকে। কিন্তু করুণাধারায় গান এসে আমাদের অতি শুষ্ক জীবনকে আর্দ্র করে না, বরং শুষ্ক জীবন করুণার ধারাকেই শুকিয়ে ফেলে। তারপরও কখনো কখনো গীতসুধার তরে চিত্ত পিপাসিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত আমরা যে-বাংলা গান দেখতে পাই, সে গানে কথা খুব সামান্যই থাকতো। তাতে প্রাধান্য ছিলো সুরের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আঠারো-উনিশ বছর বয়সে যখন ইংল্যান্ডে ছিলেন প্রায় বছর খানেক, তখন কথাপ্রধান গান শুনেছিলেন। শিখেওছিলেন তাঁর বান্ধবী লুসি স্কটের কাছে। যে-গান তিনি শিখেছিলেন, পশ্চিমে সে গানকে বলা হয় ফোক সং। তিনি স্কটিশ এবং আইরিশ— উভয় ধরনের ফোক সং শিখেছিলেন। এসব গান আবৃত্তি করে গাইবার মতো গান। বাংলায় তখনো এ ধরনের গান ছিলো না। এ ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ আরও এক ধরনের

গান শুনেছিলেন, যাকে বলে অপেরা সং। গীতিনাট্যের গান। সেখানেও কথার ছড়াছড়ি। দেশে ফিরে এসেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন মায়ার খেলা গীতিনাট্য। তাতে আইরিশ এবং স্কটিশ ফোক সং-এর আদলে কয়েকটি গানও ছিলো। কিন্তু যা তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যা ছিলো, তা হলো: অতঃপর গান লিখতে গিয়ে তিনি অনেক বেশি জোর দিলেন কথার ওপর। ফোক সং-এর মতো কথার সঙ্গে সুরের মিলন ঘটালেন। এবং তাঁর পর থেকে বাংলা গানের ধরনই বদলে গেলো। কথার প্রাধান্য ছাড়া এখন বাংলা গান হয় না। আমরা বাঙালিরা সুরের সঙ্গে মিলিয়ে মনের কথাটাই বলতে চাই বারবার।

(*যুগান্তর*, ২০০৬)

নির্বাচিত নির্ঘণ্ট